লায়লী আশমানের আয়না

মহাশ্বেতা দেবী

করুণা প্রকাশনী/ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬০

প্রকাশক ঃ
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

টাইপ সেটিং ঃ
দি বেঙ্গল পি: টি এস এণ্ড কম্পিউটার সেণ্টার
৯এ. রায়বাগান স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

আমার দাদামণি
৺ সুরেশচন্দ্র ঘটক
সাহিত্য রসিকেসু

॥ এক ॥

'আয়নাটি লায়লী আশমানের। হ্যাঁ, লক্ষ্ণৌওয়ালী লায়লী আশমানের। আলি শাহ্ ওকে উপহার দিয়েছিলেন।'

কুন্দনলাল দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটার দিকে তাকাল। বড় আয়না। ডিমের মতো লম্বাটে। আয়নার কাঁচটি বহুমূল্য। ফ্রেমটি রুপোর এবং কারুকাজ খচিত পাতার মাঝে মাঝে এক-একটি গোলাপ উৎকীর্ণ।

কুন্দনের মনে পড়ল সে কেমন ছুটতে ছুটতে চীনেবাজারে গিয়েছিল। রহমত নিলামওয়ালাকে কত খুঁজে খুঁজে বের করতে পেরেছিল সে। প্রথমে রহমত একটি কথাও বলতে চায়নি। তারপর কুন্দনলালের পরিচয় জানবার পর সে ভয় পায়।

সভয়ে শরীরটি নুইয়ে সেলাম ক'রে সে মাপ চায়। তারপর বলে, 'কেমন ক'রে জানব বলুন, ও লোকটা আপনার বাড়ী থেকে জিনিসপত্তর লুট ক'রে এনেছে?'

'সব কি বিক্রি হয়ে গেছে?' কথাটা জিগ্যেস করতে কুন্দনের গলায় ব্যথা করছিল।

'সব! নিলামে তুলে দিয়েছিলাম কি না!'

তারপর রহমত চাকরদের ডাকে। কুন্দনকে বসায়, নিজে পাশে বসে। পান ও শরবত আনে। কুন্দন কিছুই নেয় না। শুধু কপালটা ধরে বসে থাকে ও চিন্তা করে লায়লীর ব্যবহারের, শখের ও খেয়ালের জিনিসগুলোর। সেই আতরদান, আলবোলা, পোশাক এবং আসবাবপত্র কিছুই তবে নেই! সেগুলোকে দেখতে পেলে এবং নাড়াচাড়া করতে পেলে কুন্দন একটু সান্ত্বনা পেত।

রহমত সাগ্রহে কুন্দনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সম্ভবত সে বুঝতে চেষ্টা করছে ঐ মানুষটি কি ভাবছে।

একটু পরে কুণ্ঠিত স্বরে সে বলে, 'কুন্দনবাবু, একটা জিনিস-ই রয়ে গেছে।'

কুন্দন চোখ তুলে চায়।

রহমত বলে 'ঐ আয়নাটি। দেখুন, ওটা আপনি নিয়ে যান।'

কুন্দন কথা না বলে পকেটে হাত দেয়। রহমত বলে, 'না না! দাম আমি নিতে পারব না। ওটা আপনি নিয়ে যান।'

সে আয়নাটি নিয়ে এল। চিকনের কাজ করা ঢাকনিটি ময়লা হয়ে গেছে। নিজেই আয়নাটি মুড়ে কুন্দনের হাতে দিল এবং বলল, 'জিনিসগুলো কে কে কিনেছে আমার খাতায় তাদের নাম-ঠিকানা লেখা আছে। আমি কি......'

কুন্দন হাত নেড়ে তাকে নিষেধ করল। আয়নাটি নিয়ে সে যখন গাড়ীতে উঠছে তখন রহমত একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'কুন্দনবাবু, আয়নাটা কি আপনি ব্যবহার করবেন?'

কুন্দন আরক্ত চোখে তাকাল। রহমত একটা সাহসের কাজ ক'রে বসল। সে কুন্দনের হাতটা ধরে বলল, 'মাপ করবেন। একলা......ধরুন রাত-বিরেতে আয়নাটা না দেখাই বোধহয়.....!'

হঠাৎ কুন্দনের চোখদুটো একটা অস্বাভাবিক আলোয় জ্বলে উঠল। সে বলল, 'কেন? এ কথা কেন?'

রহমত গলার তাবিজটা ছুঁয়ে বলল, 'আমি জানি না। তবে একদিন একজন বাবু এসেছিলেন। তাঁকে ঘরে বসিয়ে আমি অন্য ঘরে গিয়েছিলাম।' সে গলা নামিয়ে বলল, 'বাবুটি হঠাৎ ভয় পান। বেরিয়ে আসেন। আমাকে কিছুই না বলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।'

কুন্দন এবার হাসল। কুন্দনের মুখে হাসি দেখলে সবাই ভয় পায়, রহমতও ভীত হলো। কুন্দন বলল, 'এই টাকাটা রাখ। আমি খুশী হয়েছি।'

কুন্দনের গাড়ীটা যখন খিদিরপুরের বাগানবাড়ীতে ঢোকে, তখন সন্ধ্যে হচ্ছে। বিকেলের আলোটা তখন শুধু আকাশের পশ্চিম কোণে লেগে আছে। আষাঢ়ের বেলা। সময় হলেও যেতে চায় না। আকাশের কোণে কোণে ম্লান আলো ছড়িয়ে করুণ ও বিষণ্ণ মিনতির মতো লেগে থাকে।

কুন্দনকে দেখে মালী ও চাকররা ছুটে এল। সকলকে সরে যেতে বলল কুন্দন। তারপর ওপরে উঠে এল। লায়লীর ঘরটা খুলল।

মস্ত ঘর। অন্ধকার। গালিচা এবং পর্দায় ধুলো। দেওয়ালের গায়ে কুন্দন আয়নাটা টাঙাল।

সে দেওয়ালে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চোখটা তুলে দেওয়ালের দিকে চাইল।

তার বুকের ভেতর যন্ত্রণা হচ্ছে। সে মোটা মোটা আঙুলগুলো দিয়ে বুকটা ঘষলো। তারপর ভাঙা গলায় অস্ফুট স্বরে বলল, 'লায়লী!'

তারপর কুন্দন গভীর হতাশায় মাথা নাড়ল। লায়লী নেই, লায়লী নেই, লায়লী নেই, লায়লী কোথাও নেই। কুন্দন মাথার চুলগুলো টেনে ধরল।

সে কাঁচাপাকা চুলগুলোকে কিছুক্ষণ টানল। তারপর গালিচার ওপর হাঁটতে শুরু করল। একটু পরে মনে হলো তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সে তাকাল। তার পায়ের আঘাতে গালিচা থেকে ধুলো উড়ছে। সে একটি জানালা খুলল।

বাইরে বিষ্টি পড়ছে। ঝিরঝির ক'রে। গুঁড়ো গুঁড়ো বিষ্টি। কুন্দন জানলা দিয়ে বাইরে চাইল। তারপর সে ফিরে এল। আয়নার সামনে একটি চৌকি টেনে বসলো।

এই ঘর, এমনি আষাঢ়ের সন্ধ্যা, কত কথাই যে মনে পড়ে।

মনে পড়ে, শুধু মনে পড়ে। স্মৃতি বড় যন্ত্রণা দিতে পারে। দিনে দিনে, একটু একটু ক'রে মানুষকে দগ্ধ করতে পারে।

আজ অনেক কথা মনে পড়ছে। স্মৃতিতে ডুব দিয়ে সে কি শান্তি পাচ্ছে? না। শান্তি নয়, দহন, শুধু দহন-দাহ। কিন্তু এই দহনে জ্বলবার একটা আকর্ষণ আছে বই কি।

লায়লীর কথা মনে পড়ে। এই আয়নার সামনে বসে লায়লী আশমান তাকে গান শোনাতো। কত সন্ধ্যায়, কত সকালে। কিন্তু শুধু লায়লী নয়। আর একজনের কথাও যে মনে পড়ে।

'বজ্ররঙ্গী, বজরঙ্গী, বজরঙ্গী!'

কুন্দনের অন্তর থেকে এক বোবা আহ্বান গুমরে উঠল।

বজরঙ্গী সারেঙ্গীয়া। শ্যামল রঙ। কালো ভুরু, কালো চোখ। চোখদুটি ভীরু মিনতি-ভরা। কোমল ও কাতর চাহনি।

মনে পড়ে লায়লী গান গাইছে আর মুখ নিচু ক'রে সারেঙ্গীতে ছড় টানছে বজরঙ্গী। মাঝে মাঝে সে চোখ তুলছে, লায়লীর চোখে চোখ রাখছে। তখনই তার চোখে যেন আলো জ্বলে উঠছে। কুন্দন দুজনকেই দেখছে। কুন্দনের চোখে একটা সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাব।

'বজরঙ্গী, তোকে আমি বুঝি। আগুন দেখে নির্বোধ পতঙ্গ তুই, পাখা মেলে উড়ে গেলি। বজরঙ্গী, তোর কথা আমি ভাবি। সব সময়ে ভাবি। তোকে আমি বুঝেছি, কিন্তু লায়লী?'

লায়লী বজরঙ্গীকে কোনদিন প্রশ্রয় দেয় নি। সেই একদিন, সেই ভীষণ ও ভয়ঙ্কর সন্ধ্যায়, যেদিন বজরঙ্গীর সারেঙ্গীর সুর চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লায়লী বলেছিল, 'আজ আমার উৎসবের রাত।'

লায়লী সেদিন জলে আতর ঢেলে স্নান করেছিল।

একটি একটি ক'রে সর্বাঙ্গ ভরে কত গহনাই সে পরেছিল। হীরে ও পান্নার কণ্ঠি, মুক্তোর সাতলহর, চুনী-মুক্তোর হার। মাথায় মুক্তোর গহনা, হীরের ঝাপটা। চুনী-মুক্তোর ঝুমকো। হাতে, বাহুতে, আঙুলে, কোমরে, পায়ে গহনা। জরির ওড়না, কালো পোশাক।

সেদিন ওপরের ঝাড়বাতির সবগুলো আলো জ্বলেছিল। পর্দা খুলে দিয়ে জানলা ও দরজায় বেলফুলের গোড়েমালার ঝালর দিয়েছিল ঝুলিয়ে। সারেঙ্গীয়াকে দরজার কোণে বসিয়েছিল লায়লী। নিজে কুন্দনের বুকে মাথা রেখে মদ খেয়েছিল। কাঁচের গেলাসগুলো দেওয়ালে ছুঁড়ে ভেঙেছিল আর হাততালি দিয়ে হেসে বলেছিল, 'কি সুরেলা আওয়াজ!'

সে-রাতে লায়লী কত গানই যে গেয়েছিল! লায়লীর গানে গানে সে-রাতটা বুঝি মাতাল হয়ে গিয়েছিল। জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে কুন্দনের মনে হচ্ছিল আকাশের তারা দুলছে, চাঁদটা দুলে দুলে কাছে আসছে, দূরে যাচ্ছে, আবার কাছে আসছে।

কিন্তু লায়লীকে কাছে পেলেই কি লায়লীকে বোঝা যায়! কুন্দন কি লায়লীকে চিনেছিল! তাই যদি চিনবে তবে সে লায়লীকে হারাল কেন! কি হয়েছিল লায়লীর!

লায়লীর কি হয়েছিল লায়লী কাউকে জানায় নি। শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল। যারা লায়লীকে চিনত তারা আশ্চর্য হয়েছিল। যারা তাকে চিনত না তারা দুঃখ পেয়েছিল। কৌতূহলে উন্মুখ হয়েছিল।

আস্তে আস্তে খবরটা মেটিয়াবুরুজের নবাববাড়ীতেও পৌঁছয়। নবাববাড়ীতে এ-ওকে বলছিল, 'শুনেছ! লায়লীর কথা শুনেছ? সেই যে লায়লী আশমান—!'

ওয়াজিদ আলি শাহ্ আলবোলার নল হাতে বসে আছেন।

কে তাঁকে বলবে?

তখন বেলা এগারটা।

ফটকটা পেরোলে মনে হয় এ যেন লক্ষ্ণৌ। ঐ ফটকের বাইরে ১৮৬৫ সালের কলকাতা শহর। সেখানে ধোঁয়া, ধুলো, মানুষের চেঁচামেচি, কুশ্রী একটা ব্যস্ততা।

ফটকের ভেতর পা দিলে তবে একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। একদিকে ছোট ছোট ঘর। সেখানে বসে কেউ কেউ নবাবের লেখা গান ও কবিতা নকল করছেন। কোন তরুণ কবি উর্দু

শায়ের নিয়ে অপেক্ষা করছেন, একটিবার নবাবকে শোনাবেন। আউধ ক্যাভেলরির বৃদ্ধ অশ্বারোহী কালো ঘোড়াটিকে সস্নেহে ছোলা খাওয়াচ্ছেন। কোথাও বসে কারিগররা টুপি সেলাই করছে, চিকনের কাজ করছে, জরির কারুকাজ করছে।

ফোয়ারায় জল উঠছে। গোলাপ বাগানে মালীরা কাজে ব্যস্ত। কিশোর দাস চীনে বুলবুল ও শ্যামা পাখীকে দানা খাওয়াচ্ছে। বৈঠকখানায় গায়ক গান গাইছেন, কেউ বা সেতারে সুর বাঁধছেন। কোথাও বৃদ্ধ মৌলবী কোরান নকল করছেন।

মাঝে মাঝে ঐ বড় ঘরে আলো জ্বলে, ফরাস পড়ে। পাথুরিয়াঘাটা এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী থেকে গায়করা আসেন। শহরের সঙ্গীত রসিক বাঙালীরা পালকি ও ল্যাণ্ডো গাড়ী চড়ে গান শুনতে আসেন। নবাবের নিজের প্রিয় ভৈরবীটি ধরেন। কিন্তু নবাব সে গান শুনতে পারেন না। 'বাবুল মোরা নইহার' শুনতে শুনতে তাঁর চোখ লাল হয়ে ওঠে, চোখের কোণে জল চিকচিক করে। ও গানটি তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে লেখা। লক্ষ্ণৌ ছেড়ে নির্বাসনে যাবার সবটুকু দুঃখ দিয়ে তিনি ঐ গানটি রচনা করেছেন।

নবাব নিঃসঙ্গ। তাঁর হৃদয় বেদনাভারাতুর। তাঁর দুঃখ কে বুঝবে? কেউ বোঝে না।

নবাবকে যখন খবরটি দেওয়া হলো তাঁর হাত থেকে আলবোলার নলটি পড়ে যায়। প্রৌঢ় নবাব অতর্কিত আঘাতে যেন বিমূঢ় হয়ে যান। তিনি বলেন, 'কে, কে এনেছে এই খবর?'

তারপর তিনি হাত নেড়ে সংবাদবাহককে বিদায় দেন।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকেন। তারপর আস্তে বলেন, 'এখন কি হবে? আমার ঈশ্বরলালের ঘরোয়ানা সে কার হাতে দিয়ে গেল, কার হাতে?'

প্রাসাদে সবাই বিস্মিত হয়েছিল।

'তবে কি লায়লী আশমানের প্রতি নবাবের—?'

'হবেও বা! ওকে যে বার বার ডাকতেন।'

'রূপ যে ছিল আগুনের মতো। নবাব কি—?'

এমনি নানাকথা মুখে মুখে ফিরেছিল।

নবাবের কথা শুনে সবাই আশ্বস্ত হলো। না, লায়লীর জন্যে নয়। লায়লীর গানটি যে হারিয়ে গেল, তাই ওঁর মন হাহাকার ক'রে উঠেছে।

ওয়াজিদ আলি শাহ ভাবছিলেন।

লায়লীর কথা নয়। ঈশ্বরলালের কথা। তাঁর যৌবনের বন্ধু ঈশ্বরলাল, যার মতো গান গাইতে আর কাউকেই শুনলেন না। ঈশ্বরলাল, লায়লীর মা মেহরুনকে ভালবাসত। ভালবেসে ঐ গায়কী সে মেহরুনকে উপহার দেয়।

ওয়াজিদ আলি বলেছিলেন, 'এ কি করলে ঈশ্বরলাল? কাকে তোমার গায়কী দিলে?'

'আলি ভাইয়া, আমার ভালবাসার মানুষকে।'

'ঈশ্বরলাল, তবে তুমি ওকে বিয়ে কর। তোমাদের সন্তান ঐ গায়কী বহন করবে। কিন্তু এ কি বলছি? তা তো হয় না। তুমি যে হিন্দু।'

'আলি ভাইয়া, ওর জন্যে আমি ধর্ম ছাড়তে পারতাম। ও রাজী হয় না। কিন্তু ভাবনা কেন? মেহরুনের মেয়েকে দেব। ও আমার গায়কী রাখবে।'

'ওর মেয়ে, কে?'

'লায়লী, লায়লী আশমান!'

লায়লী, বাইশ বছরের লায়লী, তার কণ্ঠে যে ঈশ্বরলালের গায়কীটি সুরক্ষিত ছিল। কাঁচের পানপাত্র যেমন সযত্নে দামী ও দুষ্প্রাপ্য শরাব ধরে রাখে, ঐ লায়লী-ও যে তাই রেখেছিল।

সেই লায়লী চলে গেল?

লায়লী চলে গেছে। পানপাত্র ভেঙে গেছে। ঈশ্বরলালের সেই অনন্য, অতুল গায়কী আজ হারিয়ে গেছে।

ওয়াজিদ আলি শাহ্ মাথাটা নাড়লেন।

আলবোলার নলটি তুলে নিলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন, 'পরম করুণাময়, দয়াল ঈশ্বর, এবার আমাকে ডেকে নাও। এ দেহকে কি সুখে কি দুঃখে অনেকদিন বহন করেছি। এবার তুমি আমায় নাও। এ দেহটা মাটি হয়ে যাক। একটি একটি করে মানুষ সরে যায়, আমি যে আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি!'

একবার তিনি বললেন, 'ওরে, লায়লী কেন মরলো তা তোরা জানিস?'

তারপর বললেন, 'না না, বলতে হবে না। থাক।'

নবাব জানতে চান নি।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা, নির্জন ঘরে, অন্ধকার একটা চিন্তা কুন্দনের মনটা ভারী ক'রে তুলল। সে শুনতে পেল, একটা পাখী আঁধার দেখলে যেমন পিঁজরার মধ্যে ছটফটিয়ে ডানা ঝাপটায়, তেমনিই, ঠিক তেমনি ক'রে একটা প্রশ্ন কুন্দনের বুকের মধ্যে ডানা ঝাপটাচ্ছে। বার বার।

কেন লায়লী মরল? কি সে দেয়নি লায়লীকে? লায়লী মরল কেন?

কুন্দন উঠল। দেওয়ালের হুক থেকে দড়ি টানল। তারপর 'টুংটাং! রিমঝিম!' শব্দ হলো। কাঁচের ঝাড়টা নেমে এল। সে ঝাড়ের একটি মোমবাতি জ্বালল। বাতিটি তুলে নিল এবং বাতিদানে বসাল। বাতিদানটি দেওয়ালের কুলঙ্গীতে রাখল। তারপর আয়নার পর্দাটা সরাল।

না। আয়নায় তার মুখের ছবি সে দেখতে পাচ্ছে না। কাঁচে কি এত ধুলো পড়েছে? কুন্দন রুমাল দিয়ে আয়নার কাঁচটি মুছতে লাগল।

না। কোনমতেই যেন পরিষ্কার হতে চায় না।

তখন কুন্দনের মনে পড়ল। সে ঘণ্টা বাজাল। চাকর এল। এক গেলাস জল আনল। এক বাণ্ডিল কাগজ আনল। জলে কাগজ ভিজিয়ে সে আয়নাটা মুছতে লাগল। চাকরটা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল এবং বেরিয়ে গেল।

কাঁচটা ঘষে ঘষে ঝকঝকে করলো কুন্দন।

কাঁচে আর কোনও ধুলো নেই।

কিন্তু কোন প্রতিচ্ছবি-ও নেই।

কুন্দন বিস্মিত হলো। তারপর তার শরীর দিয়ে, শিরদাঁড়া দিয়ে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে গেল।

আয়নাতে তার মুখের ছায়া তো পড়ছে না। ছায়া পড়ছে না, প্রতিচ্ছবি নেই।

কুন্দন মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল। তার মাথাটা যেন ঝিমঝিম করছে। তার প্রতিটি ইন্দ্রিয় যেন কিসের প্রতীক্ষায় উন্মুখ, অধীর। এবার অলৌকিক কিছু ঘটবে। মৃত্যুর ওপার থেকে যবনিকা ঠেলে ফেলে সে এগিয়ে আসবে। কুন্দনকে দেখা দেবে লায়লী আশমান।

কুন্দনের মনে হলো অনেকদূর থেকে যেন তানপুরা বাঁধার রিম-ঝিম শব্দ শোনা যাচ্ছে।

চামেলীর সুবাস। চামেলীর আতরের সুবাস। অতি ক্ষীণ, অতি মৃদু সে গন্ধ যেন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

চামেলীর আতর? হ্যাঁ, চামেলী ছাড়া অন্য কোন ফুলের আতর তো সে ব্যবহার করত না। তবে সে এসেছে।

কুন্দনের এবার নেশা ধরেছে। সে চেয়ে আছে আমার দিকে। তার নাকে আতরের গন্ধ আসছে। কানে আসছে বাজনার শব্দ—রিমরিম রিমঝিম! শুধু কি বাজনা? সেই সঙ্গে গান-ও কি শোনা যাচ্ছে না?

কুন্দনের মনে হলো সে গান শুনতে পাচ্ছে, হয়তো খুবই ক্ষীণ সে সুর। হয়তো সে সুর হালকা প্যায়ে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। তবু সে শুনতে পাচ্ছে!

'লাগ্‌তা নহী হ্যায় জী মেরা......'

এ তো সেই গান! এ গান যে সে বার বার গাইত।

কোমল শাদা আঙুলে সে কালো বেণী সামনে টেনে আনত। বেণীর সোনার ফুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে এই গানটি গেয়ে গেয়ে সে ঘুরত।

লায়লী।

তবে কি লায়লী এসেছে? সহসা, কুন্দনের মনের সকল সংশয়কে তীব্র তিরস্কার ক'রে আয়নার মধ্যে কতকগুলো রেখা নড়ে উঠল। যেন আয়নার ওপর কেউ জলের দাগ এঁকে চলেছে।

বাতিটা তুলে ধরলো কুন্দন। তার হাত ঠাণ্ডা, চোখ বিস্ফারিত। লায়লী নয়, লায়লী নেই।

কুন্দন দেখলে সারেঙ্গীটা নামিয়ে রেখে কে যেন মাথা তুলল। মুখটা তার চেনা।

কপালে চুল ঝুলে পড়েছে, ঐ কপালটি তার চেনা। ঐ চোখ দুটি তার চেনা। ভাসা ভাসা চোখ, হাসিভরা চোখ। সে চোখের চাহনি বড় কোমল, বড় করুণ।

তাকিয়ে রইল কুন্দন। 'আমি তোকে চিনি। আমি কি তোকে ভালবাসিনি? ভালবেসেছি। কুন্দনের ভালবাসা বড় হিংস্র, বড় নির্মম! সে ভালবাসা যার ওপর পড়ে, তাকেই গ্রাস করতে চায়। তুই সে কথা ভুলে গেলি। তোর অধিকারের গণ্ডী তুই পেরিয়ে গেলি। লায়লীর মুখের উপর তোর চোখদুটো স্থির হয়ে থাকত। তুই ভুল করেছিলি।'

'বজরঙ্গী।'

কঠোর গলায় ধমক দিল কুন্দন। কিন্তু বজরঙ্গী আজ আর তার ধমক শুনে চমকে উঠল না। তার দৃষ্টি হতাশ এবং করুণ। বজরঙ্গী কুন্দনের দিকে চাইল তারপর মাথা নিচু করল।

না। আয়নায় আর কোন প্রতিচ্ছবি নেই।

কুন্দন কাঁপতে কাঁপতে বাতিদানটা রাখল। তার শরীর অবসন্ন। থরথর ক'রে কাঁপছে দেহ।

সে একবার বারান্দায় গেল। আবার ঘরে এল। সে আয়নার সামনে দাঁড়াল। আয়নার কাঁচটা কি ঠাণ্ডা! লায়লীর আয়না যে! লায়লী আশমানের হৃদয়ে কোন উত্তাপ ছিল না।

হ্যাঁ। দেখা যাচ্ছে বই কি। জিজ্ঞাসার যন্ত্রণায় কাতর একটি মুখ। কুন্দনের নিজের মুখ।

তবে কি সব মিথ্যা?

সেই সুর?

কুন্দনের বুকের মধ্যে সে সুর বাজছিল।

সেই চামেলীর সুবাস? সেও কি তার বিভ্রান্ত, দিশাহারা মনের কল্পনা? লায়লীর আতর-সুবাসিত চুলের সৌরভ নয়?

লায়লী, লায়লী, লায়লী!

কুন্দনের ভাঙাগলার ডাকটা কুন্দনকেই ব্যঙ্গ করলো। আয়নার সামনে চিকনের পর্দাটা টেনে দিলো কুন্দন। জীবনে লায়লী তার কাছে সহজ হয়নি। মৃত্যুর পরেও যে সে শুধু কৌতুকই করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

মাথা নিচু করে বসে রইলো কুন্দন। বুকের ভেতরে তার অনেক কথা অনেক গান, অনেক কলি ছোট ছোট বুদ্বুদের মতো ভাঙছে আর ভাঙছে।

শামাদানের বাতিটাও একসময়ে নিভে গেল। তখন খিদিরপুরের রাস্তায় রাত হয়েছে। অনেক দূরে মসজিদে কেউ রাতের নামাজ পড়ে নিচ্ছে। বুঝি সারাদিন সময় মেলেনি। আর কুন্দনলালের বাগানে চামেলী-জুঁইয়ের ঝাড়ে ভিজে বাতাস ঝাপটে ঝাপটে একটা সুগন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সবই সেইরকম আছে। যা তিনবছর আগেও ছিল। শুধু লায়লী আশমানের শখের ঐ জুঁই-চামেলীর মালা আর ঝাড় থেকে দোলে না। আর, লায়লীর শয়নকক্ষের জানলা দিয়ে, মূর্খ বজরঙ্গী আর সারেঙ্গীর ছড়ে লায়লীরই গানের সুরের ভেট পাঠায় না।

'কোঈ বেদরদী গুলেঁ বুলবুলকো ন সতানা—'

কোনো বেদরদী গোলাপের কাঁটা যেন বুলবুলকে দুঃখ না দেয়।

কিন্তু কুন্দন কি এক নির্বোধ বাগবান? সেই বাগবানের মালাকার?

তাই যদি না হবে, তবে সে কেন একলা আজ বসে আছে? নিষ্ঠুর হৃদয়া গোলাপ, আর নির্বোধ বুলবুল—দুজনেই চলে গিয়েছে।

তার কি শুধু ভাঙা আসরে বসে থাকবার কথা ছিল?

বেরিয়ে এল কুন্দন। মালীকে বললে—বন্ধ করে দিতে বাগান-বাড়ীর দরজা। আজকে রাতে সে ফিরে যাবে বাড়ীতে। ফিরে গিয়ে ডাকবে শিরীনকে। জিজ্ঞাসা করবে, সে কি জানে? কেন লায়লী আশমান, বজরঙ্গীর মৃত্যুর খবর পেয়ে যে হেসে উঠেছিল, সে কেন এমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল? শিরীন কি তার জবাব জানে?

॥ দুই ॥

শিরীনের সঙ্গে কুন্দনলালের যখন আলাপ হয় তখন শিরীনের বয়স হয়েছে। শিরীনকে কুন্দন যখন দেখল তখন শিরীনের বড় দুঃসময়। প্রৌঢ় বয়সে সে নিসারকে ভালবেসেছে।

নিসার পিয়ারে খাঁর ভাই। পিয়ারে খাঁ নামকরা সানাইবাদক। ওয়াজিদ আলি শাহ লক্ষ্ণৌ এবং কলকাতার যে সব কলাবন্তদের গুণে মুগ্ধ ছিলেন পিয়ারে খাঁ তাঁদেরই একজন।

লায়লী বলত, 'জান কুন্দন, শিরীনের কথা ভাবলে আমার দুঃখ হয়। শিরীন এত ভাল কিন্তু এ কি বোকামি করল বল তো?'

শিরীন রূপসী নয়।

ময়লা রঙ, শান্ত কোমল চেহারা। বেশ ভারী গড়ন। শিরীনের মনটি নরম। ধর্মে মতিগতি আছে। গরীবকে ফকিরকে দান-ধ্যান ক'রে থাকে। বিহারের মখ্‌দুমপুর আর ঃ আজমীর—তীর্থ ভ্রমণে সে বছর বছরই যায়।

শিরীনের মুখে লাবণ্যের একটি স্নিগ্ধদ্যুতি দেখা যেত। যে জন্যে অনেকেই তাকে রূপসী বলে ভুল করত।

শিরীনের নাম মুখে মুখে ফিরত। তার কারণ শিরীনের অপরূপ কণ্ঠ-লাবণ্য। গান শেখবার জন্যে সে অনেক কষ্ট করেছে। পুরুষ গায়করা শিষ্যত্ব স্বীকার করলেই গান শিখতে পারেন। শিরীনের কাছে অত সহজ হয়নি। অনেক দাম দিতে হয়েছে তাকে। অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছে।

তারপর একদিন সে সাধনায় উত্তীর্ণ হয়েছে। শিরীনের গান শুনলে মনে হয় ওর গলায় যেন কোন দুর্লভ মায়া আছে। সে মায়া শ্রান্তি জুড়িয়ে দেয়, শান্ত করে।

শিরীনের কাছে অনেকেই গান শুনতে আসে. একদিন নিসারও এসেছিল।

গান হয়ে গেলে সে হঠাৎ নেশার ঝোঁকে বলতে শুরু করল, 'আহা এমন গলা কখনো শুনিনি। সুর যেন টলটল করছে, ছলছল করছে। যেন একটি সুগভীর সরোবরের জল। তৃষ্ণার্ত পথিক সে সরোবরের জল পান ক'রে সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায়। শিরীন বাঈয়ের গান মাঝে মাঝে শুনতে পেলে আমিও সব দুঃখ সব বেদনা ভুলতে পারব।'

সেদিন শিরীন তাকে আমল দেয়নি।

নিসারের মাথায় যেন ভূত চাপল। সে সময়ে অসময়ে শিরীনের দরজায় বসে থাকে। গান শুনতে তার ভাল লাগে কি না বোঝা যায় না। তবে মাঝে মাঝেই কেঁদে-কেটে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়। বলে, 'আহা জীবনে আর কোন দুঃখ রইল না!'

একদিন শোনা গেল শিরীন নিসারকে তার বাড়ী নিয়ে গেছে। শুনে লায়লী তার কাছে গেল। বলল, 'তুমি দেখছি পাগল হয়েছ! তোমার সম্মান, তোমার মনের শান্তি সব ও নষ্ট করবে। তুমি ওকে জান না!'

অন্য কেউ হয়তো রাগ করত, শিরীন রাগ করেনি।

শিরীন মাটির দিকে চেয়ে থেকেছে। তারপর বলেছে, 'কি জানি কেমন ক'রে কি হয়ে গেল!'

লায়লী বলেছে, 'ও আমার চেয়ে বয়সে কত ছোট তা জান?'

'জানি লায়লী। ও প্রায় সাত আট বছরের ছোট!'

লায়লী নিসারকে ডেকেছে। বলেছে, 'নিসার, তোমার কি নেশার পয়সা আর জুটছে না? শেষ অবধি ভালমানুষটার কাঁধে ভর করলে?' শিরীন ভয় পেয়েছে।

ভেবেছে এই বুঝি মারামারি লেগে গেল একটা।

কিন্তু নিসার চুপ ক'রে লায়লীর সব কথা শুনেছে। তারপর বলেছে, 'কি করব? চলে যাব? ও যেতে দেবে?'

লায়লী বলেছে, 'তুমি একটি হতভাগা। সকলের কাছে গিয়ে ঐ রকম ছলছলে চোখে কথা কও, সবাই ভাবে আহা ও কি দুঃখী! আমি তোমায় চিনি না? শিরীন, ভাল চাও তো ওকে তাড়িয়ে দাও।'

নিসার বলেছে, 'হ্যাঁ শিরীন। তাই ভাল। তুমি আমায় তাড়িয়েই দাও।' শিরীন ছলছল চোখে একবার লায়লীর দিকে একবার নিসারের দিকে তাকিয়েছে। তারপর বলেছে 'ঠিক দুপুরবেলা অসময়ে কি চলে যাওয়া ভাল?'

লায়লী তখন হেসেছে।

তীব্র বিদ্রূপ এবং গভীর করুণা একসঙ্গে শোনা গেছে তার হাসিতে। সে বলেছে, 'শিরীন, ওকে যেতে দেবার মতো সময় আর হবে না তোমার! সব সময়কেই মনে হবে অসময়। আমি চলি। তবে একটা কথা বলে যাই, ওকে বেশী প্রশ্রয় দিও না। ওর হাতে বেশী টাকা দিও না! ওর ভাই, মা, কেউ ওকে সহ্য করতে পারেনি। তুমি কি পারবে?'

শিরীন রুদ্ধকণ্ঠে বলেছে, 'আমি ওকে ভালবাসি লায়লী।'

'ওর বড় ভাই, ওর মা সবাই ওকে ভালবাসত শিরীন! ভালবাসাটা ও বড্ড বেশী পেয়েছে, সহজে পেয়েছে। তাই ও ভালবাসার দাম বোঝে না। যারা ওকে ভালবাসে তাদেরই ও ব্যথা দেয়, বার বার।'

লায়লী চলে এসেছে। কুন্দনকে বলেছে, 'শিরীনকে দেখলে বড় কষ্ট হয়। সব ও হারাবে একে একে। সম্মান, শান্তি, সব!'

নিসারকে শিরীন একটু একটু ক'রে চিনেছে।

এই বয়সে ভালবাসার জ্বালা শিরীনকে একটু একটু ক'রে পুড়িয়েছে।

মনের সুখ গেল, শান্তি গেল। এতদিন পরে রূপচর্চার জাদু সব শিখতে হলো। পাকাচুল কেমন ক'রে কালো করতে হয়, চোখে কোন সুর্মা পরলে ভাল দেখায় এ সব জানতে হলো।

অথচ সাজসজ্জা করে ভয়ে ভয়ে। মুখে চোখে একটা ভিতু-ভিতু ভাব। বেশ আত্মসহ একটি প্রশান্তি ছিল তার। সে সব কোথায় চলে গেল।

অথচ তার সাজসজ্জা প্রসাধন দেখলে পরে নিসার কি নির্মম ঠাট্টাই না করেছে!

শিরীন বুঝেছে লায়লীর প্রত্যেকটি কথা ঠিক। নিসারের মন প্রাণ বলে যেন সত্যিই কিছু নেই।

মেয়েদের মন নিয়ে সে অবাধে খেলা করে।

যখন যে নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় তার সঙ্গেই সে বসবাস করে।

তার পয়সা নিয়ে জুয়া খেলে। তার পয়সায় নেশা করে। তারপর একদিন সরে যায়।

সরে যায়, চলে যায়। যার কাছ থেকে সরে যায় তাকে আর মনে রাখে না।

তবে নিসার একেবারে শুধু হাতে নেয় না।

বিনিময়ে সে-ও দেয়, দিতে চায়।

নিসার কবি। কবিতা লেখে।

কলকাতায়, ১৮৬০-৬২ সালে উর্দু কবিতা ও পার্শী গজলের সমঝদার মানুষ কোথায়? তবে ওয়াজিদ আলি শাহর মেটিয়াবুরুজের বাড়ীতে মাঝে মাঝে কয়েকজন কবিকে দেখা যায়।

মাঝে মাঝে মুশায়েরা হয়। আশীক বুলবুল এবং মাসুক গোলাপ, গদীচ্যুত নবাবের দুঃখ, নবাব বিহনে লক্ষ্ণৌ নগরীর বিরহ বেদনা, ভগবৎ প্রেম এইসব বিষয় নিয়ে কবিরা 'শ্যার' রচনা করেন।

কিন্তু তাতে পেট ভরে না।

নিসার-ও কবি। সে মাঝে মাঝে কুন্দনের কাছে এসেছে। কুন্দন বলেছে, 'লজ্জা করে না তোমার? ছি ছি! তার চেয়ে তুমি কাজ কর না কেন?'

নিসার বলেছে, 'কাজ করবে মূর্খরা। আমি কাজ করব কেন? জান, আমি কাজ করছি জানলে শিরীন ভারী দুঃখ পাবে।'

নেশার ঝোঁকে অনেক কথাই বলেছে নিসার।

নিসার সামনে বসে বলেছে, 'আমি বড় খারাপ লোক। সুন্দর সুন্দর কথা বলে শিরীনের মন ভোলাই আমি।'

ঐ সুন্দর কথা, সুন্দর কবিতাই নাকি শিরীনকে যুবা ক'রে রেখেছে।

লায়লী বলেছে, 'শিরীন মূর্খ, শিরীন বোকা।'

নিসার বলেছে, 'তা হবে। নইলে আমার মতো একটা ঝুটো কাঁচকে দেখে ও ভুলল কেন বল?'

কুন্দন নিসার ও লায়লীর কথা মন দিয়ে শোনেনি। সে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে থেকেছে আর মনে মনে ভেবেছে ব্যবসার কথা।

কে জানে মসলার নৌকোগুলো বাবুঘাটে খালাস করা হলো কি না! খুড়তুতো ভাইটি ত্রিনিদাদে গেছে কবে ফিরবে জানা যাচ্ছে না। কুন্দনের খুব ইচ্ছে ও ফিরে আসুক। বড়বাজারের গদীতে এবার ভাইপোকে বসিয়ে দেবে।

ব্যবসার কথা ভাবতে ভাবতে কুন্দন নিসারের দিকে মাঝে মাঝে চেয়েছে।

নিসার তখন উঠে পড়েছে। বলেছে, 'খুব শয়তান আমি। আমাকে তাড়িয়ে দিও। জুতো মেরে বের ক'রে দিও।'

সে চলে যাবার সময় টাকা চেয়েছে কুন্দনের কাছে।

তখন লায়লী বলেছে, 'ওকে আর টাকা দিও না। ওকে ঢুকতে দিও না। সত্যিই ঢুকতে দিও না।'

কুন্দন হেসে বলেছে, 'তুমি যে ওকে ভালবাস লায়লী!'

লায়লী বলেছে, 'সেকথা সত্যি। দেখেছ তো পিয়ারে সাহেবকে—বড়ে ভাই বলি তাঁকে তিনি লক্ষ্ণৌ-এ থাকেন। যদি কখনো আসেন, ওর সঙ্গে দেখা করেন না। উনি ওর সৎভাই ওকে মানুষ করার জন্যে কত চেষ্টা করেছেন। বড় ভালবাসেন ওকে। নিজের ছেলের চেয়ে বেশী। নিসারের মা-কে আমি বলি দুধ আম্মা। আমায় ছোটবেলায় দুধ দিয়েছেন। তিনি বড়ে ভাইকে কত বকেছেন। বলেছেন, 'তুমি ওকে বড় আদর দাও। অত আদর দিও না। শেষ অবধি ও নিজের মা-র গয়নার বাক্স নিয়ে বাড়ী থেকে পালাল। সেদিন থেকেই বড়েভাই ওর সঙ্গে

সব সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। বললেন, ও যেদিন মানুষ হবে সেদিন ওকে কাছে ডাকব। আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি কুন্দন।'

তারপর লায়লী বলেছে, 'আমি না হয় ওকে চিনি। তুমি কেন ওকে প্রশ্রয় দাও বল তো?'

'তুমি বল।' কুন্দনের গলাটা ভারী এবং উদাস।

'কি জানি! বুঝি না। তুমি হিসেবী মানুষ, ব্যবসায়ী মানুষ। তুমি ওকে যখন এমনি এমনি টাকাগুলো দাও, আমার যেন কি রকম অবাক লাগে! তুমি কি আমায় ভালবাস?'

লায়লীর গলায় প্রগাঢ় কৌতুক। চোখের দৃষ্টি দুর্বোধ্য।

কুন্দন লায়লীর দিকে চেয়ে থেকেছে। লায়লীকে নিজের বুকখানা খুলে দেখাতে সাধ যায় তার। ভালবাসতে সে জানে না। ভালবাসা সে পায়নি। কুন্দনের সারাজীবনে একটি মানুষই কুন্দনকে ভালবেসেছে। নিঃস্বার্থভাবে। আর সব কিছুই কুন্দনকে টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে।

লায়লীকে সে ভালবেসেছে। কিন্তু সে কথা বলতে সে ভয় পায়। লায়লী যদি ঠাট্টা করে! লায়লী যদি বলে বসে, 'যেদিন আমায় এনেছিলে সেদিন কি কথা দিয়েছি তা মনে ক'রে দেখ কুন্দন। সেদিনই বলেছি ভালবাসতে আমি পারব না। তবে তুমি আমাকে এত ঐশ্বর্য দিচ্ছ, আমি তোমার কাছে বাঁধা থাকব। অন্য কারো কাছে যাব না। যতদিন আমার দাম দিতে পারবে ততদিন আমি তোমার।'

কুন্দন তাই লায়লীকে জবাব দেবার আগে একটু ভেবেছে।

ভেবে বলেছে, 'তোমাকে খুশী করবার জন্যে কত কি-ই তো করি! ওকে না হয় ক'টা টাকা দিলামই!'

এই সময়েই শিরীনকে প্রথম দেখে কুন্দন। দেখে তার খারাপ লাগে। কেন খারাপ লাগে তা সে বোঝেনি। পরে ভেবে দেখেছে, শিরীনের বয়স হয়েছে। কিন্তু বয়সের প্রশান্ত ও সৌম্য ভাব নেই। কেমন যেন ছন্নছাড়া ভাব একটা। দেখতে ভাল লাগে না। মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে যায়। কুন্দন মেয়েদের ছন্নছাড়া ভাব দেখতে পারে না। নিজের বাড়ীতে অন্তঃপুরে সে কমই যায়। বিশেষ বিশেষ দিনে সে জ্যাঠাইমা, কাকীমা, বা ঠাকুরমার কাছে গিয়ে খায়। তাও রাত ছাড়া তার সময় হয় না।

কুন্দন দিনের বেলা কিছু খায় না। একবার মাত্র খায়, তা-ও রাতে।

তবু সে জন্যে অনেক আয়োজন হয়। অনেকগুলো মানুষ নানাবিধ সুখাদ্য রচনায় ব্যস্ত থাকে। অনেক রাতে কুন্দনের চাকর ঘণ্টা বাজায়। মহারাজ খাবার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠাকুমা এসে চৌকিতে বসেন। রুপোর থালার দু'পাশে মোমবাতি জ্বলে। একজন বৃদ্ধা দাসী ধীরে ধীরে বাতাস করে। মোমবাতির আলো নেভে না, অথচ কুন্দনের থালায় বাতাস লাগে। কুন্দন গরম খাবার খেতে পারে না।

সে যেদিন অন্তঃপুরে যায়, সেদিন সকাল থেকে দাসীরা ঘরদোর, দেওয়াল, দরজা জানালা ঘষে মেজে পরিষ্কার রাখে। মেয়েরা চুল বেঁধে, পরিষ্কার কাপড় পরে তটস্থ হয়ে ঘোরে। এমন কি শিশুদের পরনেও পোশাক দেখা যায়।

শিরীনকে দেখে কুন্দন ভ্রূ কুঁচকে মুখটা ফিরিয়ে নেয়। লায়লীকে বলে, 'এই তোমার শিরীন! আমার মোটে ভাল লাগল না।' লায়লী উপুড় হয়ে শুয়েছিল।

উপুড় হয়ে শুয়ে সে হাতটা ছড়িয়ে দিয়েছিল। একটি দাসী তার হাতের আঙুল, নখ মেহেদি দিয়ে রঙ করছিল।

কুন্দনের কথা শুনে লায়লী খুব হাসল। বলল, 'এখন ওকে দেখে ভাল লাগবে না কুন্দন। এখন ওর বড় দুঃসময়। নিসারকে ভালবেসে ও বিপদে পড়েছে। এখন ও চোরাবালিতে ডুবছে। যে চোরাবালিতে ডুবছে তার মুখে-চোখে সর্বনাশ দেখা যাবে কুন্দন! শিরীনকে দেখলে আমারই যেন ভয় করে।

॥ তিন ॥

শিরীনও নিসারকে চিনেছে।

লায়লীর ভবিষ্যদ্বাণী সবই সত্যি হয়েছে। শিরীনের মনে শান্তি নেই, সে অস্থির, অশান্ত। ভালবাসার ক্ষুধা তাকে গ্রাস করেছে। নিসার তা দেখে ব্যঙ্গ করেছে। কোন কোন দিন নিসার দিনমান এবং সারারাত বাইরে কাটিয়ে এসেছে। শিরীন বলেছে, 'জান, আমি কাল খাইনি। তোমার জন্যে বসেছিলাম।'

'তা ভালই করেছিলে। মাঝে মাঝে উপোস দিলে এ বয়সে তো ভালই।'

শিরীন বলেছে, 'এত নিষ্ঠুর তুমি? আমাকে বয়সের কথা বলে খোঁটা দাও? যাও, যাও এখান থেকে। বেরিয়ে যাও।'

নিসার ফরাসে গড়িয়ে পড়েছে। বলেছে, 'রাগ ক'রো না। রাগ করলে চোখের পাশে রেখা পড়ে, ঠোঁট কুঁচকে যায়।'

তারপর বলেছে, 'কিছু খেতে তো দাও। বড় খিদে পেয়েছে।'

শিরীন বলেছে, 'যাও না, যেখানে ছিলে সেখানেই যাও। এলে কেন?'

'বাঃ, কাল ছিলাম লায়লীর কাছে। ও আমায় বকছিল। পোড়া রুটি আর আচার দিয়ে বলছিল, ওর চেয়ে ভাল খাবার আমার জোটা উচিত নয়।'

'কেন, লায়লীর কাছে কেন?'

'ভাল লাগে শিরীন। হাজার হলেও ও রাগলে, বকলে, মুখনাড়া দিলে দেখাতে তো সুন্দর লাগে। তা দেখেও সময় কাটে বেশ।'

শিরীন নিশ্বাস ফেলেছে। দাসীকে বলেছে, 'যা, খাবার নিয়ে আয় এখানে।'

'মালকিন, আপনার খাবার-ও আনব?'

'স্নান না ক'রে ফকির ভিখিরীকে খাবার না দিয়ে আমি কবে খাই?'

নিসার হেসেছে। বলেছে, 'ভাল ভাল। এ বয়সে ধর্মকর্ম করা ভাল। সত্যি শিরীন একটা কথা বলব?'

'বল।'

'বড় ভাল তুমি। তোমার তুলনা নেই! তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। শুধু একটি দোষ তোমার!'

'শুধু একটি?'

'হ্যাঁ শিরীন। তুমি আমায় বড্ড ভালবাস, বড় আশা কর আমার কাছে। আমার কি মনে হয় জান?'

'কি?'

'যেন আমি যা চাই তা হঠাৎ একদিন পাব।'

'কি নিসার?'

'হঠাৎ একদিন দেখব তুমি আর আমায় অন্ধভাবে ভালবাস না। হারামজাদা, শয়তান বলে গাল দাও। দরকার হলে দু'ঘা মার। আমি যেখানে যখন ইচ্ছে থাকি পরোয়া-ও কর না। তা যদি হতো কি সুখেরই হতো জীবন! তুমি তোমার মতো থাকতে, আমি আমার মতো থাকতাম।'

'বুঝলাম।'

'ছাই বুঝলে। ভালবাসা বড় সর্বনেশে জিনিস। এই দেখ না তোমার গান শিকেয় উঠেছে, সব নষ্ট করছ আমার জন্যে। আরে, আমি একটা জানোয়ার। আমি কি মানুষ?'

'তুমি লায়লীর বাড়ী যাও কেন?'

'এই খেতে-টেতে দেয়। কুন্দন নেশার পয়সা দেয়। কেন, লায়লীর কথা কেন?'

শিরীন জবাব দেয়নি। নিসারকে খেতে দিয়েছে, পরিচর্যা করেছে। তারপর এক সময়ে নিসার আর সে পাশাপাশি বসেছে। সুখ-দুঃখের কথা কয়েছে। শিরীন বলেছে, 'তুমি লায়লীর কাছে যাও, কুন্দন রাগ করে না?'

বলেই তার নিজেকে যেন বড্ড ছোট মনে হয়েছে। নিসার একটু চুপ ক'রে থেকেছে। তারপর বলেছে, 'লায়লী তোমার কত প্রশংসা করে! ও তো জানে না তুমি কত ছোট হয়ে গেছ।'

শিরীন নীরবে কেঁদেছে। নিসার বলেছে, 'আমিই তোমার মনে এত সব ক্ষুদ্রতা ঢোকালাম।'

তখন শিরীনের অসহ্য লেগেছে। চোখের জল মুছে ভ্রূকুটি ক'রে সে বলেছে, 'নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে কর কেন? তুমিই ঢোকালে আমার মনে পাপ? না নিসার, এত ক্ষমতা তোমার নেই। আমার মধ্যেই এইসব দোষ ছিল, আজ সুযোগ পেয়ে মাথা তুলছে।'

'আহা, তা না হয় বুঝলাম। তবে আমার সঙ্গে আলাপ হয়ে তোমার ক্ষতি হয়েছে তা মান তো?'

'জানি না।'

'একদিন বুঝবে, আমি চলে গেলে বুঝবে।'

'হ্যাঁ, তুমি মাটির নিচে যাও, তারপর হিসেব করব। তার আগে নয়।'

'কিন্তু একটা কথা তুমি শোন। লায়লীকে তুমি হিংসে ক'রো না। লায়লীর চেয়ে তোমার প্রতি ঈশ্বর অনেক সদয়।'

'তার মানে?'

'ওকে শুধু রূপই দিয়েছেন তিনি। তোমাকে হৃদয় দিয়েছেন, দয়া, মায়া, মমতা, কত আভরণ যে দিয়েছেন তা দেখতে পাও না শিরীন।'

'তুমি দেখতে পাও?'

'তা পাই বই কি! দেখি আর কষ্ট পাই। আমার মতো একটা হতভাগার জন্যে সব নষ্ট হয়ে গেল তোমার।'

'নষ্ট?'

'বাঃ নষ্ট হয়ে গেল না? তোমার অন্য সব গুণের কথা কে মনে রাখছে শিরীন? সবাই বলছে ভালবাসার নেশায় শিরীন পাগল হয়ে গেল।'

'বলুক।'

কিছুদিন খুব সুখে-শান্তিতে কাটে।

আবার একদিন নিসারকে পাওয়া যায়নি। শিরীনের চাকর টেরিটি বাজার, জাহাজঘাটা, জানবাজার সর্বত্র ঘুরেছে আর নিসারকে খুঁজেছে। তারপর শিরীন মনের দুঃখে সব ভুলে গেছে। সে ভেবেছে নিসার আর লায়লী হয় তো বসে বসে শিরীনকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে।

তার চোখ দিয়ে জল পড়েছে। দাসীকে বলেছে, 'আয়না আন তো!'

আয়না ধরে দেখেছে গালে মেচেতার দাগ, রগের কাছে পাকা চুল। নিজেকে উপযাচিকার বেশে সাজাতে সাজাতে নিজেকেই ঘেন্না করেছে সে। তারপর ভাল কাপড় পরে, চুল বেঁধে মুখে সফেদা ঘষে সে গাড়ীতে গিয়ে উঠেছে।

মাণিকতলার কাছে পীরসাহেবের দরগার সামনে গাড়ী থামিয়ে সে প্রার্থনা করেছে। টাকা রেখেছে চাদরের ওপর। ভগবানকে ডেকেছে, পীরের মুবারক চেয়েছে। বলেছে, 'আমার মন থেকে এই দুর্বলতাটা কাটিয়ে দাও। তোমার দরগায় আমি আসল জরির ঢাকনি দেব, রুপোর শামাদান দেব। হে প্রভু, আমাকে দয়া কর। এ ভালবাসা আমাকে ধুলোয় টেনে নামাচ্ছে।'

তারপর লায়লীর বাড়ীতে ঢুকেছে তার গাড়ী।

লায়লী আর নিসার, নিসার আর লায়লী। কে জানে ওরা কি করছে। শিরীনের মনে সন্দেহ মাথা কুটছে, শিরীন সন্দেহের জন্যে নিজেকে ঘেন্না করেছে।

লায়লী প্রত্যেকবারই তাকে বিস্মিত করেছে।

কখনো শিরীন দেখেছে লায়লী তার আয়নার সামনে বসে আছে। দাসী তার চুলে ফুলের মালা পরাচ্ছে। ফুলের মালা, ফুলের দুল, বেলকুঁড়ির মালা হাতে জড়ানো। কুন্দন হয়তো চোখ একটু মেলে দেখছে, নয় তো চোখ বুজে বসে আছে।

কখনো দেখেছে লায়লী চুল খুলে বসে আছে, দু' হাঁটুতে মুখ ঢেকে। দাসী তার চুল বাতাস করে শুকিয়ে দিচ্ছে।

কখনো দেখেছে সে হীরে-মুক্তোর গহনা ছড়িয়ে বসে আছে, কখনো দেখেছে সে খালি পায়ে বাগানের কোমল ঘাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শিরীনকে দেখেই লায়লী খুশী হয়েছে। বলেছে, 'কি ভালই যে লাগছে। এস, মন খুলে একটু গল্প করি।'

শিরীন তার দিকে সকাতরে চেয়েছে। লায়লী তখন নিশ্বাস ফেলেছে। বলেছে, 'সে হতভাগা ঐ নিচে ঘুমোচ্ছে। জানি, তুমি তার খবরই নিতে এসেছ। শুধু নিসার আর নিসার। কেন, আমার কাছে আসতে তোমার ইচ্ছে হয় না? বাজে কথা বলো না। জানি ইচ্ছে হয় না। কেনই বা হবে!'

নিচে নামতে নামতে সে বলেছে, 'জান, তোমার এই বাড়াবাড়ি এক একদিন ঘুচিয়ে দিতে চ্ছে করে। মনে হয় নিসারকে দিই জোর করে লক্ষ্ণৌ পাঠিয়ে।'

'না না লায়লী, তা করো না।'

'করলে তোমার হয়তো উপকারই হতো। নিজেকে নষ্ট করছ, প্রশ্রয় দিয়ে ওকেও নষ্ট করছ।'

নিচে এসে শিরীন দেখেছে নিসার ঘুমোচ্ছে। সুন্দর বিছানা, পাখা টানছে একজন, পা টিপছে আর একজন। লায়লী বেরিয়ে এসেছে। বলেছে, 'দেখলে তো, তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিককে কষ্ট দিইনি।'

শিরীন মাথায় হাত চাপড়ে বলেছে, 'আমার কি কপাল বলল্ তো?'

অনেক দুঃখ জানিয়েছে শিরীন। বলেছে, 'মহাপাপ করেছি আমি, আমি পাপী।'

লায়লীর পাতলা গোলাপী ঠোঁট দুটি বিদ্রূপের হাসিতে বাঁকা হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ গলায় হেসে সে বলেছে, 'বেশী বয়সে ভালবাসার কি জ্বালা দেখ! দিনমানে পাখী দানা খুঁটে খায়, সন্ধেবেলা এসে ডানা গুটিয়ে বাসায় বসে। যৌবন হলো ভালবাসবার বয়স। যৌবন পেরোলে আস্তে আস্তে মনটা শান্ত হওয়া দরকার। যে ভালাবাসা পেয়েছ তাই নিয়েই খুশী থাকা দরকার। এখন আর অনেক মানুষের হট্টগোল কেন? যাকে পেয়েছ তার সঙ্গে জীবন কাটাবার জন্যে নিজেকে তৈরী করো।'

'বয়েসের কথা বলিস না লায়লী। বয়স তোরও থাকবে না।'

'না থাকল না-ই থাকবে। কিন্তু তোমায় মিছেই কড়া কথাগুলো বললাম।'

লায়লীর গলা উদাস। সে ধীরে ধীরে বলে, 'আমরা এক হতভাগা জাত শিরীন। যৌবন থাকতে, গুণ থাকতে আমাদের কদর থাকে। তারপর কি দুর্ভাগ্য!'

তারপরই হেসে ওঠে। বলে, 'নিসারকে অত প্রশ্রয় দিও না। নিজের সব কিছু তো নষ্ট করলে। সেদিন আলি শাহ নাকি দুঃখ করছিলেন।'

'কি বলছিলেন?'

'বলছিলেন শিরীন বেণাবনে মুক্তো ছড়াচ্ছে।'

শিরীন দুঃখ পায়। বলে, 'আলি শাহ কেমন ক'রে জানলেন?'

'হয়তো আমিই বলেছি।' লায়লী আরো হাসে। হেসে হেসে বলে, 'নিসারের ওপর আমার বড্ড রাগ। ছোটবেলা থেকে দেখছি তো। পোকায় কাটা আনার একটি।'

নিসারের ঘুম ভেঙেছে। সে সুবোধ বালকের মতো চুল আঁচড়ে জুতো পরে বসে থাকে। শিরীনকে দেখেই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

লায়লী বলে, 'যাও, বাড়ী যাও। শোন নিসার, যেদিন শুনব তুমি শিরীন বহিনের সঙ্গে শয়তানী করেছ, সেদিন তোমায় মজা দেখাব।'

নিসার বিড়বিড় ক'রে বলেছে, 'ওঃ, ভারী সাহস! কি করবে তুমি?'

'দেখতে পাবে।'

'ভারী মুরোদ তোমার।'

'শিরীন এত ভাল মেয়ে, ওর মতো মানুষ তুমি পাবে কোথায়! ক্ষমতার মধ্যে তো ছাইভস্ম শায়েরের লেখা। ও আমিও পারি।'

'লায়লী চুপ কর!'

'ও, চোখ রাঙাচ্ছ! দাঁড়াও একবার কুন্দনের মসলার জাহাজে তুলে দেব হাত-পা বেঁধে। আফ্রিকায় ফেলে দিয়ে আসবে।'

শিরীন অবাক হয়ে ভেবেছে লায়লীর কখন কি খেয়াল হয় বলা কঠিন। সে বলেছে, 'থাক, তোমরা ঝগড়া পরে ক'রো। আমরা এখন যাই।'

বেরিয়ে যেতে যেতে শিরীন ঘাড় ফিরিয়েছে, বলেছে, 'কে সারেঙ্গী বাজাচ্ছে?'

রোজ সে একই দৃশ্য দেখেছে।

লায়লীর জানলার নিচে বাগানের মাঝে শান বাঁধানো একটা ছোট্ট চাতাল। বড় বড় গাছের ছায়া। জুঁই ও চামেলীর লতাবিতান।

চাতালে বসে বজরঙ্গী মুখ নিচু ক'রে সারেঙ্গী বাজাচ্ছে। কপালের ওপর চুল ঝুলছে। সস্তা ছিটের মের্জাই গায়ে, ধুতি পরনে।

ঘাসের ওপর প্রজাপতি উড়ছে, ময়ূর চরছে। কোনদিকে খেয়াল নেই বজরঙ্গীর।

এমন ক'রে বজরঙ্গী সারেঙ্গী বাজায় কেন? দেখলে যেন বুকের মাঝে কেমন করে।

কোনদিকে তাকাতে নেই? এমন ক'রেই ডুবে যেতে হয়? বজরঙ্গী চোখ তোলে না কেন? তাকায় না কেন?

শিরীন দেখেছে নিসারের ঠোঁটে কৌতুকের হাসি। নিসার ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ছে।

শিরীন অবাক হয়ে বলেছে, 'লাগতা নহীঁ হ্যায় জী মেরা বাজাচ্ছে, তাই না? কেন, এ গানটা ও বাজায় কেন? এ গানটা কি তুমি গাও, লায়লী?'

লায়লী তার কথার জবাব দেয়নি। বলেছে, 'মজা দেখবে?'

সে ঘাসের ওপর নেমে এসেছে। বজরঙ্গীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ডেকেছে, 'বজরঙ্গী!'

বজরঙ্গী সারেঙ্গী থামিয়েছে। চোখ তুলে লায়লীর মুখপানে চেয়ে সে চোখ দুটোকে আর নামাতে পারেনি।

তারপর সে যেন বুঝেছে তার সামনে লায়লী দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখদুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাকে অসাধারণ দেখিয়েছে। সে যেন এ পৃথিবীর মানুষ নয়।

তারপরই তার চোখ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। চোখ নামিয়ে নিয়েছে সে।

লায়লী বলেছে, 'বজরঙ্গী, শিরীনবাঈ জানতে চান তুমি রোজ এ গানটা বাজাও কেন?'

'রোজ বাজায় বুঝি?'

'হ্যাঁ, রোজ বাজায় শিরীন। শুধু ঐ গানটাই বাজায়। কেন বল তো?'

'আমায় মাপ করবেন।'

'মাপ করব কেন? বজরঙ্গী, তার চেয়ে তুমি সত্যি কথাটা বল না কেন? কেন এ গানটা ভালবাসলে?'

বজরঙ্গী মাথা নিচু করেছে। লায়লী বলেছে, 'জান শিরীন, জান কি হয়েছিল? একদিন কুন্দন এখানে ছিল না। সেদিন সারাদিন আমি আনমনা হয়েছিলাম। তাই না বজরঙ্গী?'

'আমি জানি না।'

'জান না?' হঠাৎ লায়লী খুব রেগে উঠেছে। মুখ লাল ক'রে তীক্ষ্ণ গলায় বলেছে, 'আমি নেকবার বলেছি বজরঙ্গী, তোমার কোন কথা মনে থাকে না। কেন মনে থাকে না? কেন ভুলে াও?'

বিব্রত শিরীন বলেছে, 'আমি চলি।'

'না না, শোনাই যাক না!' নিসার এতক্ষণ বাদে বলেছে। লায়লী শিরীনের হাতটা চেপে রেছে। ঠাণ্ডা হাত, ঘামে ভেজা। লায়লীর বুকের হারটা উঠছে নামছে কেন? নিসারই বা অমন ক'রে হাসছে কেন? শিরীন বোঝে না।

লায়লী বলে, 'সেদিন আমার মন বসছে না। সকালে তাই বাগানে নেমে এলাম। মোরগের ড়াই দেখতে লাগলাম। বজরঙ্গী আমার পাশে ছিল। তুমি মোরগ লড়াই দেখতে পার না শরীন, তোমার কষ্ট হয়। আমার কষ্ট হয় না। কি সুন্দর মোরগ দুটো! কুন্দন আমাকে ্যারাকপুরের চিড়িয়ামোড় থেকে আনিয়ে দিয়েছিল। কথা ছিল একদিন আমি আর কুন্দন ড়াই দেখব, তাই না বজরঙ্গী?'

'হবে।'

'শিরীন দেখ দেখ, ও কেমন ক'রে আমার কথার জবাব দেয় দেখ! কিন্তু আমি ওকে কিছু লব না। কুন্দনকে বলব।'

'গল্পটা চলুক লায়লী।' নিসার বলে।

'বলছি। জান শিরীন, আমি গাওয়া ঘি-তে কাবুলীমটর ভিজিয়ে রাখতাম। খেয়ে খেয়ে োরগ দুটো কি তেজীই হয়েছিল। অবশ্য তখনো ওদের খেলবার বয়স হয়নি। আরো দেরি রা উচিত ছিল। কিন্তু সকালে উঠেই দেখি মেঘলা দিন। মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। তাই োরগ দুটোকে বের ক'রে আনলাম। আমি নয়, ও। বজরঙ্গী ওদের আনল। বজরঙ্গীই ওদের খেতে দিত। যত্ন করত। ও-ই আমার হুকুমে মোরগ আনল। আমার কাছে। আমি ওদের পায়ে টি ছোট ইস্পাতের ছুরি বেঁধে দিলাম।'

'এবার চুপ কর।' নিসার বলে। নিসারের মুখ শাদা। কিন্তু লায়লী সে কথা শোনে না। ার মুখ এখন বরফের মতো শাদা দেখাচ্ছে। সে বলে, 'সেদিন কুন্দন নেই। আমার পাশে ও ল।'

বজরঙ্গীর মুখ নিচু। কপাল ঘামছে। লায়লী বলে চলে, 'মোরগ দুটো লড়তে লড়তে িমিয়ে পড়লো। তখন, তখন আমি কি করলাম জান? ওদের নেশা ধরাব বলে মদের বোতলে ম ভিজিয়ে রেখেছিলাম। সেই গম খেতে দিলাম। বললে বিশ্বাস করবে না শিরীন, মোরগ টো নড়ে-চড়ে পাখা ঝাপটাতে লাগল। গলা দিয়ে, পেট দিয়ে রক্ত পড়ছে তবু ওরা আবার ড়াই করতে চাইল। আমি ওদের কাছে আনি। আমি ওদের চোখের ভেতরে চেয়ে দেখি োখদুটো যেন চুনীর টুকরো। টুকটুকে লাল দেখাচ্ছে। দেখে ছেড়ে দিলাম।..তারপর, শেষ বধি ওরা লড়লো। দুটো মোরগই শাদা। আস্তে আস্তে লাল রক্ত ঝরে ঝরে ওদের পালক াল লাল হয়ে গেল।

সে বজরঙ্গীর দিকে তাকায়। বলে, 'তখন আমি কি করলাম, বজরঙ্গী?'

নিজেই বলে, 'আমি রুমালটা ফেলে দিলাম। বললাম, ওদের ঢেকে দাও। ছি ছি তুমি াদছ? চোখের জল মুছে ফেল, যাও!'

নিসার লায়লীর দিকে তাকায় এবং হাসে। ক্রুদ্ধ হাসি, শীর্ণ হাসি। বলে, 'লায়লী, আমরা যাই। তুমি বজরঙ্গীকে বাকি গল্পটা শোনাও। ও তোমাদের চাকর। আমরা তো চাকর নই।'

লায়লী বলে, 'তুমি রাগ করছ কেন? সেদিন বজরঙ্গী খুব কষ্ট পায়। সারাদিন খায়নি। বিকেলে আমি ওকে ডাকি। বিকেলে আকাশ-ভরা মেঘ নিসার। কে বলবে পূর্ণিমার দিন অমন ধারা মেঘলা হয়ে থাকে আকাশ! বজরঙ্গী আসেনি। চেয়ে দেখি আকাশে বাজ উড়ছে, চিল উড়ছে। আমার কি মনে হলো আমি ওর পোষা পায়রা দুটো উড়িয়ে দিলাম। খুব দামী পায়রা। কুন্দন ওকে এনে দেয়। একটু উড়তে না উড়তেই বাজ এসে ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল পায়রা দুটো। আহা, বাচ্চা পায়রা!

শিরীন গম্ভীর হয়ে বলল, 'লায়লী তুমি দু'বার পাপ করেছ। নিরীহ প্রাণীদের মেরে ফেলা কি ভাল? কালই তুমি পীরের দরগায় শিরনী পাঠিয়ে দিও।'

লায়লী একবার এরদিকে একবার ওরদিকে চায়। বলে, 'সেই রাতে মেঘ কেটে গেল। চাঁদের আলোয় চারিদিক ভেসে গেল। আমি তখন ছাতে গিয়ে বসি। দাসীকে বলি বজরঙ্গীকে ডেকে আন। বলিস, না এলে আমি মালিককে বলে ওকে শাস্তি দেব।'

হঠাৎ বজরঙ্গী তাকায়। বলে, 'বলে দিলে না কেন?'

'বলব একদিন, নিশ্চয় বলব। কিন্তু সে রাতের কথা আমাকে বলতে দাও বজরঙ্গী। শিরীন, আমি গাইছিলাম 'লাগতা নহীঁ হ্যায় জী মেরা'। ও সারেঙ্গী বাজাচ্ছিল।'

লায়লী আবার হাসে। বলে, 'এক রাতে ও গানটি শোনে। তারপর থেকে শুধু ঐ গানটা বাজায়। ও বোধ হয় ভাবে আমি ওকে ডাকব। এক গালিচায় বসতে দেব। ও ভাবে আমরা দুজন বসে থাকব তারপর আকাশে এক সময়ে চাঁদ ফিকে হয়ে যাবে। মসজিদে ভোরের আজান শোনা যাবে। তাই ও গানটা বাজায়। কিন্তু তা কি হয়? কুন্দন কত সময় তো থাকে না। তবু আমি ওকে ডাকি না।'

বজরঙ্গী ওঠে। সারেঙ্গীটা নিয়ে চলে যায়। লায়লী বলে, 'ওর ঘর সাজাবার জন্যে কত জিনিস কুন্দন পাঠিয়ে দিয়েছে। দেখ গে, সব একপাশে পড়ে আছে।'

'তাড়িয়ে দিলেই তো পার লায়লী।' নিসার বলে।

'তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে তো করেই।'

'দাও না কেন?'

'কুন্দন যে ওকে বড্ড ভালবাসে। কুন্দন নাকি ওর কাছে ঋণী। শুনেছ কখনো যে চাকরের জন্যে মানুষ চাকর রাখে? ওর চাকর আছে, সাজানো ঘর আছে। কত জামা-জুতোই কিনে দিয়েছে কুন্দন!'

'আহা, তবে অমন ভাঙা ঘরে থাকে কেন গো!' শিরীন বলে।

সে প্রশ্ন করে।

শিরীন আর নিসার গাড়ীতে উঠেছে।

তাদের বিদায় দিতে এসে লায়লী দাঁড়িয়ে থেকেছে। বলেছে, 'খুব ভাল লাগল। আবার এস।'

শিরীন বলেছে, 'লায়লীকে, আমি বুঝতে পারি না।'

নিসার বলেছে, 'বুঝে দরকার নেই। ও মানুষ নয়, পাষাণ। তুমি ওর চেয়ে অনেক ভাল। আমার কি ইচ্ছে করে জান?'

'কি?'

'ঐ বজরঙ্গীটাকে সরিয়ে আনি।'

'আনলেই পার।'

'না না। কুন্দনকে চেন না? তাছাড়া ওকে কোথায়ই বা আনব? নিজেই তো ভিখিরী। তোমার দয়ায় বেঁচে আছি।'

'ও সব কথা বলো না।'

চেষ্টা ক'রে আর সবই হয়, শুধু ভালবাসা যায় না।

নিসার দিনে দিনে একটু একটু ক'রে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়াতে থাকল। জাহাজঘাটায় যায়। চীনে ও হাবসী খালাসীদের সঙ্গে জুয়া খেলে, নেশা করে। শেষ অবধি নানা রোগ হলো তার। খিদে হয় না, গলায় যন্ত্রণা, বমি হয়।

শেষ অবধি জানা গেল গলক্ষত হয়েছে। কবিরাজ বললেন, 'কর্কট রোগ।' হাকিম বললেন, চিকিৎসা নেই।'

তখন নিসার যেন স্বস্তি পেল। শিরীনকে বলল, 'এবার আমি লক্ষ্ণৌ যাব। বড় ভাইয়ের কাছে, মা-র কাছে।'

শিরীনের মনে তখন মমতা এবং অনুশোচনা। সে বলল, 'আমার এখানে থাক। রোজ দান-ধ্যান কর। ধর্ম কর. পূণ্য হবে।'

নিসার সে সব কথা হেসে উড়িয়ে দিল। তার মনে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা। এতদিনে যেন সে জীবনে আগ্রহ অনুভব করে। তার শরীরে এমন একটি ব্যাধি লালিত হয়েছে যা সচরাচর দেখা যায় না। তাতে তার খুব গর্ব।

একদিন যে অশেষ যন্ত্রণা পেয়ে তাকে মারতে হবে তা-ও যেন ভাল। শিরীন বড় ব্যথা পেয়েছে।

মনে হয়েছে নিসার যেন চিরদিনই শিশু। বয়স হয়েছে মনটা বাড়েনি। মনে হয়েছে ওর কাছ থেকে বয়স্ক মানুষের উপযোগী, পরিণত প্রেম আশা করা শিরীনের খুব ভাল হয়েছে। নিসার চলে গেছে। মাঝে মাঝে সে বড় ভাইয়ের সঙ্গে আলি শাহর কাছে আসে, তবে শিরীনের সঙ্গে দেখা হয় না।

শিরীন আজকাল চুপচাপ থাকে। একা একা কত কথা ভাবে। এখন মনে হয় যদি একটি ছেলে থাকতো তার!

লায়লীর কথা সে কমই ভাবে। নিসারের কথা ভাবতে চায় না। মাঝে মাঝে মনে পড়ে, তবু মনে পড়ে।

আজকাল ওর কাছে কেউ আসে না।

তাই দাসী এসে যখন বলল কুন্দন এসেছে, ও আশ্চর্য হলো। তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালাতে বলল এবং বাতি হাতে নিজেই ঘরে ঢুকল।

॥ চার ॥

কুন্দন দেখল শিরীনের চুলে পাক ধরেছে। সাজসজ্জার কোন চাকচিক্য নেই। শাদা কাপড়, শাদা জামা। কিন্তু কোথায় যেন কি নেই! বয়স হয়ে গেছে কিন্তু বয়সের প্রশান্তি আসেনি। শিরীনের চোখে-মুখে রিক্ততা, বিষণ্ণতা এবং কেমন যেন হতাশার ভাব।

কুন্দন হাতটা দেখাল। শিরীন বসল। কিছুক্ষণ অবধি কথা কইতে পারল না শিরীন।

কুন্দনকে চিনতে কষ্ট হয়। কুন্দনের চেহারায় মদমত্ত পৌরুষের বর্ণ ছিল। কুন্দন গোঁফের দুই দিক চুমরে উপর পানে তুলে দিত। তার মুখে বসন্তের দাগ। কাঁধদুটো খুব চওড়া এবং ভারী। তার চলাফেরা দেখলেই বোঝা যেত মানুষটি সম্মান পেতে অভ্যস্ত।

এখন কুন্দনকে দেখে মনে হয় এ যেন সে কুন্দন নয়।

তার মুখে ও কপালে বয়সের রেখা চোখের নিচে কালি। রগের চুলে পাক ধরেছে।

লায়লীর মৃত্যুতে কুন্দন কষ্ট পেয়েছে তবে! মনে করতেও ভাল লাগে।

শিরীন বলল, 'কেমন আছ?'

'ভাল।'

কুন্দন হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। বলল, 'এ কি, ঘর আঁধার কেন? আলো জ্বাল।'

'আলো জ্বালব?'

'নিশ্চয়। কলকাতা শহরটা যেন বদলে গেছে। ক'মাস তো মোটে ছিলাম না। কারো মনে ফূর্তি নেই, কেউ আনন্দ করতে জানে না। সবাই যেন সব ভুলে বসে আছে।'

শিরীন বলল 'ঠিক বলেছ।

সে দাসীকে ডাকল।

টাকা নিয়ে চাকর বাইরে ছুটল। আধঘণ্টা বাদে দাসী এসে দরজার পাশে দাঁড়াল। শিরীন উঠল। বলল, 'চল।'

বাড়ীতে যতগুলো বাতি ছিল সব জ্বালা হয়েছে।

দেওয়ালের গায়ে আলো. সিঁড়িতে উঠতে আলো। উপরের বড়ঘরে ঝাড় জ্বলছে, ফরাস পাতা। কাঁচের পুঁতির পর্দা সরিয়ে কুন্দন ঢুকল। বলল, 'বাঃ. শিরীন বাঃ!'

কতদিন বাড়ীতে অতিথি আসে না। আজ দাসী মনের সাধে ঘর সাজিয়েছে। ধপধপে ফরাস। শাদা তাকিয়া। ঘরের কোণে ফুলদানীতে ফুল। ধূপের ধোঁয়া, চন্দন এবং আতরের গন্ধ। আসরের মাঝে কিছু ফল, মেওয়া, দুটি গেলাস এবং ক'টি বোতল।

শিরীন শাড়ীটা বদলে এল। এসে দেখে কুন্দনের চোখটি বেশ হাসি হাসি। কুন্দন বলল, 'বসো!'

দু'জনেই অল্প অল্প নেশা করল। কুন্দন বলল, 'গান গাইতে হবে না তোমার। গানের আমি কি ই বা বুঝি!'

'কবে ফিরলে কুন্দন?'

'এই তো!

'খবর কি বল?'

খবর আর কি! শোন, মালকাকে দেখেছে না কি?'

'কোন্ মালকা? ও, মালকা ফৈজাবাদী?'

হ্যাঁ। ওকে একদিন ডাকব মনে করছি।'

'খিদিরপুরে?'

'না না! আমার শ্যামনগরের বাড়ীতে, নয়তো বজরাতে!'

'ভালোই তো! শুনেছি ভাল গায়!'

'আহা, তোমার মতো কি আর?'

'না না! সত্যিই ভাল গায়। দেখতেও ভাল।'

'দেখতে ভাল!'

কুন্দন কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে হাতের গেলাসের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর মুখ তোলে। হাসবার চেষ্টা ক'রে বলে, 'ও ঠিক এই্ রঙের শাড়ী চেয়েছিল জান! অনেক খোঁজ ক'রে এনেছিলাম।'

শিরীন ভ্রূ কুঁচকোয়। কুন্দনের নেশা হয়নি। শিরীনেরও নেশা হয়নি। তারপর আস্তে আস্তে শিরীন বলে, 'হ্যাঁ। তরল সোনার সঙ্গে মধু মেশানো রঙ! ওকে মানাত।'

হঠাৎ সে হাসে। বলে, 'বেশ তো ঐ মালকাকে দাও না কাপড়টা। মালকা লায়লী নয়। তবু ওকেও মানাবে। আসল সৌন্দর্য তো যৌবনে। মালকারও যৌবন আছে।'

কুন্দন ক্রুদ্ধ হয় না। বলে, 'দেব, তাকে নতুন কাপড় দেব। ও কাপড় আমি ফেলে দিয়েছি। গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছি।'

'গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছ!'

'হ্যাঁ শিরীন। যার নাম ক'রে কেনা তাকে দেওয়ার বদলে অন্যকে দিতে ইচ্ছে করে? এই যে আংটিটি তোমার কথা মনে ক'রে এনেছি এ কি অন্য কাউকে দিতে মন চায়?'

শিরীনের হাতে আংটিটি পরায় কুন্দন। শিরীন চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর বলে, 'হীরে! সত্যিই আমি বড্ড ছোট হয়ে গেছি কুন্দন। কেউ কাউকে ভালবাসলে সইতে পারি না। তা বলে তোমাকে আংটি দিতে হবে না। না না, শিরীন অত ছোট নয়! লায়লীর কথা জানতে চাও তুমি তাই না? বলব, কি বা জানি আমি!'

সে জোর ক'রে আংটিটা খুলে দেয় কুন্দনকে। বলে, 'তুমি আমার কতদিনের পরিচিত। আমাকে তো তুমিই বাঁচিয়েছিলে সেবার। নইলে শোভাবাজারের ঋষি দত্ত নির্ঘাত মেরে ফেলত কুন্দন! তুমি এসেছ এ আমার কতদিনের ভাগ্যি। তুমি আজ আমার অতিথি।'

'আংটিটা তুমি পর। আজ যদি না-ও আসতাম তবু আমি আংটিটা পাঠিয়ে দিতাম শিরীন। দেখ, ভেতরে দেখ!'

সত্যিই শিরীনের নাম লেখা আছে। বাঈ শিরীন বাঈ। শিরীনের চোখ দিয়ে এবার জল পড়ে। সে আংটিটা পরে। ধরা-ধরা গলায় বলে, 'আমাকে কেউ তবু মনে রেখেছে?'

'কেন রাখবে না? আসলে...' এদিক ওদিক চেয়ে কুন্দন বলে, 'আসলে তোমার বাড়ীতে মাঝে মাঝে মহফিল বসা দরকার। আলো-টালো জ্বাল, লোকজন ডাক। দেখো, দু'দিনে আসর জমে যাবে।'

'জানি। কিন্তু কুন্দন, আবার আসর?'

'নয় কেন? শিরীন, ভগবান যদি চাইতেন তুমি ধর্ম-কর্ম কর, তবে তোমায় জানবাজারের রানী ক'রে পাঠাতেন। এমন জন্ম তোমার হতো না। তোমাকে যা করতে পাঠিয়েছেন, এ জন্মটা তাই-ই কর। আর কি জান?'

একটু ঝুঁকে কুন্দন বলে, 'এখনই তোমার সব সময় রেশম বেনারসী হীরে জড়োয়া পরা দরকার। সবাই জানে এখন তোমার মনে দুঃখ। ওরা তোমায় দেখে হাসতে চায়। তুমি হাসতে দেবে কেন? বল?'

'বুঝলাম।'

শিরীন দাসীকে ডেকে আরো বোতল আনতে বলে। বলে, 'কুন্দন, ঠিক বলেছ। করতেই তো চাই। কিন্তু...'

'কিন্তু কি? নিসার বুঝি সব টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে?'

'না না। এখনো যা আছে তাতে আমার জীবন কেটে যাবে। কিন্তু সে সব কথা থাক। এস গল্প করি। কথা বলি।'

'বল শিরীন।'

'জান কুন্দন, লায়লীর নামটি কে দেয়?'

'না। ও ছোটবেলার কথা কইত না তো!'

'বড় দেমাকী ছিল তো! সে কথা কইতে ওঁর মান যেত।'

'তারপর'?

'ওর নাম ছিল মুন্নি।'

'মুন্নি?'

'হ্যাঁ। ওর বয়স যখন ছ'বছর, তখন ঈশ্বরলালজী ওর মা মেহরুন্নকে দেখেন।'

'ঈশ্বরলালজী কে?'

আমাদের আলি শাহ ঈশ্বরলালকে বড় স্নেহ করতেন। ঈশ্বরলালের তখন খুব নাম। উনি তো বরৌনীর রাজা শিবকৃষ্ণের ছেলে। ওঁর মা ছিলেন এক গেরেস্ত ঘরের মেয়ে। ঈশ্বরলালের গানের তখন খুব নাম। কিন্তু শেষ অবধি এলেন লক্ষ্ণৌ।' শিরীন চুপ করে।

'কি ভাবছ?'

'ভাবছি জীবন কি জটিল। লক্ষ্ণৌ-এ নিসার আর মুন্নি খেলতে আসত আমাদের ছাতে বেশ মনে পড়েছে। তারপর সেই নিসার...'

'বল।'

'ঈশ্বরলালের চেহারাটি আমার মনে পড়ে। চোখ বুজলে যেন দেখতে পাই। সারাদিনমান বাড়ীতে থাকতেন। বৌ ছিল, ছেলে ছিল। ভাই, ভাইপো সবাই ওঁর বাড়ীতে থাকত। কিন্তু ঐ মেহরুন্নকে নিয়ে কি অপমানই করত!'

'ঐ রকমই হয়!'

'বিকেলে স্নান ক'রে মেহরুনের বাড়ী আসতেন। ছিপছিপে শরীর সুন্দর চেহারা। ধপধপে সাদা কলিদার আচকান, মাথায় টুপি, কানে হীরে, পকেটে আতরের শিশি ও রুমাল। ছোট একটি গাড়ী ছিল। শাদা ঘোড়া। নিজে চালিয়ে আসতেন। মুন্নিকে দেখে বড্ড ভালবেসে ফেলেন। বলেন এমন চোখ, 'এমন চুল, ওর নাম দিলাম লায়লী আশমান।'

শিরীন একটু হাসল। শিরীনের মুখ লাল দেখাচ্ছে, সে হেসে আঙুল নেড়ে বলল, 'লায়লী আশমান! কথাটার মানে হয় কি না হয় তা কে জানে বাপু! লায়লী মানে অন্ধকার, রাতের কালো রং। কথাটা না কি আরবী। জান, নিসার বলতো আরবী আর পারসী ভাষায় ভারী সুন্দর সব কবিতা আছে। কে জানে নামটার কি মানে হলো। হয় তো ওর মানে আঁধার রাতের আকাশ, বা আরো কিছু। নিসার বলত...'

'তবে চলুক, নিসারের কথাই চলুক!'

কুন্দনের ইচ্ছে ছিল না তবু গলাটা রুক্ষ হয়ে গেল। শিরীন তার দিকে চাইল, তারপর বিচিত্র হাসি হেসে বলল, 'না কুন্দন। এই সুযোগে আমি নিসারের নাম তোমায় শোনাচ্ছি না। নিসার লায়লীর নামের ব্যাখ্যা করতো তাই বলছি।'

'রাগ ক'রো না শিরীন।'

'রাগ? না না, রাগ করব কেন। এই তো এসেছ তুমি, এসেছ, বসেছ, আমার সঙ্গে কথা কইছ, কত আনন্দ হচ্ছে আমার।'

কুন্দন সন্ধির নিশানা হিসেবে একটি বরফসিক্ত আঙুরের গা থেকে জল মুছে শিরীনের হাতে দিল। শিরীন বোধ হয় ভুলে গেল যে ওটি খাবার জিনিস। সে আঙুলে ধ'রে শীতল আঙুরটি গালে ও কপালে বোলাল। তারপর সেটি রেখে বলল, 'নিসার বলতো লায়লীর নামটিকে ভাবার্থে গ্রহণ করতে হবে। রাতের আকাশের বুকে যেমন অতল অপার অন্ধকার—লায়লীর মধ্যেও তেমনি রহস্য যেন নিথর হয়ে আছে।'

একটু থেমে শিরীন যেন কি ভাবে। বলে, 'এখনো মনে পড়ে। লায়লী যখন খুব ছোট তখন মাঝে মাঝে গালে হাত রেখে আপন মনে কি ভাবত। মনে পড়ে ও আমার ঘরের গালচেয় ঘুমোচ্ছে, দেখে পরভেজ বলতো, দেখ দেখ, যেন জ্যোৎস্না জমে আছে।'

'পরভেজ কে?'

'পরভেজ? পরভেজ আমার কাকার ছেলে। আমায় বড্ড ভালবাসত। আমার বয়স যখন ষোল, ওর বয়স আঠারো তখন বিয়ের কথা তোলে কাকী। না না, বিয়ে আমাদের হয়নি। বড় ভাল ছেলে ছিল। ওর সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছি তার জন্যে বোধ হয় ঈশ্বর আমাকে এত শাস্তি দিলেন।'

'ঈশ্বর কেন, ঈশ্বরলালের কথা বল।'

'বাঃ, সুন্দর বলেছ তো কথাটি। তাদের কথাই বলা যাক। মেহরুন্নবলেছিল মুন্নিকে একটি নাম দাও। ঈশ্বরলাল তখন নবাব প্রাসাদের জন্যে পুঁথি সংগ্রহ করছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এর পুরনো বাড়ী থেকে। ফার্সী পুঁথি বড় সুন্দর হয় জান? যেমন সুন্দর তার ছবি, তেমন তার হাতের লেখা। আলি শাহ্-র নিজের ফেজখানায় কত যে বই ছিল! বুড়ো বুড়ো দফতরী বসে সেখানে নানরকম ধূপধুনো পোড়াত। নিমপাতা, চন্দন আর কর্পূরের থলি বইয়ের তাকের গায়ে টাঙাত। সেখানে ঈশ্বরলালজী যেতেন। মেহরুন্নকে তিনি বললেন এমন নাম দিলাম, যে সবাই ওকে নামেই চিনবে।'

শিরীন বলে চলে।

'মেহরুন্ন বলেছিল ও নামে আমার মেয়েকে ডাকব কেন? সারাজীবন কষ্টপাবে ঈশ্বরলালজী বলেন বড় ছেলেমানুষ তুমি। নাম দিচ্ছি তো কি হলো? ও খুব সুখী হবে আস্তে আস্তে সবাই ওকে লায়লী বলে ডাকতে লাগল। মুন্নি বলে কেউ ডাকত না, জান কুন্দন?'

কুন্দন বলল, 'শিরীন, লায়লীর কি হয়েছিল?'

'জানি না।'

'জান না?' কুন্দন যেন হতাশ হয়ে যায়। সে বলে, 'আমি বড্ড আশা করেছিলাম তুমি কিছু জানাবে। লায়লী কেন এমন করল তা আমার জানতে ইচ্ছে করে।'

শিরীন হঠাৎ এমন একটা কথা শুধোয় যে কুন্দনের বুকটা একবার ধ্বক ক'রে ওঠে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় তার।

শিরীন বলে, 'কুন্দন, বজরঙ্গীর কি হলো বলতে পার?'

কুন্দন হাতের গেলাসটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর মুখটা তুলে বললে, 'কি জানতে চাও?'

'বজরঙ্গী কোথায় গেল?'

'আমি কি ক'রে জানব বল?' কুন্দন হাতের গেলাসের দিকে চোখ রেখে বলে যায়, 'জানি না, সত্যিই জানি না আমি। আমি ছিলাম গাজিপুরে। লায়লীর সঙ্গে কথাবার্তা হলো ও আর আমি দিল্লী চলে যাব। ওখানে যাবার সময় বজরঙ্গীকে নিয়ে যাব ঠিক করি। কিন্তু সে কোথায় চলে গেল। কত খুঁজলাম, ওর কোন খবরই পেলাম না।'

'ও!'

'কিন্তু শিরীন, আর একদিন তোমার সঙ্গে আমি ওদের নিয়ে গল্প করব। নিসার, ঈশ্বরলাল, বজরঙ্গী! আজ তুমি লায়লীর কথা বল। আমাকে ও বলেছিল ওর কলকাতা ভাল লাগছে না। আমি বললাম বেশ তো, দিল্লী যাব আমি আর তুমি। ক'দিন ও কি খুশীই যে ছিল! কি হলো ওর, কি হতে পারে বল?'

'কুন্দন, আজ আমার মনে হচ্ছে তুমি বোধ হয় লায়লীকে ভালবাসতে।'

কুন্দনের মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

সে ফর্সা গেলাপ পরানো তাকিয়া কোলে টেনে নিয়ে কাত হলো।

'কি জান শিরীন, মেয়ে আমি অনেক দেখেছি। কোন মেয়েকেই আমার বেশীদিন ভাল লাগে না। মেয়ে কেন, কোন কিছুই বেশীদিন ভাল লাগে না আমার। কলকাতায় তিনমাস থাকলে হাঁপিয়ে উঠি। গাজিপুর চলে যাই, নয়তো বেরিলি। লায়লীর কাছে যেন আমি বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। অনেক টাকা খরচ করতাম ওর পেছনে, ভাল লাগত। ও যদি আমাকে ভালবাসতে শুরু করত তা'হলে কবে ওকে ছেড়ে দিতাম। লায়লী আমার ছিল। ওকে যে আমি কিনেছিলাম।'

'হাসালে তুমি কুন্দন। ভালবাসা দিয়ে মানুষকে কেনা যায় না, টাকায় কেনা যায়?'

'যায় শিরীন। টাকায় সব হয়। আমি তা বিশ্বাস করি। যেদিন হাতে টাকা থাকবে না সেদিন আমি ডুবে মরব। টাকা থাকলে লোকে সম্মান করে, ভয় করে। লায়লী আমাকে ভয় করত না। নাই বা করল। আমার ভাবতে ভাল লাগত ওকে আমি বেঁধে ফেলেছি। কোন পুরুষ ও

রূপ দেখতে পাবে না, ওর কথা শুনতে পাবে না ভাবলে পরে ওর 'পরে ভালবাসা বল ভালবাসা, টান বল টান, বেড়ে যেত আমার। একটা কথা শোন।'

কুন্দন চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, 'আমি একটা কুকুর কিনেছিলাম। জাহাজের খালাসীর কাছ থেকে। আমার কুকুর, কিন্তু আমার ভাইপোকে ভালবাসত। তাকে দেখলে লাফাত, ডাকত। একদিন আমার রাগ হলো। কুকুরটাকে গুলি করতে পারতাম, করিনি। কুকুরটা দিয়েছিলাম একজনকে। সে চুঁচুড়ায় থাকত, বরফের গুদাম ছিল তার। শুনেছি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে শুকিয়ে মরে যায় কুকুরটা। আমি খুশী হয়েছিলাম।'

'ভাইপোকেই তো তোমার ওয়ারিশান করেছ!'

'হ্যাঁ। তাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু আমার কেনা ককুরটা তাকে ভালবাসবে সে আমি সইব কেন? লায়লীকেও আমার বলে মনে করেছি। সেই লায়লী, কি হলো তার, জানতে ইচ্ছে করে। লায়লী তো অন্য কারো মতো নয় শিরীন।'

'না।'

শিরীনের গলা তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। সে বলে, 'লায়লীকে দেখে তুমি যে মুগ্ধ কুন্দন! ও সাধারণ নয়, ও অসাধারণ? আমি তা মনে করি না। ওর বুকটা পাষাণে তৈরী। এত যে ওর নাম করছ ও কি বলেছে জান?'

'কি?'

'বলেছে তুমি নাকি বজরঙ্গীকে খুন করেছ?'

'কি?' কুন্দন সোজা হয়ে উঠে বসে।

'লায়লী গাড়ী নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। লোককে ডেকে ডেকে বলেছে তুমি ওকে খুন করেছ!'

শিরীন বলে যায়। লায়লী না কি এর-তার বাড়ী গেছে। ডেকে ডেকে বলেছে, 'জান, কুন্দন বজরঙ্গীকে খুন করেছে। বজরঙ্গী ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিল, ও তাকে খুন করেছে। আমার জন্যে।'

'বজরঙ্গী তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল কুন্দন?'

'সে কথা থাক। তার নাম ক'রো না আমার কাছে।'

কুন্দন উঠে পড়ে। টলতে টলতে বেরিয়ে আসে। শিরীন হাসে। হেসে দাসীকে বলে, 'নিয়ে আয়, আরো মদ আন্। আমি নেশা করব, আমার বড় ভাল লেগেছে আজ।'

কুন্দন হঠাৎ বাড়ী এল এবং অন্দরে ঢুকল।

দাসীরা, বাড়ীর মেয়ে বৌ-রা এদিকে ওদিকে ছুটে পালাল। কুন্দনকে যারা চেনে না তারা অবাক হয়ে চেয়ে রইল, ঘোমটা দিতে ভুলে গেল। ওর ভাই-বৌ, মা এবং ঠাকুমা সন্ত্রস্ত হয়ে ওর চাকরদের ডাকলেন। কে জানে কি হয়েছে আজ! তাঁরা ফিসফিস ক'রে কথা কইতে লাগলেন।

কুন্দন অন্দরের সকল মহল পেরিয়ে বড় একটা ঘরে এল।

মস্ত ঘর। লম্বা এবং নিচু। সারি সারি পাথরের জালা বসানো। জালাগুলো দেখলে ভয় করে। মনে হয় যেন অন্ধকার দিয়ে গড়া দৈত্যদেহ।

কুন্দন ভারী গলায় ডাকল, 'বাত্তি দে!'

চাকর মশাল আনল। কাঠের ওপর কাঁঠালের আঠা, রজন এবং তার্পিন তেলের মসন মাখানো মশাল। কুন্দন মশাল নিয়ে তাকে চলে যেতে বলল।

ঘরের দেওয়ালে জালার গায়ে শ্যাওলার জটা ঝুলছে। মেঝেতে কাদা। বছরকার পানী জল এখানে রাখা থাকে।

গঙ্গার বুক অবধি সুড়ঙ্গ চলে গেছে। বছরে একবাব সে সুড়ঙ্গের দোর খোলা হয়। বর্ষার নতুন জল এসে গঙ্গার বুক ভরে যায় তখন। ভারে করে জল এনে তখন জালা ভরা দাসীরা ফটকিরি এবং কর্পূর গুঁড়ো ক'রে জালায় ফেলে রাখে। জালার গায়ে মাঝে মাঝে সা জড়িয়ে থাকে। বছরে দু'একজন সাপের কামড়ে মরে।

এখন কুন্দনের সাড়া পেয়ে খসখস ক'রে সরীসৃপ সরে যেতে লাগল। কুন্দন দেখল একা বৃহৎ কালো সাপ ধীরে ধীরে ওদিকের দেওয়ালের ফাটলে ঢুকে যাচ্ছে।

সে দেওয়ালের দরজা খুলল।

সুড়ঙ্গ চলে গেছে। এ সুড়ঙ্গের একটি পথ সোজা গঙ্গার বুকে নেমে গেছে। আর পথের মুখে দরজা। কুন্দন সে দরজার তালা খুলল।

এ সুড়ঙ্গ ধরে কিছুদূর গেলে একটি দরজা। তার গায়ে কুলুপ ঝুলছে। সারা বছর এ পথে কেউ আসে না।

কুন্দন আসে, মাঝে মাঝে আসে।

তার পিতামহ কাশী ও মির্জাপুর শহরের নামকরা গুণ্ডা ছিলেন। কুন্দনের বাবা গুণ্ডাবাজি ধার ধারতেন না। বাপের সঙ্গে বনিবনা ছিল না তাঁর। কুন্দনের শৈশবেই তিনি মারা যান।

কুন্দন তার ঠাকুরদার হাতে মানুষ। বৃদ্ধ যখন চোখ বোজেন বলেছিলেন, 'বড় আনন্দে বড় শান্তিতে মরছি রে! তুই আমার যোগ্য বংশধর।'

কুন্দন অবশ্য তাঁর নাম রাখতে চেষ্টা করেছে।

তবে সে কারবার-ও করে। মসলার কারবার, হীরে-জহরতের কারবার। তার বড় বড় নৌকো আছে পঞ্চাশটি। নদীপথে বাংলায় এবং উত্তর প্রদেশে সে সব নৌকো ঘোরে। দশবছর আগে কুন্দন জ্যান্ত মানুষের ব্যবসা অবধি করেছে। লুকিয়ে মেয়ে-পুরুষ কুলি চালান দিয়েছে ভারতের বাইরে। তারপর একবার ধরা পড়ে যায় চট্টগ্রামের বন্দরে। কক্সবাজারে মোটা টাকা খেসারত দিতে হয়। সেই থেকেই সে ব্যবসায়ে ইতি।

কুন্দন সুড়ঙ্গ ধরে চলতে লাগল।

বাতাস আসছে। গঙ্গার বুক থেকে বাতাস এসে তার মুখ-চোখ ধুয়ে দিচ্ছে।

পা বালিতে ডুবে যায়। বালি এবং মাটি। এবার একদিন ঝুলি কাটাতে হবে।

দরজার গায়ের কুলুপটা সে খোলে।

শব্দ, কিসের শব্দ? কে যেন দেওয়াল আঁচড়াচ্ছে। কে আঁচড়াচ্ছে?

'কে? কে ওখানে?' কুন্দন ভয় পেয়েছে। পিঠ দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। শিরদাঁড়াটা যেন সির সির করছে।

না। কেউ না। মস্ত বড় একটা ইঁদুর। এরা জাহাজে থাকে, নৌকোয় থাকে। এরা মানুষ মরলে খায়, এমন কি জ্যান্ত মানুষকেও কুরে কুরে খায়।

কুন্দনের মনে আছে সেবার কক্সবাজারের ঘটনা।

কুলিদের মধ্যে একজনের কলেরা হয়। তাকে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিতে চাইছিল সবাই। কুন্দন তাকে নৌকোয় তুলে রওনা হয়। কিছুদূর নিয়ে পাড়ে নৌকা বেঁধে সে চলে যায় বাজারে। মানুষটা হয় তো বা মরে-ও যাবে ইতিমধ্যে। বস্তা চাই, দড়ি চাই। বস্তার ভেতর পুরে মুখ বেঁধে পাথর সঙ্গে দিয়ে জ্যান্ত হোক, মরা হোক ফেলে দিলেই হবে।

বাজারে নেমে অনেকদিন পর সে শুঁড়িখানায় ঢোকে। মদ চলে, জুয়া চলে। হট্টগোলে রাত কাবার ক'রে সকালে নৌকোয় ফিরে কুন্দন দেখে মানুষটা নেই।

সে এবং তার নিগ্রো সঙ্গী নেমে আসে। পাড় ধরে চলতে থাকে। তারপর দেখে পাথরের ফাটলে মানুষটা পড়ে আছে। কয়েকটা ইঁদুর তাকে অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে। তখনো সে নড়ছে।

দেখে কুন্দন এবং নিগ্রোটি হেসেছিল। বোধহয় তাদের মতলব বুঝতে পেরে মানুষটা নৌকো থেকে পালাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু নিয়তিকে কি ফাঁকি দেওয়া যাবে? ইঁদুরগুলো বোধ হয় গুদামের। ওখানে শুঁটকি মাছ এবং শুকনো মাংসের গুদাম আছে কিনা!

ওরা গন্ধ পায়। ওরা আসে। এখন যেমন এসেছে। এখন এসে নখ দিয়ে এই দরজা আঁচড়াচ্ছে। ওকি বুঝতে পেরেছে? কি বুঝতে পেরেছে?

কুন্দন বাতি ধরল। ইঁদুরটা আস্তে আস্তে সরে গেল এবং তীক্ষ্ণ দাঁত বের করে চেয়ে রইল।

কুন্দন দাঁড়িয়ে রইল।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে। না। কিছুই শোনা যায় না। ঘরটা মস্ত বড়। ঘরটার মাঝে পাহাড় করে রাখা চুণের স্তুপ। কুন্দন কান পাতল।

কেউ ডাকে না, কেউ ডাকে না রে! এমন আঁধার, এমন নিশুতি, কেউ আসে না। তবে যে শোনা যায় তারা আসে। আঁধারে আসে, নির্জনে আসে। ভালবাসায় আসে, হিংসেয় আসে। যেমন করে হোক তুই আয়। তোকে আমি ভয় পাব না। আমি একা, বড় একা। এমন একা একা আমি থাকতে পারি না। কেউ জানে না আমি কত একা।

চোখ বোজে কুন্দন। যার কাছে তার লজ্জা ছিল না, সঙ্কোচ ছিল না। যার সামনে, একমাত্র যার সামনে কুন্দন সহজ হতে পারত সে কেন আসে না? পৃথিবীতে একটি মাত্র মানুষের সামনে কুন্দন কাঁদতে পারত। সে কোথায়, কোথায়?

'বেইমান, নিষ্ঠুর, আয় তুই আয়। আয় আমার কাছে। পৃথিবীতে আমি কারুকে বিশ্বাস করিনি। আমি কোমরে ছুরি রাখি। আমি দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমোই। মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুই না, একটা শিশুর সামনে অবধি আমি কোমরের বিছুয়া খসাই না। শুধু তোর কাছে আমার কোন ভান ছিল না। তুই থাকলে আমি বুকে শক্তি পেতাম।

হ্যাঁ। কুন্দন তাকে মস্ত বড় সম্মান দিয়েছিল। তাকে টাকা দেয়নি, পয়সা দেয়নি। তাকে বিশ্বাস করেছিল। মুক্তেশ্বরের মেলায় তার হয় বসন্ত। সে মরছিল। তা জেনে তার শত্রু হাফিজ নিয়ামত আসে চুণার থেকে। কুন্দনকে মারবার জন্যে গণেশীলাল লোক পাঠায় কাশী থেকে। তবু কুন্দন তখন ঘুমোত। নিশ্চিন্তে, শিশুর মতো নিশ্চিন্তে। সে কুন্দনের মাথার কাছে বসে থাকত। সে থাকলে আর ভয় কি! দুটি হাতে সে কুন্দনকে আগলে রাখত।

কুন্দন আস্তে আস্তে তার নাম ধরে ডাকে। কুন্দন বলে, 'আমি বিয়ে করিনি। ভেবেছিলাম বয়স হ'লে তোকে নিয়ে চলে যাব! তোর কাছে থাকব। আমার পাপের টাকা একটাও তোকে দেব না। তুই রোজগার ক'রে আমায় যা দিবি আমি তাই খাব। এখন, একবার তুই আয়।

জীবনেও তোকে যে একবার ভাল ক'রে ডাকিনি। একবারও বুকে ধরিনি। আজ আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে।'

কেউ নেই। কেউ নেই, কিছুই নেই। হাতের বাতি নিভে গেছে।

কুন্দন তবু দাঁড়ায়। হয়তো বাতি আছে বলে সে আসেনি। কিন্তু সে কি আসবে?

'মালিক! মেহেরবান! আমার মালিক!'

তেমন ক'রে আবার কি সে ডাকবে? আবার কি কেউ বলবে, 'তুমি আমার মালিক!'

না। বাতাস শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। নিঃসঙ্গ ও অন্ধকার বাতাস। চোরা সুড়ঙ্গে বন্দী বাতাস। ওখানে কেউ নেই।

ও তো শুধু চুণের স্তূপ। এক বছর থাকবে। তারপর চুণ কেটে ফেলে দেওয়া হবে গঙ্গায়।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কুন্দন তালা বন্ধ করল। সে হাতড়ে হাতড়ে ফিরল। সুড়ঙ্গ কেমন ক'রে পেরোল, কেমন ক'রে দরজা বন্ধ করল, কেমন ক'রে একসময়ে নিজের ঘরে এল, তা সে জানে না।

রাতে সে খেল না।

সকলকে বের ক'রে দিল। তারপর নিজের বিছানায় বসল হেলান দিয়ে। আজ সে কোন কাজ করবে না। আজ শুধু তার কথা ভাববে কুন্দন।

॥ পাঁচ ॥

কুন্দনের শৈশব কেটেছে কাশীতে।

কাশীর কথা মনে করলেই কুন্দনের মনে হয় তার পিতামহের কথা। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই তাদের বাড়ী।

তার ঠাকুর্দা রোজ বেলা সাতটায় দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে বসত। ঘাটের রাণায়।

দুটো জোয়ান চাকর তাকে তেল মাখাত, দলাই-মলাই করত। তাদের গা দিয়ে ঘাম ছুটত।

বাবুলালের রঙ ধপধপে। বিরাট স্থূলকায় চেহারা। চান করবার সময় জোরে জোরে শিবস্তোত্র আওড়াত। ঘাটপাণ্ডারা কপালে চন্দন দিত, গলায় দিত আকন্দফুলের মালা। কমণ্ডলু ভরে জল নিয়ে বাবুলাল যখন উঠে আসত তখন দেখে মনে হত যেন দেবতা। টকটকে লাল চেলী কাপড় পরনে। গলায় সোনার পৈতে। হাতে রুপোর কমণ্ডলু। মুখে 'হরহর বোম বোম' ধ্বনি।

তাকে দেখলে কুষ্ঠরোগী গড়িয়ে গড়িয়ে আসত, ভিখিরী ছেলেরা বলতো, 'দে, মিঠাই দে, পয়সা দে!'

বাবুলাল তাদের পয়সা দিত, মিঠাই দিত। নাইতে এসে বুড়ীরা তাকে দেখে কতদিন মস্ত সাধু মনে ক'রে নমস্কার করত। মাঘমাসের সকালে ঐ ঘাটে বসে বাবুলাল কম্বল বিতরণ করত।

মাঝে মাঝে পুরী হালুয়া নিয়ে কালভৈরবের মন্দিরে যেত। হরিশঘাটে যেত, মণিকর্ণিকায় যেত। কুকুরদের পুরী হালুয়া খাওয়াত। ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টান্ন, পেয়ারা, আম নিয়ে সঙ্কটমোচনে যেত। বানর ভোজন করাত।

তার বাড়ীর নিচতলায় উঠোনে, ঘরে ভিখিরীরা শুয়ে থাকত, পথের কুকুর শুয়ে থাকত। সে যখন সকাল বেলা পথ দিয়ে ফিরত ভিখিরীদের ছেলেরা তাকে ঘিরে হৈহৈ করতে করতে আসত।

একবার ঐ দশাশ্বমেধ ঘাটে একটি ছোট্ট মেয়ে তার সামনে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। বড় রূপসী মেয়ে। সে বাবুলালকে চিনেছিল। সম্ভবত ভয় পেয়ে পালাতে যায়।

বাবুলাল তার হাত ধরে বলে, 'ওঠ, আমার মা ওঠ।' তার হাত ধরে সে বাঙালীটোলায় পৌঁছে দেয়।

মেয়েটির নাম কমলা। বড় গরীবের মেয়ে। তার বিয়ের সময়ে বাবুলাল সোনার গয়না, বেনারসী আর পাঁচশো টাকা যৌতুক ক'রে ছিল। বলেছিল, 'আমার মা যে ও! মাকে সাজাচ্ছি আমি।'

কেউ তাকে ঘাঁটাত না। তবে কুন্দনের মনে আছে বাবুলালকে একদিন একজন সন্ন্যাসী বলেন, 'কেন, এত দান-ধ্যান কেন রে?'

বাবুলাল বলেছিল, 'শুনেছি অন্নপূর্ণা মা মাঝে মাঝে ভিখিরী সেজে ছলনা করেন ভক্তকে। তাই সকলকে সেবা করি বাবা!'

সবাই না কি বলতো কাশীতে গেলে বাবুলালকেও দেখতে হয়। ও একটা দেখার জিনিস।

একদিন বাবুলালকে কুন্দন বলেছিল, 'জানেন, সবাই বলে আপনি একটা দেখার জিনিস।'

বাবুলাল তা শুনে খুব হাসে। কুন্দন দুঃখিত হয়ে বলে, 'বা, হাসছেন যে? কাশীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে লোকে দেখে না?'

তা শুনে বাবুলাল তাকে খুব ধমক দেয়। বলে, 'আরে মূর্খ, ওঁকে দেখে বিশ্বনাথের অবতার বলে। আমাকে দেখবার কথা বলে, সে ওদের ঠাট্টা। বুঝিস না কেন রে?'

তখনও কুন্দন তার পিতামহকে চেনে না।

বাবুলাল মস্ত নামী গুণ্ডা। ১৮২০-২৫ সালে কাশীতে কত রাজারাজড়া, জমিদার ও নবাব থাকতেন। সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে কত লোক তীর্থ করতে যেত।

বাবার ধাম কাশী। মা সেখানে অন্নপূর্ণা হয়ে বিরাজ করেন। গঙ্গা সেখানে উত্তরবাহিনী। সে গঙ্গায় জোয়ারভাঁটা নেই।

গলিতে গলিতে শিব. পথেঘাটে শিব। ধর্ম কর, পূণ্য কর।

সব কিছুরই প্রাচুর্য সেখানে। টাকা, নোংরামি, গুণ্ডাবাজী, সবই যেন বাবার দয়াতে রাজহাতে সৃষ্টি হয়েছে।

যোগস্নান, অন্নকূট, মাঘমেলা, সে সব সময়ে বাবুলালের মরশুম।

বাবুলালের হাত দিয়ে হয়নি এমন পাপ যেন পৃথিবীতে নেই।

সে ছোটখাট গুণ্ডামি করে না। ছোট কারণে খুনজখম, বাঈজী বা গণিকা নিয়ে কলেংকারীতে বাবুলাল কোন দিনই নেই। তার কৃতিত্ব দেখতে হলে কাশী শহরের জীবনস্রোতে ডুব দেওয়া দরকার। বিরাট প্রাসাদ নিয়ে বসে আছেন মহারাজা। নতুন কোন বড়মানুষের ছেলে পেলে একটু দাবা খেলতে চান। সেখানে অনেক কিছুই ঘটে। সহসা অনিন্দ্যসুন্দরী রানী এসে রাজার পাশে বসেন এবং হাসতে হাসতে নবাগতকে দু'হাজার টাকা জিতিয়ে দেন। আরো টাকার লোভে সে বড় বাজি ধরে এবং একঘণ্টায় সর্বস্বান্ত হয়ে বেরিয়ে

আসে। পর দিন এসে দেখা যায় বাড়ীতে নিচতলায় বেনারসী পান ও কাঠের খেলনার দোকান। ওপরতলায় কেউ নেই।

কপাল চাপড়ে বেরিয়ে আসতে হয়। যে শোনে সে বলে, 'বাবুলালের নৌসেরা দলের হাতে পড়েছিলে হে!'

বাবুলালের মস্ত দল। তার অনেক অনুচর, অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ। এ পাণ্ডার সঙ্গে ও পাণ্ডার গোলমাল চলেছে। হয়তো বা বংশানুক্রমিক বিবাদ। হয় এরা, নয় ওরা নির্বংশ না হলে মিটবে না। মোটা টাকার বিনিময়ে বাবুলাল সে ভার নেয়। কাশীতে যে কয়টি হিন্দু রাজা ও জমিদার পরিবার আছে, তার রক্ষক-ও সে।

তার লোকেরা ওদের সকল সম্ভাব্য বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে এবং বিনিময়ে মোট টাকা নেয়।

বাবুলাল ক্বচিৎ কদাচিৎ নিজে যায়।

সে নিজের বাড়ীতে থাকে। সে গঙ্গার ঘাটে যায়। রাজবাড়ীতে বা পেশবাসদনে যায়। মাঝে মাঝে নৌকোতে গিয়ে ওঠে। খোলা নৌকোয় কাত হয়ে শুয়ে থাকে বালিশে হেলান দিয়ে, কোলের কাছে কুন্দন।

কুন্দনকে সে চোখের আড়াল করত না। কুন্দনের মা ঠাকুমা মাঝে মাঝে আসত, তারাও কাশীতে-ই থাকত। শহরের বাইরে, অন্য বাড়ীতে। কুন্দনকে আড়ালে নিয়ে তার মা অল্প অল্প কাঁদত আর কি সব কবচ পরাত। বলত, 'হ্যাঁরে মা-র জন্যে মন কেমন করে না তোর?'

'না।' কুন্দন সিধে জবাব দিত। শুনে তার মার মুখটা যেন কেমন হয়ে যেত। ঠাকুমার কাছে তাকে নিয়ে যেত তার মা। বলত, 'জানেন, ওর আমার জন্যে মন কেমন করে না। ওর দাদু কাছে থাকলেই ও সব ভুলে যায়। ভুলিয়ে নিয়েছে, আমার ছেলেকে পর ক'রে দিয়েছে একেবারে।'

ওর মা মাথায় চাপড় মেরে কাঁদত। ওর ঠাকুমা সভয়ে বলত, 'চুপ কর। একেবারে চুপ কর। যদি শোনে, যদি শুনতে পায়!'

পরে কুন্দন শুনেছে তার বাবা মরে যাবার আগেই না কি তার ঠাকুর্দা তাকে নিয়ে যায়। তার মা-র মনে খুব দুঃখ ছিল। তার ঠাকুর্দা বলত, 'না না। মা, ঠাকুমা ওদের মধ্যে মানুষ হ'লে চলবে না। ওর মনকে শক্ত করতে হবে।' বাবুলালের নিজের স্ত্রীর ওপর বড় রাগ ছিল।

ভারী বৈষ্ণব সে। সোনার গোপাল মূর্তি বুকের হারে ঝোলে। নিরন্তর মৌন জপ করে। স্বামীর কাজকর্মকে ঘেন্না করে। বাবুলালের আরো দুটো বিয়ে ছিল। দশ-পনেরো বছর ঘর করবার পর সে বৌ-দের বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারা সন্তান দিতে পারেনি।

কুন্দনের ঠাকুমা ছোট। তার ছেলে হলো, সে ছেলে আবার মাতৃভক্ত। সে যে অন্য ধাতুতে গড়া তা বুঝতে বাবুলালের দেরি হয়নি। দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাবে সে বলে, 'না না, আমি একটির বেশী বিয়ে করব না।'

'উনি এক পত্নীগত প্রাণ, উনি রামচন্দ্র।' বলে বাবুলাল ভর্ৎসনা করে। কিন্তু সে দোষ-ও সে ক্ষমা করে। তখনো বৌয়ের উপর তার ভালবাসা ছিল। তখনো বৌয়ের কথা সে রাখত। কুন্দনের ঠাকুমা বড় সুন্দরী। ধপধপে ফর্সা রঙ, ছোটখাট শরীর। চোখ দুটো বড় বড়, ভাসা ভাসা। সে চোখে পলক পড়ে না। সারা বছর বারব্রত উপবাস করে। ডানহাতটা বৃন্দাবনের

াপালের কাছে বাঁধা দিয়েছে। ডানহাতটা বুকআঁচলের নিচে থাকে। সোনার গোপালের পা ে্র থাকে। বাঁ-হাতে সে সকল কাজ করে। নিজের হাতে খায় না সে, দাসী খাইয়ে দেয়।

বাবুলাল তাকে ভালবাসত। সে বলে, 'ছেলেটাকে পাপ করতে বলছ কেন? নিজে তো ানেক পাপ করেছ।'

'ছোটি, তোর মুখের কথা সামলাস।'

'সামলাব কেন? আমি তোমার স্ত্রী। অধর্ম করলে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না?'

চিরঞ্জীলালকে আবার বিয়ে করতে বলল না বাবুলাল। কিছুদিন বাদেই কুন্দন হলো। ারপর গোপাল, রেবতী আর যশোদা। বাবুলাল খুব খুশী, এমন কি মেয়ে হওয়াতেও অখুশী য়।

কুন্দনের বয়স যখন বছর পাঁচেক তখন থেকে চিরঞ্জীলাল আর বাবুলালের বিরোধ লাগে। রঞ্জীলাল দোকান করতে চায়, কারবার করতে চায়। তার মা বোধ হয় ভেবেছিল সারাজীবন াদে ছেলেকে নিয়ে শান্তি পাবে। ছেলে কথাবার্তা কইলে বাবুলাল নিজেও হয়তো ভাল হতে ়ষ্টা করবে।

চিরঞ্জীলাল আর বাবুলালের মনোমালিন্যের সূচনা কি নিয়ে কে জানে! কিন্তু ছোট ছেলে গাপাল যখন জন্মায় তখন একদিন দু'জনের ভয়ানক ঝগড়া হয়। চিরঞ্জীলাল বোধহয় লেছিল, 'তুমি শয়তান। আমি তোমায় ঘেন্না করি। আমার ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি চলে যাব।'

তার দু'মাস বাদে চিরঞ্জীলাল সহসা নিরুদ্দেশ হয়। সবাই ভাবে হয়তো বাপের সঙ্গে বিরোধ াছে বলে মনের দুঃখে সে দেশ ছেড়েছে। চিরঞ্জীর মা ও বউ সে কথা বিশ্বাস করে। াসবিচালির স্তূপ থেকে ওর রক্তমাখা জামা-কাপড় এবং আমবাগান থেকে ওর মৃতদেহ ওর ামারা খুঁজে বের করে। তার আগে অবধি চিরঞ্জীর মা বলত, 'আমার ছেলে আসবে। আমাকে ায়ে যাবে।'

কিন্তু চিরঞ্জীর মৃতদেহের বিধিমত সৎকার হবার পর সে যেন পাগল হয়ে যায়।

বাবুলাল শোকে দাপাদাপি করছিল। মাথার চুল ছিঁড়ছিল। 'কে খুন করেছে, তাকে আমি করো টুকরো ক'রে ছিঁড়ব।'

শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হলো দরাজ হাতে। বড় বড় পণ্ডিতদের সহায়তায় শান্তি-স্বস্ত্যয়ন হলো। াপঘাত মৃত্যুর দোষ কাটল। বাবুলাল নিজে অত্যন্ত ভেঙে পড়ে। সেটা সকলের নজরে আসে।

কেন যেন বাবুলাল কবচ এবং তাবিজ ধারণ করে। তা দেখে তার স্ত্রী তাকে বলে, 'কেন াত বাড়াবাড়ি করছ? যে পাপ করেছ তাতে তোমার অঙ্গ পচে খসে পড়বে। সন্তানকে হত্যা রেছ সে কি সোজা পাপ?'

বাবুলাল স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারপর সে ক্রোধে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে। তার স্ত্রী লে, 'হ্যাঁ মার। আমাব কি হবে? আমি আমার ছেলের কাছে চলে যাব।'

এ সব কথা সকলের জানার নয়। তবু কেমন ক'রে যেন সবাই জানে। তারপর বাবুলালের ী নতুন বাড়ী কিনতে বলে। সবাই দেখে বউ এর কথায় নতুন বাড়ী উঠল। সে বাড়ীতে াকদিন উঠে গেল বাবুলালের বউ, চিরঞ্জীর বিধবা বউ আর ছেলেমেয়েরা।

বাবুলাল কুন্দনকে নিয়ে আসে। কুন্দনকে নিজের মতো ক'রে গড়তে হবে। নইলে ত্তরাধিকার রেখে যাবে কার হাতে? গোপালকে সে চেয়েও দেখত না।

'দেখবে কি ক'রে? গোপাল যে তার বাপের চেহারা পেয়েছে'—গোপালের ঠাকুমা বলত সে আরো বলত, 'তুমি খাচ্ছ কি ক'রে? বেঁচে আছ কি ক'রে? নরকের ভয় করে ন তোমার? হাতে তাগাতাবিজ পরে আছ পাছে তাকে দেখতে পাও, তাই না?'

আস্তে আস্তে তার শোকের জ্বালা কমল। সে বলত, 'আগুন আমার বুকটা পোড়াচ্ছে জানলে বউ? আর চেঁচাতে পারি না। চিরঞ্জীর বাপকে দেখলে আমার যেন ভয় করে। কই ও মানুষের তো কিছুই হলো না।'

ভয় করারই কথা হয়তো। যে মানুষ নিজের ছেলেকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে তারপর আহার বিহার নিয়ে মেতে থাকতে পারে তাকে দেখলে ভয় হয়। বাবুলাল অবশ্য মদ এবং স্ত্রীলোকে আসক্ত ছিল না। বলত, 'আমি ভবানীর সেবক। আমি পুরুষ। আরে ছোটি, তুই আমায় কি বলবি? আমি পাপ করেছি কিনা তা মা ভবানী বুঝবেন।'

কে জানে কোথায় ভবানী মন্দির। কুন্দন দেখেছে একটা সিঁদুর মাখানো কড়ির চুপড়িকে পুজো করত বাবুলাল। মাঝে মাঝে। সে চুপড়ি বাবুলালের শোবার ঘরের পাশের চোর-ঘরে থাকত। ছোট্ট ঘর। সে ঘরে দিন নেই রাত নেই প্রদীপ জ্বলত। মস্ত পেতলের প্রদীপ। সে প্রদীপ একটা জোয়ান লোক তুলতে গেলে হাত কাঁপে।

'দাদা, আমিও পুজো করব আপনার মতো।' কুন্দন বলত।

'করবি। আগে তোকে দীক্ষা দিই, করবি পুজো।

কুন্দন বাবুলালের কাছে থাকত। ছোরাখেলা শিখত, পিস্তল ছুঁড়তে শিখত। রোজ সকালে কাঁচা দুধ খেত, কুস্তি করতে শিখত।

'কাউকে বিশ্বাস করবি না কুন্দন। আমাকেও না। এ দুনিয়ায় তুই নিজে ছাড়া তোর কোন বন্ধু নেই জানবি।'

মাঝে মাঝে বাবুলাল অদ্ভুত অদ্ভুত কথা কইত। কুন্দনের বছর বারো বয়সে তার খুব অসুখ হয়। সবাই ভাবে সে মারা যাবে। এমন কি একটি ষাঁড়কে অনেক চেষ্টায় দোতলায় আনা হয় ষাঁড়ের ল্যাজ ধরে বাবুলাল স্বর্গে যাবে এ রকম একটা কথা শোনা গেল।

বাবুলাল বিশাল বপু নিয়ে পড়েছিল। সহসা সে গর্জন ক'রে ওঠে, 'এমন আঁধার ক'রে দিল কে?' ষাঁড়টা ঢোকাতে দোরের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। ষাঁড়টা ভড়কে যায়। ধূপধুনো গুগগুলের গন্ধে তার অস্বস্তি হয় এবং সে ধুনুচি উল্‌টে ফেলে কোনমতে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। ষাঁড় বের ক'রে আনা হয় এবং সকলে হতভম্ব হয়ে দেখে বাবুলাল হাসছে। অতঃপর বাবুলাল বদ্যিকে এক ধমক লাগায়। পুরুতকে বলে, 'বেরোও।' তাকে পাশের ঘরে বারান্দায় নেওয়া হয়। বিছানায় শুয়ে সে চেঁচাতে থাকে ক্ষীণ স্বরে, 'যতসব উল্লুক এসে জুটেছে। সব বের ক'রে দেব, বাড়ী থেকে তাড়াব।'

খুব অসুখ হয়েছিল। বুকে পিঠে শ্লেষ্মা বসেছিল। তবু সে সেরে ওঠে। বুকে পিঠে পুরনো ঘি মালিশ করতে হত। দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যেত না। শুধু কুন্দন বসে থাকত। মাঝে মাঝে চোখ চেয়ে বাবুলাল চেঁচিয়ে বলত, 'কেউ কি নেই? সবাই মরেছিস? ছেলেটা একা বসে আছে। খ খেয়েছে?'

বাবুলালের বউ আসত, দাসদাসী আসত। কুন্দনকে তার দাদার কাছ থেকে নিয়ে যেত একদিন ঠাকুমা কাঁদতে কাঁদতে কুন্দনের হাতে একটি মোড়ক দেন। বলেন, 'তোর দাদার

কপালে একবারটি ছুঁইয়ে দিস তো! ঠাকুরের নির্মাল্য।' বাবুলালের কপালে কুন্দন যখন নির্মাল্য ছোঁয়ায় তখন বাবুলাল চোখ বোজে। কুন্দন খুব আনন্দ ক'রে তার ঠাকুমাকে গিয়ে বলে, 'জান, দাদা চুপ ক'রে ছিলেন। আমি খুব ভাল গান ক'রে ছুঁইয়েছি ওঁর কপালে। দাদা এবার ভাল হয়ে যাবেন, তাই না?'

সেদিন তার দাদা তাকে একটা কথা বলেন, শুনে কুন্দন আশ্চর্য হয়ে যায়। সে ভেবে পায় না কেন দাদা এমনধারা কথাটা বলল। সে দাদার পাশে বসে বলে, 'এবার আপনি ভাল হয়ে যাবেন। দাদী আমার হাতে ঠাকুরের পুজোর ফুলে দিয়েছিল।'

কথাটা শুনে বাবুলাল যেন কেমন হয়ে যায়। সে দেওয়াল পানে মুখ ফেরায়। বলে, 'তুই চাস আমি ভাল হয়ে উঠি, তাই না রে?'

'হ্যাঁ, চাই তো!'

'জানিস কুন্দন, একটা কথা জানিস?'

বাবুলাল তাকে কাছে ডাকে। গরম হাত, নিশ্বাস ও গায়ে দুর্গন্ধ। গলা ও ঘাড়ে ময়লা জমেছে। বাবুলাল ফিসফিস ক'রে বলে, 'আমি এমন ক'রে মরতে চাই না। তোর হাতে আমি মরতে চাই।'

'যাঃ!'

'সত্যি রে! আমার খুব ইচ্ছে একদিন তোর হাতে আমি মরব। মহাভারতে শুনিস নি যে ভীষ্ম কেমন ক'রে অর্জুনের হাতে মরলেন?'

'অমন কথা বলবেন না আপনি। আমি কেন আপনাকে মারব! আমি যাচ্ছি, গিয়ে বলে দিচ্ছি সবাইকে।'

তখন বাবুলাল তাকে ছেড়ে দেয়। বলে, 'না রে, আমি ঠাট্টা করছিলাম তোর সঙ্গে।'

বাবুলালের অসুখের সময়ে বোধ হয় সকলের মাথাই খারাপ হয়েছিল। অবস্থা যখন খারাপ হয়, একদিন কুন্দনকে তার মা-র কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভুলিয়ে-ভালিয়ে। বলা হয়, 'যাও, তোমাদের বাগান থেকে দেখে-শুনে কণ্টিকারী আর শ্বেতআকন্দের শিকড় নিয়ে এস। সঙ্গে লোক যাচ্ছে ও চিনে আনবে গাছপাতা। ওষুধ বানালে তবে তো তোমার দাদা সেরে উঠবে।'

কুন্দন যায়। অনেক উৎসাহে গাছের শেকড় ও লতাপাতা সংগ্রহ করে। বিশুয়া তার দাদার ডানহাত। বিশুয়াই কুন্দনের কাজকর্ম করে। সে সঙ্গে ঘোরে।

কিন্তু পরে কুন্দন দেখে তাকে না নিয়েই গাড়ী চলে গেছে। সে খুব দুঃখিত হয়। পরক্ষণেই রেগে উঠে বিশুয়াকে বলে, 'যা, তুই চলে যা! আমি একা চলে যাব।'

গোপাল এসে বলে, 'বড় ভাই, দেখ আমার হরিণের বাচ্চা হয়েছে।' বোনরা অবাক হয়ে কাছে কাছে ঘোরে। মা-কে বলে, 'ও কি আমাদের বাড়ী থাকবে! এখানে খাবে?'

কুন্দনকে সবাই ভালবাসে। খুব ভালবাসে। কিন্তু কুন্দন থাকতে পারে না। কেঁদে বলে, 'আমাকে না দেখলে দাদা মরে যাবে।' মা-কে বলে, 'তুমি কেমন ক'রে আমার দুঃখ বুঝবে? তুমি দাদাকে একটি বার-ও দেখতে যাওনি।'

তার মা তাকে অনেক ক'রে শান্ত করে। তাকে সামনে বসে খাওয়ায়। আদর ক'রে বলে, 'আমার কাছে থাক না দু'দিন। অসুখের বাড়ীতে তোকে কি কেউ দেখে, না খেতে দেয়?'

কুন্দন অবাক হয়ে তাকায় আর খায়। ভাল-ও লাগে, আবার অসোয়াস্তি হয়। এখানে যেন কেমন অন্য রকম সব। মন্দিরে পুজো হয়, গাই গরু বাঁধা থাকে গোহালে। তার মা আর ঠাকুমা কখনো গোপালকে বকে না। গোপাল হরিণ পোষে, পণ্ডিতের কাছে পড়ে। বাইরে একটি অশত্থগাছ। তার নিচে ইঁদারা, একটি ছোট ঘর। একজন বুড়ো চাকর সেখানে বসে থাকে। তার ঠাকুমা রোজ সেখানে ভিজে ছোলা, আম, চিঁড়ে, গুড়, ছাতু, বাতাসা সব বাঁকে ক'রে পাঠিয়ে দেন। যে আসে তাকেই বুড়োটি জল দেয়, একমুঠো খাবার দেয়। সেখানে মাঝে মাঝে কুন্দনের ভাইটি গিয়ে বসে। কুন্দন বলে, 'ওটা কি?'

গোপাল অবাক চোখে দাদার মুখপানে চায়। বলে, 'আমাদের বাবার নামে জলছত্তর, জান না? এখানে সবাই জানে চিরঞ্জীলালের জলছত্তর। তুমি তো বড় ছেলে, তুমি জান না!'

না। কুন্দন তা জানে না। বাবার কথা তার মনেই পড়ে না। ভাসা ভাসা মনে পড়ে একটা হৈচৈ, কান্নাকাটি আর গোলমাল। কে যেন বলছিল, 'বউ কাঁদে না কেন? ও চিরঞ্জীর মা—বউ কাঁদে না কেন?' তারপর একজন বলল, 'ও কি কথা? ও রক্তমাখা জামা কাপড় কি নিতে আছে?'

আর কিছু মনে পড়ে না।

তাকে শ্মশানে যেতে দেয়নি ওরা। এক নিমেষে যেন বাড়ী নিস্তব্ধ হয়ে যায়। 'চন্দনকাঠ কি মণিকর্ণিকায় পাওয়া যাবে না!' কে যেন বললে। হঠাৎ যেন বাড়ীতে কেউ নেই। সমস্ত বাড়ী চুপচাপ। কোথায় মা কোথায় ঠাকুমা কে জানে! ওর পিতামহ খড়ম পায়ে খট খট ক'রে হেঁটে চলে গেল এবং বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে কাকে যেন কি বলতে থাকল। ওরা ছোট ছোট ভাইবোন ক'টি একটা বিছানায় বসেছিল। এক সময়ে বুড়ী দাই এল। সে লাঠি নিয়ে চলত। হাতে একটা পিদিম, লাঠি ঠকঠক ক'রে সে ঢুকল। ওদের নিয়ে গিয়ে সে এক বাটি ক'রে দুধ খাওয়ায়। বলে, 'শুয়ে পড় তোরা। আমি দোরের কাছে বসে থাকি।'

মেঝের বিছানায় ওরা শুয়ে পড়ে। বোন দুটি বুড়ী দাইয়ের কোলের কাছে শুয়ে থাকে। বুড়ী দাই বসে গুনগুন ক'রে কাঁদতে থাকে। 'আহা, দুধের বাছারা তোদের কে বাঁচাবে বল্?' সে বলছিল।

কুন্দন বাবার নামের জলছত্তরের দিকে চেয়ে থাকে। গোপাল বলে, 'জান, আমি কেমন আঁক কষতে শিখেছি। রামচরিত মানস-ও পড়তে পারি আমি।' গোপালের সুন্দর চেহারা, পাতলা ঠোঁট, সরল চাহনি। গোপাল বলে, 'দাদা, তুমি পড়তে পার?'

কুন্দনের মনে হয় তাকে যেন এখানে মানাচ্ছে না। সে যেন এদের এখানে অতিথি। এখানে বলতে গেলে কোন পুরুষ-মানুষের হাঁকডাক শোনা যায় না। মন্দিরের ঘণ্টা, গাইগরু আর গোয়াল। বড় বড় ফলের গাছ, ফুলের গাছ। হরিণ চরে চরে বেড়ায়। এখানে জাঁতা ঘোরবার ঘর্‌ঘর্ শব্দ। মালীর ছেলে গরুর খড় কাটে ঘস্‌ঘস্। কিষাণ, দাসদাসী এদের জন্যে ছাতু, গুড়, আম জলপান দেওয়া হয়। সেই গুড়ের গামলায় বোলতা ওড়ে বোঁ বোঁ একটানা শব্দে। পাখী ডাকে, কুকুর ডাকে। কি যেন পুজোর বার-ব্রত ক'রে ছোট বোন দুটি ঠাকুরমার কাছে বসে থাকে। সুতোর ফাঁদ পেতে দুরুদুরু বুকে চেয়ে থাকে। ঐ ফাঁদে একবার কাক এসে বসলে ওরা কাকের পায়ে তামার মল দেবে, নাকে রুপোর নথ।

এখানে শান্তি, বিশ্রাম, আনন্দ।

ওখানে দু' একটি বুড়ী দাসী ছাড়া কোন মেয়ে নেই। কুন্দনের দাদা বাবুলাল আর তার জোয়ান জোয়ান সহচররা কুস্তি লড়ে, তেল মালিশ করে, লাঠি খেলে, ছোরা খেলে। গঙ্গায় নেমে সাঁতার কাটে। পিঠ সোজা ক'রে বসে বাবুলাল, জীবনে সে হেলান দিয়ে বসল না। ভবানী সেবক সে, ভবানী পুজো করে। মাঝে মাঝে গীতা পাঠ শোনে, মেয়েদের মুখের পানে চায় না, কোন সাগরেদ বদমায়েশি করলে চড় মারে। ধমক দিয়ে কথা কয়, মোটা মোটা গরম রুটি, অড়র ডাল, ঘি আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে খেয়ে নেয়। গোয়ালে রাজগোখরো বেরোলে ল্যাজ ধরে ঝাঁকি দিয়ে অবশ ক'রে ফেলে বাবুলাল।

চীৎকার ক'রে হাসে, গম্ভীর গলায় কথা কয়, পথ দিয়ে চলতে চলতে দু-পাশের সকল লোকের নমস্কার নিতে থাকে।

'কৌন? আরে উ কৌন?'

'বা-বু-লা-ল!'

আঃ, অমন নইলে জীবন! অমন ক'রে সকলের নমস্কার না কুড়োতে পারলে কি চলে?

হঠাৎ কুন্দন ছুট মারে।

ভেতরে গিয়ে চেঁচাতে থাকে, 'জানি না, কিছু জানি না আমি, আমি দাদার কাছে যাব। আমার দাদা মরে যাবে।'

তার ঠাকুমা রেগে ওঠে। ভাইবোনরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কুন্দনের মনে হয় ওর মা বুঝি বাধা দেবে।

ওর মা কিছুই বলে না। ওর মা হাসে এবং তীক্ষ্ণ ও জ্বলন্ত চাহনিতে ওর ঠাকুমাকে বিদ্ধ ক'রে বলে, 'মাতাজী, আমার ছেলেটাকে যে পর ক'রে দিল এর শাস্তি কি ভগবান দেবেন না?'

তারপর কুন্দনকে বলে, 'কুন্দন তোর দাদা বাঁচবে। কেমন ক'রে বাঁচতে পারে তোর দাদা তা জানিস? তোকে একটা কাজ করতে হবে। তোর দাদার ঠাকুরঘরে যে সিঁদুর মাখানো চুপড়িটা আছে তা দেখেছিস?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। দাদার মা ভবানী।'

'ওটাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিতে পারিস?'

'কি বললে?'

'ওটাকে গঙ্গার জলে ফেলে দে। ও পুজোর ঘর ভেঙে দে! ও বাড়ীটা ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে দিতে বল। তোর দাদাকে বল্ গঙ্গার ঘাটে নয় বিশ্বনাথজীর গলির মুখে বসে থাকতে। সকল লোককে যেন ডেকে ডেকে বলে আমি মহাপাপী। আমি আমার একমাত্র—'

ছুটে আসে ঠাকুমা। বউয়ের মুখে হাত চাপা দেয়। কুন্দনের মা মাথা ঘুরে পড়ে যায়। দাসী এসে জল ঢালে। বাতাস করে। বোন দুটো কাঁদতে থাকে।

গোপাল বলে, 'মা-র এমন হয়। মাঝে মাঝে হয়।'

কুন্দন সেদিনই ফিরে আসে। আসবার সময় তার মা-র জ্ঞান হয়। মা আস্তে আস্তে বলে, 'জানি, আমি জানি। ঐ পিদিমটা-ও যদি নিভিয়ে দেয় কেউ, তবে ওর দাদা বাঁচবে। ঐ পিদিম ঐ চুপড়ির মধ্যে পাপ আছে।'

পাপ আছে! কি ভয়ানক কথা। কুন্দন দাদার কাছে গিয়ে বসে। আহা, আর কোন আশা নেই? একবার মনে হয় শুনি মার কথা, দিই এই পিদিমটা নিভিয়ে। আবার মনে হয় না না, হয়তো ঐ পিদিমে বাবুলালের আয়ু আছে।

সেবার বাবুলাল বেঁচে উঠল।

॥ ছয় ॥

কুন্দনের বয়স যখন ষোল বছর, তখন বাবুলাল তাকে দীক্ষা দিল।

কুন্দনের গলা ভারী হয়েছে, বলিষ্ঠ দেহ। রুক্ষ স্বভাব, কম কথা কয় এবং গোঁয়ারের মতো হাত মুঠো করে ভাবে। কি ভাবে তা ওই জানে।

ও বাড়ীতে সে যায় না, যেতে চায় না। ওদের সঙ্গে ওর মেলে না। গোপাল লেখাপড়া করে। মৃদু স্বভাব তার। শান্ত এবং নমনীয়। কুন্দনকে সে ভয় পায়।

কুন্দন এ বাড়ীতে ক্বচিৎ আসে। পালা-পরবে। ফিরে যাবার সময় ওর ঠাকুমা এসে দাঁড়ায়। বলে, 'তোর দাদাকে বলিস দুটো ঘর তোলা দরকার, পুব দালানে।'

'বলব।'

'বলিস পুরোহিত খবর দিয়েছেন। যশোদা আর রেবতীর বিয়ের পাত্র ঠিক করেছেন তিনি।'

'যশোদার বিয়ে! রেবতী যে নেহাৎ ছোট্ট!'

'ঐ বয়সে তোর মা-কে এ-বাড়ীতে এনেছিলাম।'

'জী, আর কি বলব?'

'বলিস এবার চন্দ্রগ্রহণের দিন যেন না বেরোয় তোর দাদা।'

বলে ঠাকুমা কাঁদতে থাকে। কেন কাঁদে তা বুঝে পায় না কুন্দন। তার ঠাকুমা, অপরূপ রূপসী ঠাকুমা, ভুরুর মাঝের নীল উলকি কপালে জ্বলজ্বল করে। চোখদুটি খুব বড় নয়। তবু এখনো যেন সে চোখের চাহনিতে জাদু-মাখানো আছে! ঠাকুমা কেন কাঁদে, কেন পুজোয় পার্বণে বাবুলালকে বেরোতে দিতে চায় না কে জানে। কুন্দন অসোয়াস্তি বোধ করে। চলে যেতে চায়।

যেতেযেতে ফিরে আসে। যশোদা তাকে ডাকছে। যশোদা মোটাসোটা, ফর্সা রঙ, গোল গোল চোখ, ভারী চঞ্চল। নাকে নথ, কানে মাকড়ি, চুলগুলো এদিক ওদিক ঝোলে।

যশোদা সর্বদাই কিছু না কিছু খায়। বাদাম, আচার, ঘি-এর চাঁছি, সরের নাড়ু, বেসনের ঝালকাঠি। কুন্দন ওর কাছে যেতেই হিঙের গন্ধ পায়। যশোদা কি একটা তরকারী চেটে খাচ্ছে। বড় ভাইকে বলে, 'ভাই, মা তোমায় ডাকছেন।'

মা ডাকছেন! বুকের নিচটায় অদ্ভুত সব অনুভূতি হয়। রাগ, দুঃখ অভিমান, ভালবাসা। মার কাছে সে সহজ নয়। বাবুলালকে মা দেখতে পারে না। কুন্দনকে-ও যেন দেখতে পারে না। কুন্দন গোপালের মতো অমন ধীর ও শান্ত নয়। অমন মধুভাষী, কোমল হৃদয় নয় সে। সে কুন্দন। বাবুলালের নাতি। শক্তসমর্থ, চোয়াড়ে, রুক্ষসুক্ষ কুন্দন। কুন্দন ঢোক চেপে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওর মা কাছে আসেন। শাদা পাথরের ঘর, শাদা বিছানা, মা-র পরনে শাদা কাপড়। মা ওর কপালে হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। তারপর ওর হাত তুলে ধরে একটি আংটি পরিয়ে দেন। বলেন, 'কবচতাবিজ তুই রাখবি না, হারিয়ে ফেলবি। এতে দেবতার নির্মাল্য রইল, এই ফাঁপা চৌদানীটিতে।

'কি জন্যে, মা?'

'তোর বয়স হয়ে যাচ্ছে। কোন্‌দিন হয়তো তোর দাদা তোকে নিয়েই বেরুতে চাইবে। তখন তোর এ নির্মাল্য দরকার হবে রে!'

কুন্দন তখন মাকে প্রণাম ক'রে চলে এসেছে।

এ বাসায় আসতেই বাবুলাল তাকে আগ্রহভরে শুধিয়েছে, 'হ্যাঁ রে, ওরা ভাল আছে?'

বাবুলাল বলে, 'তোর ঠাকুমা তোর ননী-মাখনের পুতুল ভাইটা, বোনগুলো?'

'জী।'

'ওরা আমার কথা কখনো শুধোয়? তোর ঠাকুমা শুধোয়?'

'না।'

'বাবুলাল সিদ্ধির গেলাস তুলে চুমুকদেয়। বলে, 'জয় বাবা মহাদেব। তুমি খাও বলে আমিও খাই। দোষ নিও না বাবা!'

তারপর হাসে। হাসে, গম্ভীর হয়। ভ্রূকুটি করে। বলে, 'বটে, আমার খোঁজ কেউ নেয় না। আমিও তোদের খোঁজ নেব না।'

কুন্দনের পিঠে ছোট ছোট চাপড় মারে। বলে, 'এবার তোকে দীক্ষা দেব, সময় হয়েছে।'

বাবুলাল কাছে আসে। বলে, 'ওরা পুণ্য করুক। আমরা দু'জন পাপ করব। তুই আর আমি। তারপর একদিন তোর হাতেই মরব। তোর হাতে মরব এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছে।'

দীক্ষা দেবার জন্যে চন্দ্রগ্রহণের দিন স্থির করা হলো। সেবার কি একটা যোগ পড়লো সে সময়ে। কাশীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে। উটের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, পালকি, হাতি, আসছে তো আসছেই।

সুদূর দক্ষিণ থেকে ত্রিতীর্থ করতে আসে পূণ্যকামীরা। তারা আসে সপরিবারে। আসে হাজার হাজার টাকার হীরে-জহরৎ পরে। কাঁচা টাকা আনে দান-ধ্যানের জন্যে। কাঁচা টাকা নিয়ে চলাফেরা,—সে ঠগী, ডাকাত, লুঠেরাদের জন্যে নিরাপদ নয়।

তাই তারা কোমরের সোনার চওড়া পেটি, গলার মোটা হার আরো আরো সোনার গহনা আনে।

গয়া, কাশী আর ত্রিবেণী—তিন তীর্থে পূণ্যলাভের প্রয়াসী তারা।

বাবুলালদের লোক গয়া থেকে খবর নিল। খবর পৌঁছয় মুখে মুখে, চিঠিতে কতজন যাত্রী এল। কারা শিকার হিসাবে উপযুক্ত হবে।

কাশীতে পৌঁছিয়ে যাত্রীরা শেঠদের দোকান খোঁজ করে। স্বর্ণকার ও মণিকারদের গদীতে গিয়ে তারা গহনার বদলে টাকা নেয়। টাকা দিয়ে দান-ধ্যান করতে হবে।

সুদূর দক্ষিণের যাত্রী তারা। মহারাষ্ট্র থেকে যারা আসে, তারা খানিকটা নিরাপদ।

কেননা, পেশোয়া সাহেবের পরিবার বারাণসীতে। মহারাষ্ট্রীয় অনেকেরই স্বদেশের মানুষের কাছে আতিথ্য মেলে।

কিন্তু মহীশূর বা কর্ণাটক, তাঞ্জোর বা কাঞ্চীপুরমের এইসব যাত্রীরা বড়ই অসহায় বোধ করে। তারা ভাষা বোঝাতে পারে না। বুঝতে পারে না।

স্বভাবতই তারা পাণ্ডা, গয়ালী, এদের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। তারা ভাবতেও পারে না, বুঝতেও পারে না, গয়াতে যে নির্লোভ ব্রাহ্মণ সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে তাদের মন্দির-দর্শন, পিণ্ড-প্রদান, পিতৃতর্পণ, রামশিলা, প্রেতশিলা এবং ব্রহ্মযোনি-দর্শন করিয়েছে—আর কাশীতে যে পাণ্ডা এসে তাদের পূর্ব-পুরুষের ঠিকুজি-কোষ্ঠি একেবারে মুখস্ত বলে তাদের বিশ্বাস অর্জন করলো—তাদের দুজনের মধ্যে কোনও যোগাযোগ আছে, বা থাকতে পারে।

তারা সরল প্রাণে তাদের বিশ্বাস করেছে।

তারপর সেই পাণ্ডাই তাদের থাকবার জায়গা ঠিক ক'রে দিয়েছে। যোগস্নানের সময়ে, এদের নিঃস্ব ক'রে সব নিয়ে নেবার রীতিটা বড় অভিনব। ত্রিবেণী ও কাশীতে এর প্রচলন বেশি।

যোগস্নানের সময় নৌকো নিয়ে নদীর মাঝখানে গিয়ে পাণ্ডার লোকেরা বলে, 'দান কর, তীর্থস্থানে দান কর।'

পাণ্ডার হাতে তারা টাকা দেয়, সোনার গহনা দেয়।

পাণ্ডারা বলে, 'টাকা চাই না। গহনা চাই না। কি তোমার প্রাণের থেকে প্রিয়? তোমার পিতা? মাতা? পত্নী? সন্তান?'

অর্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা। ঘাটে ঘাটে বড় বড় ছাতা ঝলমল করছে। প্রসন্ন সূর্যালোক শত শত বাড়ি ও মন্দিরের চূড়া, ধ্বজা, পতাকা সব ঝকমক করছে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের কালো মাথা দেখা যাচ্ছে নদীর বুকে। বড় বড় রাজাদের রঙীন ও সুন্দর বজরা ভাসছে, নৌকো ক'রে যাত্রীরা মাঝগঙ্গায় আসছে ডুব দেবার জন্যে।

দেখে দেখে এই ধর্মপ্রাণ মানুষগুলির মন উদ্দীপিত হয়। তারা বলে, 'সব দিলাম। পিতা, মাতা, পত্নী, সন্তান—সবাইকে দান করলাম।'

পরিবারের মানুষগুলি আশ্চর্য হয়ে তাকায়। পাণ্ডা হেসে তাদের আশ্বস্ত করে। বলে, 'দান করলেই কি ওদের আমি নিতে পারি? কি করবেন বল বিশ্বনাথজী ঐ সব মানুষকে দিয়ে?'

'তবে কি করব?'

'ওদের কিনে নাও। যা সোনা আছে, টাকা আছে, সব দাও।'

তখন সমস্ত গহনা, পথের সমস্ত সঞ্চয়, সব তুলে দেয় তারা পাণ্ডার হাতে। পাণ্ডার লোক বলে, 'দেশে ফিরে যাবার জন্যে এই টাকা রাখো। যা দিলে সেজন্যে অনুশোচনা করো না। জেনো, আজকের এই যোগস্নানের সমস্ত পূণ্যফল তোমরাই পেলে।'

তারা মুগ্ধ হয়ে সভয় বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। তারপর কখনো তাদের তীরে ফিরিয়ে আনা হয়। কখনো যদি যাত্রীরা গোলমাল করে, তাহলে ইশারা মাত্রে আরো অনেক নৌকো ভিড় ক'রে আসে। নৌকোয় নৌকোয় ধাক্কা লাগে। লোকজন চেঁচাতে থাকে। গঙ্গার ওপর কালো কালো নৌকোগুলো দুলতে থাকে।

দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার কোন হিসেব নেই। কে মারা গেল, কেমন ক'রে মরল কেউ তার হিসেব নেয় না।

হিসেব রাখে বাবুলাল। এ সময়ে সে তোলা নেয়। পাণ্ডারা তাকে হাতে রাখে তাই টাকা দেয়। তীর্থযাত্রীরা দেয় প্রাণ ভয়ে। বাড়ীর ছাতে দাঁড়িয়ে থাকে, চোখে দূরবীন। দেখে নৌকো ডুবছে কিনা, গোলমাল হচ্ছে কি না!

এই চন্দ্রগ্রহণের দিন সে কুন্দনকে দীক্ষা দিল। বলল, 'চল্ আমার সঙ্গে।'

শিবালাবাজারে তাদের যে যাত্রীবাড়ী আছে সেটা খোলা হয়েছে।

ঘরে ঘরে কম্বল, পিদিম, জলের সোরাই। রান্নার কাঠ, মাটির হাঁড়ি, তামার জালা এ সব-ও দেখা যায়।

বাবুলাল আর কুন্দন পুবের ঘরে ঢুকল। মাটিতে শুয়ে আছেন একটি বৃদ্ধ। মুণ্ডিত মস্তক, ফেত্তা দিয়ে কাপড় পরা। কানে এবং আঙুলে হীরে। তার কাছে একটি নতমুখী বউ বসে কি যেন করছে। পাশে এক শিশু। একটি যুবক ঘরে ঢোকে এবং হাতজোড় করে। বলে, 'দেবতা, আপনার অশেষ কৃপা। আজ আমার অনেক দিনের আশা পূর্ণ হবে।'

কুন্দন দেখে পুরুষটির গলা ও কানে হীরে। গলা থেকে একটি সোনার যজ্ঞসূত্র ঝুলছে। বউটি নেহাত ছেলেমানুষ। নাকে, কানে, সিঁথিতে, গলায় গহনা ঝলমল করছে। কোমরে একটা চওড়া সোনার পেটি।

যুবকটি হাতজোড় ক'রে বলে, 'পিতাজীকে নিয়ে যাব তাই একটি ডুলি চাই।'

বাবুলাল ভরাট গম্ভীর গলায় বলে, 'আহা, এমন পিতৃভক্তি আজকাল দেখা যায় না।'

ছেলেটি বলে, 'মাকে কথা দিয়েছি এবার তাঁর নামে পুজো দেব। পিতাকে বিশ্বনাথ দর্শন করাব। দেখুন, আমার বড় সৌভাগ্য। গয়াতে যখন এলাম তখন একটি চমৎকার লোককে পেলাম। সে আমাদের সব দর্শন করালে। সে আপনার ঠিকানা দিল। এখানে এসে দেখছি আপনার মতো মানুষ হয় না।'

ভারী খুশী সে। একবার কুন্দনকে নিয়ে বাবুলালের গদীতে গেল। হীরের আংটি এবং নথ বেচল। বলল, 'হীরের দাম আমি জানি। সেই জন্যেই হীরে আনা। বেচে টাকা পাব। নইলে তীর্থে দান-ধ্যান করব কেমন করে?'

গদীতে সকল কথাবার্তা বোধহয় বাবুলালই বলে রেখেছিল। কুন্দনের কোন অসুবিধে হয় না। যুবকটি একটু হেসে বলে, 'জানি টাকা-পয়সা আনা মুশকিল। সোনা-ই বা কত আনব? তাই হীরে এনেছি।'

সে খুব কথা কইতে ভালবাসে। কুন্দন কি তার মুখে হিন্দী শুনে আশ্চর্য হচ্ছে না? তারা, দক্ষিণীরা, ক্বচিৎ হিন্দী শেখে। তার মামা হায়দ্রাবাদে থাকেন। ছেলেটি সেখানে বছর চারেক ছিল। হিন্দী বলার সুযোগ পেলে সে ছেড়ে দেয় না। একটা ভাষা শেখবার সুবিধে কত দেখ। কে জানত একদিন কাশী আসতে হবে এবং কথা কইতে এমন সুযোগ পাবে সে।

'তুমি আমার ছোট ভায়ের মতো। আমার ভাইকে রেখে এসেছি মা-র কাছে। তুমি একবার এস। জান, তৈলঙ্গস্বামী আমাদের দেশেরই লোক। আমাদের দেশের মানুষ আসে এবং যায়। তাদের সঙ্গেই যেতে পারবে, আসতেও পারবে।

'তুমি ভাবছ তোমাকে টক তেঁতুল আর লঙ্কা খাওয়াব? না না। ও তোমার শোনা কথা। একটিবার এস। দুধ খাওয়াব, দই, ঘি, সব! ফল খাবে যত চাও! এখানে তো নারকেল গাছ নেই। ওখানে কত নারকেল গাছ। সমুদ্র তো দেখনি। আমার বাড়ী থেকে সমুদ্র মাত্র এক মাইল দূরে। সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যায় সর্বদা।'

সেই রাতে মেঘ ভাঙা আকাশে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল। খণ্ডগ্রাস। একসময়ে চাঁদ রাহুমুক্ত হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে 'জয়বাবা বিশ্বনাথ', 'হরহর মহাদেব', 'জয় গুরু, নামগুরু' শোনা যায়।

তীব্র বাতাস দিচ্ছে। ঘাটে ঘাটে কাশীনরেশ এবং ঘাটপাণ্ডারা আলোর ব্যবস্থা করেছেন। ঘাটের রাণার দু'পাশে লোহার আংটায় গাঁথা মশাল জ্বলছে। মশাল মাঝে মাঝে নিভে যায়। গালা পোড়া গন্ধ উঠছে।

অবাক হয়ে চেয়ে দেখে কুন্দন। এ যেন সৃষ্টির শেষ দিন। আকাশ পানে চেয়ে দেখে ভাঙা মেঘে চাঁদের আলো যেন ধূমল ও পাটকিলে দেখাচ্ছে। কত মানুষ মাথা ডোবাচ্ছে, মাথা তুলছে। কে জানে ওরা সবাই উঠতে পারবে কি না। মানুষের মাথায় মাথায় কালো জমাট একটা ভিড়। ঘাটের সিঁড়ি কি পেছল হয় নি? কে ওদের টেনে তুলবে?

বাবুলাল, কুন্দন, পাণ্ডা, নবাগত পরিবারটি, মাঝি-মাল্লা সবাই মাঝগঙ্গায়। মস্ত বড় নৌকো। নৌকোয় বসে সব দেখছে তারা। স্নান হলো। মাঝি-মাল্লারা হাত ধরে এবং ঝুপঝুপ ক'রে ডুব দিইয়ে তোলে। বৃদ্ধটির মাথায় পেতলের ঘটি ক'রে জল ঢালা হয়।

যুবকটি হাসি-ভরা চোখে চায় এবং পাণ্ডাকে বলে, কৃপয়া কর্ ইয়ে দান লেকে মুঝে ধন্য কীজিয়ে।'

বাতাসের ঝাপটায়, নৌকোর দুলুনিতে তার কথা যেন কেটে কেটে যায়। যুবকটি হাসে। তাকে বাবুলাল শিখিয়েছে 'যদি শ্রেষ্ঠ পুণ্য পেতে চাও তবে গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে তোমার প্রিয়তম স্ত্রী, পুত্র, পিতা এদের দান ক'রো। তারপর স্বর্ণমূল্যে কিনে নিও।

সে পিতা, পুত্র, পত্নীকে দান করে। কুন্দনের মনে আছে মেয়েটি যেন অসহায়ভাবে চায় স্বামীর দিকে, তারপর বাবুলালের দিকে চায়।

মেঘ আসছে, মেঘ সরে যাচ্ছে। বাবুলালকে এখন বড় ভয়ানক দেখাচ্ছে। প্রায় সত্তর বছর বয়স। শরীর যেন শাদা পাথরে কোঁদা। কোমরে লাল চেলীর ধূতি, ভিজে লেপটে আছে। মাথায় বেশী চুল নেই। কোমরে হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে আছে নৌকোর পাটাতনে। নৌকো উঠছে নামছে। বাবুলাল যেন এক ভয়ানক ঐশী শক্তি দ্বারা অধিকৃত হয়েছে। কুন্দন সভয়ে শোনে সে 'জয় ভবানী, জয় ভবানী' বলছে!

যুবকটি দান করছে। টাকা দিচ্ছে, মোহর দিচ্ছে। কিন্তু পাণ্ডা হাত পেতে আছে। পাণ্ডা লুব্ধ দৃষ্টিতে ওদের অলঙ্কারের দিকে চায়। মেয়েটি অসহায়ভাবে এদিকে চায়, ওদিকে চায়। আহা অজানা শহর, অচেনা নদী, অপরিচিত সব লোক। সে শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

যুবকটি হতবাক্। সে বাবুলালের মুখপানে চায়। কুন্দনের বুকটা গুরগুর করছে। তার দাদা কথা বলে না কেন? যুবকটি যে কি বলছে। কিন্তু বৃদ্ধটি বোধহয় বুঝেছে। সে কি যেন বলে। যুবকটি তখন বুকফাটা চীৎকারে বলে, 'বাবা, বাবা, সর্বনাশ হয়েছে। আমরা গুণ্ডার হাতে পড়েছি।'

গুণ্ডা! না না গুণ্ডা নয়, আমার দাদা গুণ্ডা নয়। তোমরা জান না। কুন্দন এ কথা বলতে য়। কিন্তু মাঝি, মাল্লা, সবাই চেপে ধরেছে ওদের। সকল গহনা খুলে নিচ্ছে। ঐ শিশুটির য়ে হাত দিল গো! হাত দিও না, হাত দিও না। আমি ওর ভাষা বুঝিনি কিন্তু ও আমার াছে এসেছিল এবং লালাসিক্ত আঠাআঠা নরম আঙুল দিয়ে আমার মুখ ছুঁয়ে কি যেন নছিল। ঐ মেয়েটির রঙ ময়লা, কৃশ চেহারা। ও যেন সারাদিন ভীরু একটি মিনতির তো সকাতরে চেয়ে থাকছিল। ঐ বৃদ্ধটির হাত ধুয়ে দিচ্ছিল ও, আমার দিকে চেয়ে সছিল।

সব কেড়ে নিয়ে ওরা পরিবারটিকে নিঃস্ব করেছে। কিন্তু এখন চাঁদের আলো পড়ে কি লমল ক'রে ওঠে। ঐ বউটির গলার মঙ্গলসূত্র। সোনার সপ্তসূত্র, মাঝে মাঝে প্রবাল ও মুক্তোর কতি। বউটি গলায় হাত রাখে, ভয় পায়। সে এদিকে ওদিকে চায়। কুন্দন জানে এ ওর ায়তি চিহ্ন।

আয়তিচিহ্ন? 'আমার আয়তিচিহ্ন মুছে গেল গো'—সহসা তার মা-র কণ্ঠের সে চীৎকার ান শুনতে পায় কুন্দন। কুন্দন লাফিয়ে পড়তে চায়। সে বাবুলালের দিকে চেয়ে বলে, 'বুঝেছি। াপনি মানুষ নন্। আপনি রাক্ষস।'

সে মাল্লাটার হাতে সজোরে দাঁড়ের আঘাত হানে। মাল্লাটা যন্ত্রণায় চেঁচায়। বাবুলাল তখন সে। ভীষণ হাসি, উচ্চকণ্ঠে হাসি।

'আরে মূর্খ, তোকে ভবানী মন্ত্রে দীক্ষা দিচ্ছি তুই বাধা দিচ্ছিস?'

বাবুলাল লাফিয়ে পড়ে।

নৌকোটা ভীষণ দুলে ওঠে। দুলুক। মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে নেয় বাবুলাল। কুন্দন শিশুটিকে ধরতে য়। কিন্তু নৌকো উলটে গেছে। উলটে দিয়েছে ওরা। চারপাশের সব নৌকোই তো বুলালের। যুবকটি কাকে বাঁচাবে! পিতাকে না পত্নীকে, না পুত্রকে!

মাথা তুলতে অবকাশ পায় না ওরা। নৌকোয় নৌকোয় ভিড় ক'রে ওদের মাথা লতে দেয় না। মাঝিরা দাঁড় মারতে থাকে। যদি কেউ মাথা তোলে তবে মাথা ফেটে বে।

কুন্দন বাবুলালকে মারে।

চেঁচিয়ে ওঠে সে, গালি দেয়! তারপর নৌকো থেকে নৌকোয় পা দিয়ে ওপাশে জলে ড়ে এবং ও পারে বালুচরে গিয়ে ওঠে।

ছুটতে থাকে সে। কিন্তু বাবুলাল তাকে ছাড়বে কেন? বাবুলালও ছোটে। মাল্লারা যেন বলে। কুন্দন শুনতে পায় বাবুলাল বলছে, 'চুপ কর্ শালারা। আমি আমার নাতির কাছে চ্ছি।'

একসময়ে বাবুলাল তাকে ধরে ফেলে। তাকে বালুর উপর ফেলে দেয়। দুজনেই হাঁপায়। দন কাঁদে এবং বাবুলাল ফোঁস ফোঁস ক'রে নিশ্বাস ফেলে। বাবুলাল কথা বলে। ভাঙাগলা, রী গলা। এখন সে গলায় সকরুণ মিনতি।

'হ্যাঁ, তুই আমার পরিচয় পেলি। তোকে, একমাত্র তোকে আমি বেছে নিয়েছি। পাপ একা া করা যায় না রে! পাপ করতে-ও সঙ্গী চাই। ওরা বুঝবে না। সঙ্গী চাই আমি। বাপের

ব্যবসা ছেলে করবে, এই তো নিয়ম। তোর বাপ বেইমান। তাই আমি তোকে বেছে নিয়েছি রে কুন্দন! তোকে বেছে নিয়েছি।

'আমার বাপ ছিল ঠগ। ভবানী-ই আমার দেবতা। কিন্তু এখন সে ব্যবসা চলে না। দেখ আমি-ও কম লোক নেই। আমি বাবুলাল, এক এবং একমাত্র বাবুলাল!

'কুন্দন, তুই আমায় ঘেন্না করবি কর্। তবু ছাড়তে পারবি না আমায়।'

'কে বললে?' কুন্দন মুখ খোলে।

ঐ সূর্য উঠছে। ঐ আকাশ ফর্সা। বালুচরে বসে আছে দুজন। বাবুলাল এবং তার নাতি। দু'জনের শরীর থেকে বালু খসে পড়ে যাচ্ছে। বাবুলাল হাসে। আনন্দের হাসি, বিজয়ীর হাসি।

'কে বললে? আমি বলছি। যা, তোর ঠাকুমার কাছে যা, মার কাছে যা, তারা তোকে কেমন দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টানে দেখ্‌গে যা! তারা যে পুণ্যবতী!'

বাবুলাল থুথু ফেলে। মুখ বিকৃত ক'রে বলে, 'পূণ্যবতী! আমার পয়সায় তোরা খাস না পরিস না?'

কুন্দন বলে, 'তাতে ওদের পাপ হবে কেন? তোমার কর্তব্য ওদের প্রতিপালন করা।'

বাবুলাল বলে, 'তা হবে। রত্নাকরের বউ-ছেলের যখন পাপ হয়নি তখন ওদের হয়তো পাপ হবে না। কিন্তু তুই?'

কুন্দনের হাতটা খপ ক'রে ধরে সে। বলে, 'কুন্দন, আমায় তুই ভক্তি করতিস। দেখ, আমার আসল পরিচয় তোকে ইচ্ছে ক'রেই দিলাম। ভক্তি ভেঙে দিলাম। ভক্তি বেশীদিন টেকে না। পাপ দিয়ে বাঁধলাম তোকে। এখন আর ছাড়তে পারবি না আমাকে।'

কুন্দন নিশ্বাস ফেলে।

সে তা জানে। আর কোনদিন সে ওদের একজন হতে পারবে না। শাদা পাথরের ঘরে শাদা কাপড় পরে পিদিম জ্বেলে যেখানে একজন বসে থাকে। ছোট ছোট দুটি মেয়ে যেখানে ফুল তুলে মল বাজিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মন্দিরের ঘণ্টা, চিরঞ্জীলালের স্মৃতিতে জলসত্র, সে ও-জগতে আর যেতে পারবে না।

তার মনের কথা যেন বাবুলাল বোঝে। বাবুলাল যেন সত্যিই ঐশী শক্তি পেয়েছে। বাবুলাল বলে, 'এরপর আর মানুষকে বিশ্বাস করতে পারবি না। অল্প বয়সে বিশ্বাস ভেঙে দিলে ভাল। আর বিশ্বাস আসে না। কুন্দন, তোর যে কাজ, তাতে যত অবিশ্বাসী হবি ততই ভাল।'

অনেক পরে তারা দু'জন নদী পেরিয়ে নৌকো কেদারঘাটে বাঁধে এবং উঠতে থাকে।

অনেক সিঁড়ি। সিঁড়ির পর সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি। একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নামছেন। বলছেন, 'ব… পাপ, বড় পাপ। দে মা, পাপ ধুইয়ে দে মা!'

সেই কথাটি মনে পড়ে কুন্দনের। আর মনে পড়ে একটি দুটি বিবর্ণ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ ভেসে চলেছে। ঘাটের স্নানার্থিনীরা বলছে, 'কাল অনেক মরেছে গো! ঘাটপাণ্ডারা হিসেব নিচ্ছে।'

॥ সাত ॥

কিছুদিন বাদেই যশোদা এবং রেবতীর বিয়ে হয়ে গেল।

খুব ধুমধাম হলো। বাজী পুড়ল, তুবড়ি ফাটল, হাউই উড়ে গেল। হাতির পিঠে বর বসিয়ে শোভাযাত্রা করা হলো। সম্ভবত তখনই কুন্দনের মা বুঝতে পারে ছেলে কোন্ পেশা ধরেছে। সে সব বুঝেছিল। তবে কুন্দনকে কাছে ডেকেছিল। বলেছিল, 'কুন্দন, একটা কথা দিবি তুই আমাকে।'

'কি মা?'

'বল্ তুই বিয়ে করবি না?'

কুন্দন চুপ। বিয়েবাড়ীতে অনেক লোকজন। তার 'পরে অনেক কাজ। তার বয়স সবে কুড়ি। বাবুলাল এ বাড়ীতে আসেনি সকল বিলি-ব্যবস্থাই কুন্দনকে করতে হয়েছে। গম্ভীর ও বিষণ্ণ মুখ কুন্দনের। ক্বচিৎ সে হাসে। এখন বিরক্ত হলো। সরে যেতে চায় সে।

তার মা বলে, 'তোর বউ এলে সে জ্বলে-পুড়ে মরবে। তুই বিয়ে করিস না।'

কুন্দন একটি নিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ে। অনেক কাজ তার, কাজের শেষ নেই। অন্য জায়গা থেকে আত্মীয়স্বজনরা এসেছেন। তাঁদের আদর-আপ্যায়ন করা দরকার। গোপাল হিসেব রাখছে। গোপাল ধপধপে শাদা জামা ও ধুতি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুন্দন বলেছে, 'আমি সকলের সামনে যেতে চাই না। তুমি আমায় জানিয়ে দিও, কখন কি দিতে হবে।'

একটি ছোট ঘরে লোহার সিন্দুক। তাতে তোড়াবন্দী টাকা। পেতলের থালায় গয়না। সে ঘরের চাবি কুন্দনের কাছে। এক সময়ে সে ঠাকুমার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'এবার ও সব হোম পুজো সেরে নিতে বল। যশোদা আর রেবতী ঘেমে উঠল যে!'

হঠাৎ গোপাল এসে তাকে ডাকল। ভয়ার্ত ও পাংশু মুখ। তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে যায় গোপাল। বলে, 'শীগগির একবার আমার সঙ্গে চল।'

'কেন?'

'ঠাকুর্দা এসেছেন। তোমায় ডাকলেন।'

'ঠাকুর্দা?'

কুন্দন ছুটে গেল। বাড়ীর পেছনে আমবাগানের আঁধারে। চুপটি ক'রে ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছে বাবুলাল। তার পেছনে একজন চাকর। গোপালকে সরিয়ে দেয় বাবুলাল। বলে, 'চলে যা ভেতরে। শুনে যা! আমার পঞ্চাশটি লোক রয়েছে। তারা দেউড়ীতে থাকবে। তুই সামনে যাসনে। দুটো লোক পাঠালাম। অন্দরের দোরে থাক।'

কুন্দনকে কাছে ডেকে সে বলে 'জামা খোল!'

'কিন্তু কেন? আপনি এলেন কেন?' কুন্দন জানত ঠাকুর্দা আসবে না। বাবুলাল বলল, নহবৎলালের বাপ গুণ্ডা পাঠিয়েছে। খবর পেয়েই আমি এলাম। ওরা তোকে মারতে চাইবে। মেয়ে দুটোকে বিধবা করতে চাইবে। আমি তো ওদের চিনি। চোরাখুনে ওদের জুড়ি নেই। নে জামা পর।'

কুন্দন লোহার জালের আচ্ছাদন বুকে বাঁধে। তার 'পরে জামা পরে। সে ভাবিত হয়েছে। নহবৎলাল সম্পর্কে তার মামা। আশি বছর ধরে তাদের মধ্যে গোলমাল। নহবৎলালের

জাঠতুতো বোন হলো কুন্দনের মা। চিরঞ্জীলাল আর নহবতের বোনের বিয়ে দেবার পেছনে একটি শুভ সংকল্প ছিল।

বংশে বংশে বিরোধ বড় ভয়ানক জিনিস। দুই বংশে যতদিন একটিও পুরুষমানুষ জীবিত থাকে ততদিন রক্তপাতের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে বিবাদ এমন ভয়ানক হয়ে ওঠে যে এক একটি বংশের নাম পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে যায়।

কিছুদিন চিরঞ্জীলাল ও নহবৎলাল বেশ মিলেমিশে ছিল। তারপর বাবুলাল প্রস্তাব করে একটি মেয়ের ক্রীতদাস হয়ে থাকা বড় লজ্জার কথা। চিরঞ্জী এবার নহবতের নিজের বোনকে বিয়ে করুক। ও বউটার দেমাক কমে যাক। নহবৎ বাবুলালকে বড় ধরেছে।

সে বিয়ে হয়নি। চিরঞ্জী বলেছিল, 'ছি ছি, এক স্ত্রী থাকতে আর বিয়ে করা বড় পাপ।'

বাবুলাল রেগে বলে, 'উনি রামচন্দ্র! উনি এক পত্নী নিয়ে থাকতে চান!'

সে বিয়ে হয়নি। নহবতের বাপ বিশ্বাস করেনি চিরঞ্জী বেঁকে বসেছে। সে বাবুলালকে বলে, 'দেখো এর ফল ভাল হবে না।'

আবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। চিরঞ্জীর মৃত্যুর পর নহবৎলালকে একদিন কে বা কারা খুন করে। বাবুলাল সদম্ভে জানায়, যে খুন করেছে সে ঠিকই করেছে। পৃথিবী থেকে ঐ পোকামাকড়গুলো যত তাড়াতাড়ি সরে যায় ততই ভাল। সে কুন্দনকে ইদানীং বলত, 'গণেশীপ্রসাদ নহবতের ছেলে। সম্পর্কে তোর মামাতো ভাই। দেখিস ওরা তোকে মারতে চেষ্টা করবে।'

আজ সেইদিন।

এমন সুযোগ আর কবে হবে! বাড়ীতে লোকজন আসছে যাচ্ছে, ভিড় কলরব। বাজীর শব্দ বোম ফাটাবার শব্দ। এত হট্টগোল এত ভিড়! কুন্দনকে যদি কেউ মারতে চায় সহজেই মারতে পারে।

কুন্দনের শিরায় শিরায় রক্ত চঞ্চল। সারাদিন সে কিছু খায় নি। এখন যেন সে সব কথা মনে রইল না। গোপালকে ডেকে সে বিপদের সম্পর্কে সাবধান করে। একবার যশোদার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। খুব সেজেছে মেয়েটা। ওর কষ্ট হয়। বোন দুটো চলে যাবে কতদূরে। ফৈজাবাদে আর জৌনপুরে। যশোদার ভাবী শ্বশুর নাকি ওকে বিশেষ আসতে দেবে না। কুন্দন দেখল যশোদা আর রেবতীর গায়ে হীরে-মুক্তো ঝলমল করছে। সে তার ঠাকুরমাকে ডাকে। নিচুগলায় বলে, 'ওদের কাছে থাক।'

ওর ঠাকুমা বোঝে। ওর মা বোঝে। তারা সাবধান হয়। কুন্দন বাইরে চলে আসে। বর এল। হাতি, ঘোড়া, পালকি। হাউই উড়ল। মস্ত বড় ফরাস। বরদের এবং বরকর্তাদের বসিয়ে কুন্দন দোরে পাহারা রাখে। একসময়ে গণেশীপ্রসাদ এল। কুন্দনেরই বয়সী। মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ। ফর্সা ধবধবে রঙ, লম্বা এবং পাতলা। গণেশী একা আসেনি। তার সঙ্গী-সাথীরা এসেছে গণেশী বলল, 'এই যে কুন্দন ভাই।'

সে হাত বাড়াল। কুন্দনকে আলিঙ্গন করতে চায়। কুন্দন বিপন্ন বোধ করে। আলিঙ্গন ক'রে জড়িয়ে ধরল, ছোরা মারল এবং নিজেরা ছোরা দেখিয়ে বেরিয়ে গেল এ খুবই স্বাভাবিক 'কুন্দন, কি? কাছে এস!' গণেশী হাসছে।

কুন্দন নিশ্বাস ফেলল। তারপর সে এগিয়ে এল। না, কাছে পিঠে কেউ নেই। তার নিজের লোকরা নেই। না থাক। মরি তো এখনই মরব। গণেশীকে বলতে দেব না কুন্দন কাপুরুষ। গৃহস্বামী হয়ে অতিথির সঙ্গে কোলাকুলি করে না, কুন্দন এমন অভদ্র একথাও বলতে দেব না।

সে গণেশীর কাঁধে হাত রাখে এবং হাসে। তার কপালে ঘাম। সে হাসে এবং বলে, 'আমার কি সৌভাগ্য। এস এস!'

'কুন্দন! সরে যা!'

চমকে ওঠে কুন্দন, চমকে ওঠে গণেশী। গণেশী সাপের মতো ফুঁসে ওঠে, 'বটে!'

সবাই সরে যায়, জায়গা ক'রে দেয়। বাবুলাল আসছে। তার পেছনে কম ক'রে পঁচিশটি লোক। বাবুলালের পায়ে নাগরা মাথায় রেশমের পাগড়ী। সবাই অবাক হয়েছে, ছুটে এসেছে দেখতে। বাবুলাল এসেছে। বাবুলাল আসবে কে জানত! কুন্দন জানত না ঠাকুর্দা সামনে আসবে। বাবুলাল বলে, 'ওরে, আতর আন্, গোলাপ আন্, মালা দে!' সে আলিঙ্গন করে।

সে হাত ধরে নিয়ে যায় গণেশীকে। সে বসায়। সে অন্দরে আসে। গম্ভীর গমগমে গলায় বলে, 'এত হাসি কিসের রে? বরের বাড়ীর লোকদের পান দে, আতর গোলাপ দে!'

ঝি-চাকর ছুটে পালায়। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সবাই। ছোট ছোট কথায় ফিসফিস ক'রে কান থেকে কানে প্রচার করে সংবাদ। বাবুলাল এসেছে। চিরঞ্জীর মৃত্যুর বারো তেরো বছর বাদে এই প্রথম বাড়ীতে পা দিয়েছে।

বাবুলাল কিছুই করল না।

সে এসেছে এই সংবাদটি শুধু ছড়িয়ে দিল। স্ত্রী বা ছেলের বউকে সম্ভাষণ করল না। নাতনীদের বলল, 'এ কি, তোর ঠাকুমা তোদের ঠকিয়েছে। এই দেখ, আমি তোদের জন্যে কি এনেছি?'

তাদের গলায় নবরত্নের সাতলহরী পরিয়ে দিল। বলল, 'নাত জামাইদের বশ ক'রে রাখিস, বুঝলি? রেবতী তো লেখাপড়া জানা বাড়ীতে যাচ্ছিস। ওখানে সব ব্যাটা ফার্সী পড়ে।'

যশোদাকে বলল, 'তোর শ্বশুরের শুনলাম বৃন্দাবনের নন্দরাজার মতো গোরু মোষ আছে? আমায় একটা গাই পাঠিয়ে দিস। দুধ খাব আর তোর শ্বশুরের নাম করব।'

তারপর সব যেন এক নিমেষে সহজ হয়ে গেল।

কুন্দনের বুক থেকে অস্বস্তির বোঝা নামল। অতিথিদের সাদর সংবর্ধনা, আদর-আপ্যায়ন কিছুতেই ত্রুটি রইল না। বাবুলাল তাকে একবার শুধু বলল, 'সবাই চলে যাবে তারপর তুই আর আমি খাব। এখন কিছু খাসনে।'

সব হলো। একসময়ে কুন্দন গিয়ে পেছনের ঘরে ঢুকল। এ ঘরটায় এতদিন যশোদা ও রেবতী থাকত। এখন আর কেউ থাকবে না।

কুন্দন বিছানায় বসল। তার মনটা আঘাত পেয়ে বিমূঢ় বোনদের বিয়ের সকল দায়িত্ব সেই নিয়েছে। তার মা একবার জিগ্যেসও করেনি সে খেয়েছে কি না! অথচ সে জানে মা একবার জিগ্যেস করলে সে কি শান্তি পেত! ঠাকুর্দাকে সে সহ্য করতে পারে না। অথচ ঐ মানুষটির তার জীবন বাঁধা। আজ এক চূড়ান্ত বিপদ হতে পারত। ঠাকুর্দা এসে তাকে স্বস্তি দিল।

কুন্দন ভাবতে থাকে, মা বলেছে তুই বিয়ে করিস না। গুণ্ডাকে, খুনেকে মা ঘেন্না করে। মা ঘেন্না করে। ভাল ভাল। অথচ গুণ্ডামি ও বদমায়েসীর টাকা অসংকোচে নিতে পারে

ওরা। একসময়ে কুন্দন ঠাকুর্দাকে ভালবাসত। 'মরা মরা' বলতে বলতে রামনাম শেখার কথা মিথ্যে। তাহলে ঠাকুর্দা ওর কাছে ভাল থাকবার জন্যে সৎ হবার ভান করত। ভান করতে করতে একদিন হয়তো সৎ হয়ে যেত।

ঠাকুর্দা তা করল না। ঠাকুর্দা বোধ হয় তা চায় না। বলে, 'ওরে, আমি খুনে, আমি গুণ্ডা। আমি ভাল হবার ভান করতে চাই না।'

কুন্দনের মনের সকল ভালবাসা সে নিজের হাতে মুছে দিয়েছে। তারা দু'জন এক অদ্ভুত নাগপাশে বাঁধা।

কুন্দন তার মা, ভাই, বোন, ঠাকুমা ওদের দূরে রেখে চলে। কি দরকার! গোপাল লেখাপড়া করুক, মা-ঠাকুমা পুজোআর্চা করুক। সে বাবুলালের মতো ওদের ভারবহন ক'রে চলবে। চিরদিন।

তা বলে কি ওদের বীতরাগও বইতে হবে? মা কেন তাকে এমন করে? বিয়ে করতে দেবে না কুন্দনকে। একজন কেউ নিজের মানুষ না থাকলে মানুষ বাঁচে কি করে?

কুন্দনের মনে হলো সবাই মিলে যেন তার ওপর অনেক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

'দাদা!'

কুন্দন চোখ তুলল। বাইরের কোলাহল কমে এসেছে। অনেকক্ষণ বসে আছে সে। সে বলল, 'যশোদা?'

যশোদা কাছে এল। একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'সবাই খেয়ে নিয়েছে। তুমি খাবে না? ছোট ভাই তোমায় খুঁজছিল।'

'সে কোথায়?'

'খেয়ে নিয়েছে।'

'তুই উঠে এলি যে?'

যশোদা বলল, 'তুমি চল, মা ডাকছে।'

'মা ডাকছে?'

'হ্যাঁ, একটু আগে ঠাকুর্দা স্নান করতে গেছেন। আমি বললাম দাদা কিছু খায়নি।'

'কেমন ক'রে জানলি?' কুন্দন জীবনেও যশোদার সঙ্গে একসঙ্গে এতগুলো কথা কয়নি। যশোদা মেঝেতে বুড়ো আঙুল ঘষল। বলল, 'জানি। তোমার তো খাওয়ার কতরকম নিয়ম আছে। কে তোমাকে এখানে সব ক'রে দিল? কখন খেলে? তুমি কি সকলের সামনে খাও?

কুন্দন অবাক এবং মুগ্ধ। তার গলাটা যেন আটকে যায়। সে চেয়ে থাকে। যশোদাকে সে ছোটবেলা থেকে স্নেহ করত। যশোদা মোটা-সোটা, একটু লোভী, ভালমানুষ। মেয়েরা এত বোঝে! মেয়েদের হয়তো জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ে তাড়াতাড়ি।

যশোদা বলল, 'সব বুঝতে পারি আমি। মা কথায় কথায় মূর্ছা যান, রেগে থাকেন। ঠাকুমা সব কাজ পারেন না। রেবতী বড় সাজগোজ নিয়ে থাকে। আমিই তো সব দেখি। জানি গোরুগুলোর কষ্ট হবে। আমি ওদের দেখতাম।'

সে কুন্দনকে ডাকল।

কুন্দনকে সে পেছনের দোর খুলে নিয়ে গেল। চাকরকে ডাকল। একজন জল তুলে কুন্দন নাইল। স্নান করবার আগে সে জালের জামাটি শরীর থেকে নামায়। যশোদা সেটা

দেখল। শিশুর মতো চোখ চক্‌চক্ করতে লাগল তার। কুন্দন হাসে। স্নান করে। গা মোছে, একটি পরিষ্কার কাপড় ও চাদর পরে ঘরে আসে।

বাবুলাল বসে আছে।

সামনে শাদা পাথরের থালা এবং বিবিধ ভোজ্য। কুন্দনকে দেখে সে ভ্রূকুটি করে। বলে, রাত হয়নি?'

কুন্দন ঘরে যায়।

ওর মা বসে আছে। রুপোর থালা। বিবিধ মিষ্টান্ন। কুন্দন যশোদার সামনে থালাটি তুলে ধরে, বিনা প্রতিবাদে যশোদা একটি কালাকন্দ তুলে নিল। মা যেন খুব পরিশ্রান্ত। কান্নায় স্ফীত চোখ। মুখে কাপড়। যশোদা বলল, 'মা, আপনি মাঝে মাঝে বড় ভাইকে কাছে ডাকবেন তো?'

মা একটি নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'রেবতী কোথায়?'

দেখা গেল রেবতী ঘুমিয়ে পড়েছে। যশোদা একমনে খাচ্ছে, কুন্দনের কাছ থেকে সে আরো ফল এবং মিষ্টি নেয়। ঘুম-ঘুম চোখে খেতে থাকে। কুন্দনের সহসা মনে হয় ওরা দু'বোন যেন নেহাত শিশু এবং এ যেন ওদের খেলাঘরের বিয়ে।

সে মাকে বলল, 'যাও। তুমি বিশ্রাম কর গে! রাত তো আর নেই।'

সে বাবুলালের কাছে গিয়ে বসে এবং আগামী কালের উৎসবের হিসেব-নিকেশ করে। সকালবেলা আবার অনেক কাজকর্ম আছে। বাবুলাল বলল, 'আমি থাকব। আমার লোক সঙ্গে যাবে। জৌনপুর যাবে, ফৈজাবাদ যাবে। আমি এখানে না থাকলে ওরা আবার আসবে। ঐ গণেশীপ্রসাদটাকে দেখতে পারি না আমি। ওর বাপ ছিল রাগী, গোঁয়ার। এর রক্ত সাপের মতো ঠাণ্ডা।'

তারপর দুজনেই খোলা উঠোনে চারপাই পেতে শুয়ে পড়ে।

॥ আট ॥

কুন্দনের পঁচিশ বছর বয়সে ওর ঠাকুর্দা মরল।

তার আগেই গোপালের বিয়ে হয়েছে। বাবুলাল নিজে খোঁজ ক'রে খবর আনে। বলে, 'এ মেয়েটা শান্ত, ঠাণ্ডা। এ মেয়েটার সঙ্গে গোপালকে মানাবে। কুন্দনের জন্যে এমন একটা মেয়ে চাই যে ওকে শায়েস্তা করবে। তেজী মেয়ে, ভাল মেয়ে।' কুন্দন সে কথা শুনে হাসে।

বলে, 'আপনি বুঝি মরতে চান না? আপনার কি ইচ্ছে, গুণ্ডার ব্যাটা গুণ্ডা হোক আর আপনি অমর হয়ে থাকুন? লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে ঐ ছেলেটার বাপ কুন্দন, বাবুলালের নাতি!'

বাবুলাল দুঃখ পায়। বলে, 'তবে কি তুই একলা থাকবি?'

'না না, বিয়ে আমি করব না। যাকে বিয়ে করব সে ভাববে আমাকে সে ভালবাসতে বাধ্য, তখনি তার মনে ঘেন্না আসবে।'

'তবে কি করবি?'

'কিছুই করব না। একা থাকব।'

গোপালের বিয়ে হলো। আবার ধুমধাম। বাজী পুড়লো, হাতির পিঠে হাওদা চড়ল। হাতি ভাড়া করা হলো রাজবাড়ী থেকে। যশোদা বিয়েতে এল।

আরো মোটাসোটা হয়েছে। কোলে একটি ছেলে। কুন্দনকে এবার সে 'আপনি' বলল বলল, 'আপনি এবার বিয়ে করুন।'

রেবতীকে ওরা আসতে দেয়নি। যশোদাকেও আর আসতে দেয়নি। যশোদা এর কিছুদি বাদে আর একটি সন্তান হতে গিয়ে মারা যায়। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে কুন্দন দুঃখ পেয়েছিল সম্ভবত পরিবারের মধ্যে তার ঐ একটাই দাঁড়াবার জায়গা ছিল।

নাতির বিয়ের ধুমধামটার ধাক্কা বাবুলাল সামলাতে পারল না। আবার সে অসু হলো।

এবার কোন জ্বর-জ্বালা নয়, একদিন সে আর উঠতে পারল না। বলল, 'মাথা টে যাচ্ছে।'

আবার ওপরের ঘরে বাতি জ্বলল। আবার পালকি চড়ে কুন্দনের ঠাকুমা এল। এবার সবা কুন্দনকে জিজ্ঞাসা করছে কি করতে হবে, কোন্ বৈদ্যকে ডাকতে হবে।

বাবুলাল বলল, 'কোন শালা বৈদ্য এ ঘরে ঢুকবে না।'

কুন্দনের ঠাকুমা আবার একটি শাদা ষাঁড়, একজন পুরোহিতের সন্ধানে ব্যস্ত হলে বাবুলাল বলল, 'যার ইচ্ছে হয় ষাঁড়ের ল্যাজ ধরে স্বর্গে যাক। আমার কাছে কুন্দন বসুক কুন্দনের সঙ্গে কথা আছে।'

সবাই বেরিয়ে গেল।

বাবুলাল বলল, 'তোকে এতবার বললাম তবু আমাকে তুই মারলি না, তুই মারলে আমি স্বর্গে যেতাম।'

মৃত্যুশয্যায় এ কথা কেন? কুন্দনের মনে হলো সে যেন এতদিনে বুঝতে পারছে কথা নিছক ঠাট্টা নয়। বাবুলাল বলল, 'কুন্দন, কোথায় কি রেখে গেলাম সব তুই জানিস। যা জানি না তা তোকে বলতে চাই। কাছে আয়।'

কুন্দনকে কাছে ডাকল।

বৃদ্ধ কুঞ্চিত মুখ, ঘোলাটে ও ভীষণ চাহনি। মুখে কি তীব্র দুর্গন্ধ। বাবুলাল বলল, 'শো আমার মনে হয় আমি মরলে তুই দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবি। ফেলিস্ না। আমি চাই আমি মরলে তুই দু'বেলা আমায় গালি দিস। কেন জানিস? অন্ধ রাগে, অন্ধ জেদে আমি তোর ওপ অবিচার করেছি। কি করেছি, তুই জানিস?'

'না।?' কুন্দনের গলা ভাবলেশহীন।

বাবুলাল হঠাৎ কাঁপতে লাগল। বিড়বিড় ক'রে বলতে থাকল, 'আমি সাহস পাচ্ছি না। (ভগবান আমি সাহস পাচ্ছি না।'

তার গলা আটকে গেল।

তখন কুন্দন তার কথা শুনল না। বৈদ্য আনল, বাবুলালের শরীর থেকে রক্তমোক্ষণ করা এমনকি বাঙালী কবিরাজ-ও আনল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। কাশীতে রটে গেল বাবুলা ম'রে যাচ্ছে। অনেক লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ভিখিরী বালক বালিকা, নৌকোর মাঝি সবাই নিচতলায় এসে ভিড় করল।

তবু যেন প্রাণটা বেরোতে চায় না। আস্তে আস্তে কথা বন্ধ হয়ে এল। আহার নেই, শরীর নেতিয়ে পড়ে আছে। বাবুলালের বউ এবার কান্নাকাটি করা ছেড়ে দিল। সে চুপ ক'রে বসে থাকে আর বালক গোপালকে ডাকে।

কুন্দনের ভাই গোপাল এল। বাবুলালের অন্যান্য বউ দুটি এল। মানুষজনে গিসগিস করছে। পা রাখার জায়গা নেই। সবাই বলে 'কুন্দনের মা এল না কেন?' বাবুলালের বড় দুই বউ তাকে আনতে গেল।

সে এল।

মা-র সে চেহারা কুন্দনের চিরদিন মনে থাকবে। রুক্ষ চুল। বুকের কাছে দু'হাতে কি যেন ধরে আছে। ওপরে এসে সকলকে বেরিয়ে যেতে বলল। কুন্দনকে বলল, 'তোমার ঠাকুর্দা সহজে জীবন ছাড়বেন না, দাঁড়াও, আমি ওঁকে একটা কথা শুধোব।'

বাবুলালের সামনে ওর ঘোমটা খোলার কথা নয়। তবু সে ঝুঁকে পড়ল। বলল, 'পিতাজী, এটা চিনতে পারেন?'

একটি জামা।

প্রমাণ মাপের পুরুষের জামা। ভেতরে পরবার বেনিয়ান। রক্তের দাগ শুকিয়ে কালো। কর্পূর দিয়ে যত্ন ক'রে রাখা। বাবুলালের চোখ বিস্ফারিত।

গোঁ গোঁ ক'রে সে অস্ফুটে কি বলল।

কুন্দন তার মা-র হাত চেপে ধরল। বলল, 'সরে যাও। তুমি কি মানুষ নও?

ওর মা হাতটা ছাড়িয়ে নিল। রুক্ষ চুলের খোঁপা বাঁধল। বলল, 'এটা তোর বাবার জামা। কুড়ি বছর ধ'রে রেখে দিয়েছি। আজ তোকে দেখালাম। তোর বাবাকে তোর ঠাকুর্দা নিজে হাতে খুন করে। সে খুন দেখেছিল আমার দাদা নহবৎলাল। একদিন সে আমায় সে কথা বলতে আসে। তোর ঠাকুর্দা নহবৎলালকে চিনতে পারে। তাকেও খুন করায়। যাক এখন আমি শান্তি পেলাম। আমাকে বিধবা করেছে, তোকে আমার কাছ থেকে পর ক'রে নিয়েছে, ওর ওপর আমার প্রতিশোধ নেওয়া হলো।'

কুন্দন কানে হাত চাপা দিল। কুন্দন বুকে হাত রাখল। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে বলল, 'আমায় এ কথা বললে কেন?'

'কেন, কষ্ট হচ্ছে?'

'না বললে কি হতো মা? এখনো যে ওর সব পারলৌকিক কাজ আমাকেই করতে হবে। ভগবান, আমাকে এ জ্বালা কেন দিলে?'

'কুন্দন, তুই আমার কথা শোন।'

'হা ভগবান, পরামর্শ নেব এমন একটা মানুষও নেই রে!'

'কুন্দন, আমি আছি।'

'না না। তুমি গোপালের মা।'

'তোর-ও আমি মা রে!'

'তা হ'লে কি এমন ক'রে সরে থাক? ঠাকুর্দাকে ঘেন্না করতে করতে আমাকেও ঘেন্না করেছ। আমায় আর তুমি কাছে টানতে পারবে না।'

কুন্দন নিজেকে সামলে নিল।

সেদিনই বাবুলাল মারা গেল। মণিকর্ণিকা ঘাটে চন্দনকাঠের চিতায় বাবুলালের দেহটি তুলে দিয়ে কুন্দনের মনে হলো সে যেন এখনি জন্মাল। তার অতীতটিকে ঐ চিতায় তুলে দিয়েছে ভবিষ্যৎ কেমন তা সে জানে না।

কুন্দন বাবুলালের টাকা-পয়সা নিয়ে ব্যবসায়ে লাগায়। সে কলকাতায় একটি মসলার ব্যবসা খরিদ করল। কলকাতায় বড় বাড়ী তৈরী হলো। গোপালকে সেখানে পাঠান হলো। এখন হঠাৎ তার আত্মীয় এবং শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা খুব বেড়ে গেল। নানা সম্পর্ক, নিকট এবং দূর কাকীমা, জ্যেঠিমা, ভাই, ভাই-পো, বোন।

কুন্দন তাদের কলকাতা পাঠাল।

তার ঠাকুমা হলেন অন্দরমহলের কর্ত্রী, এবং খুশীও হলেন। কুন্দনের মা হঠাৎ যেন পরাস্ত হয়ে পড়ে। কুন্দন বাড়ীর কর্তা, সে কারবারে লেগেছে, এখন আর কিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে?

কুন্দন গোপালকে বলে দিল, 'কাউকে বিশ্বাস ক'রো না। আবার মনে আঘাতও দিও না আত্মীয়স্বজনের ছেলেদের সকলকেই কাজে লাগনো হলো। সবাই তনখা পায়, কাজ করে কুন্দনকে সবাই ভয় পায়, কেউই তার সঙ্গে সাহস ক'রে কথা কয় না।

কুন্দন নিজে কাশীতে রইল।

কাশী ছেড়ে দিতে মন চায় না। কখনো যায় গাজিপুর। কখনো আসে কাশী।

এই সময়ে সে সুখের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পয়সা দিয়ে যা কেনা যায় তাই থাকে। সে অতএব সুখ কিনতে চেষ্টা করে। তাকে ইয়ারবন্ধুরা বলে, 'কুন্দন, দূর দূর শহর থেকে বাবুরা আসে এখানে স্ফূর্তি করতে। তুমি কিছুই করলে না?'

কুন্দন কয়েকদিন এর-তার আসরে যায়। বন্ধুরা বলে, 'কুন্দন, মেয়েদের দিকে চাও না কেন? ওরা তো তোমাকে সেবা করতেই চায়।'

কুন্দন বলে, 'না। আমি পুরুষমানুষ। আমার ঘেন্না করে। পরের এঁটো আমি খাই না।'

সেই সময় একদিন, সে গঙ্গার ঘাটে বসে বাতাস খাচ্ছে এমন কালে একটি বজরা থেকে সক্রন্দন আর্তনাদ ভেসে এল। একটি মেয়ে চেঁচাচ্ছে। কুন্দন ফিরে চায়নি।

কিন্তু কান্নাটা আবার তীব্র হয়ে ওঠে। যেন কুন্দনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। কুন্দন তার মাঝিদের ডাকে। বলে, 'দেখে আয়।' মাঝিরা তাকে ডাকে। সে একটি ছোট নৌকো নিয়ে যায়।

একটি সুসজ্জিত বজরা। তাতে বসে আছে একটি মেয়ে। সোনালী চুল, কটা চোখ ফর্সা রঙ, হাতে হেনা রঙ, মাথায় জরির টুপি এবং মুসলিম পোশাক। মেয়েটি তাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। কুন্দন দেখল দুটি উলকিদার তার পায়ে উলকি পরাচ্ছে। সে চলে এল।

ক'দিন বাদে একদিন তার বাড়ীতে দারুণ হৈচৈ। চাকররা অবাক হয়ে ছুটে এল তার কাছে বলল, 'জেরিনা বিবি এসেছে। তাকে ডাকছে।'

কুন্দন ভ্রূকুঞ্চন ক'রে বলল, 'ওপরে নিয়ে আয়।' সে বাবুলালের মাঝিদের ডেকেছিল বিষয়কর্ম নিয়ে কথা কইছিল।

জেরিনা এল। কুন্দন দেখল এ সেই মেয়েটি এবং আজও সে কাঁদছে। মেয়েটি বলল, 'আমাকে বাঁচান। আপনি দয়ালু, ধর্মাবতার।'

কুন্দন মাঝিদের বসতে বলে এবং পাশের ঘরে উঠে আসে। মেয়েটি বলে, 'আমি জেরিনা।'

'বলুন।'

মেয়েটি বলে, 'সেদিন আপনাকে চিনতে পারিনি। যখনই নাম শুনেছি, তখনই এসেছি। দেখুন গণেশী আমায় কিনতে চায়।'

'কিনতে চায়?'

মেয়েটি হাতের চুড়িগুলো নাড়ল এবং ঠিনঠিন ক'রে বাজাল। বলল, 'আমার মা-কে ভাইকে অনেক টাকা দিয়েছে। আমাকে নাকি ও বিয়ে করবে, মুসলমান হবে। আপনি আমায় বাঁচান।'

'আমি কি করব?'

'দেখুন ও হয় পাগল নয় শয়তান। গত বছর একটি মেয়েকে এমনি ক'রেই নিয়ে যায় ও বিয়ে করবে বলে। সে মেয়েটি জলের ভিস্তির সঙ্গে কথা কয়েছিল বলে হঠাৎ তাকে এমনভাবে মারে যে বেকায়দায় ঘা লেগে মেয়েটা মরেই গেল। এখানে হতভাগা মেয়েগুলো ওর ভয়ে কাঁপে।'

কুন্দন বলল, 'এত ছোট ব্যাপারে আমি মাথা গলাতে চাই না।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি গণেশীকে ভয় পাবেন না।'

'ভয়? কিসের ভয়?'

'আপনি যদি ওকে ভয় না করবেন তো আমায় বাঁচবেন না কেন?'

'তুমি আমার ঐ বাড়ীতে গিয়ে থাক। পাঠিয়ে দিচ্ছি। গণেশীর সাধ্যও হবে না তোমার গায়ে হাত দেয়।'

'আমি আপনার পায়ে আশ্রয় চাই।'

'ও। কিন্তু আমার পক্ষে তোমাকে পায়ে রাখা সম্ভব নয়। আসলে তুমি মাথায় থাকতে চাইবে। মাপ কর, আমি তা পারব না। আর একটা কথা গণেশীলাল আমার আত্মীয়। আমার এক মামার ছেলে।'

জেরিনা ঠোঁটটি কামড়ে কি ভাবল। উঠল। জামার ভেতর থেকে একটি ছোরা বের ক'রে রাখল। বলল, 'আমার হুকুম আমি তামিল করতে পারলাম না।'

'কি হুকুম?'

'আপনাকে মারবার হুকুম ছিল।'

'তার মানে?'

জেরিনা বলল, 'মিথ্যে কথা বলব না। নৌকোয় ব'সে আপনাকে ডেকে নেবার কথা ছিল। আপনাকে মারবার হুকুম ছিল।'

'আমায় মারলে তুমি এ বাড়ী থেকে বেরোতে কি ক'রে?'

'এ ছোরা দিয়ে একটু আঁচড় দিতাম শুধু। তারপর বিষের জ্বালায় মরতেন। জেরিনাকে যখন সন্দেহ হতো ততক্ষণে জেরিনা অনেক দূরে।'

'এখন কি করবে?'

'ফিরে যাব।'

'তোমায় কিছু বলবে না?'

'জানি না।'

কুন্দন একটু ভাল ক'রে চেয়ে দেখল। তারপর বলল, 'তুমি যাও জেরিনা। তোমার সঙ্গে আমার লোক যাবে। সে তোমার বাড়ী পাহারা দেবে। আমি একটু খোঁজ-খবর নিই। বন্দোবস্ত করি, তারপর তোমায় পাঠিয়ে দেব। কিন্তু যাবে কোথায়?'

'ফৈজাবাদ।'

'ফৈজাবাদ, ফৈজাবাদ!'

যশোদার বিয়ে হয়েছিল ওখানে। স্বামীটা কি অমানুষ। যশোদা মারা যেতে না যেতে আবার বিয়ে করল।

জেরিনা চেয়ে আছে। দুটি চোখে মিনতি। ফর্সা রঙ, চুলে বুঝি সোনালী রঙ লাগানো। হাতের গড়ন বেশ মোমের পুতুলের মতো।

সহসা আবেগভরে কুন্দন ওর হাতটা ছোঁয়। নরম, কি নরম! তারপর বলে, 'যাও, তুমি যাও। একটি মুসলমানী মেয়েকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওকে পাশে রেখ। আমার বিশ্বাসী লোক তোমায় বাঁচাতে পারবে।'

জেরিনা নেমে গেল। কুন্দন একটু ভাবল এবং জেরিনার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করল।

ঠিক তার দু'দিন বাদে কুন্দনকে নেমন্তন্ন করতে এল গণেশীলাল। গঙ্গার বুকে বজরা নিয়ে জলসা হবে। কুন্দন যেন যায়।

কুন্দন তার সবগুলো নৌকোকে খবর দেয়। কাছাকাছি থাকতে হবে।

উৎসবের দিন সন্ধ্যেবেলা কুন্দন স্নান সেরে ধোপদোস্ত ধুতি পাঞ্জাবি পরল। সে একা নয়, তার আরো কয়েকটি সঙ্গী আছে। তারা সকলেই স্নান করেছে এবং প্রসাধন করেছে।

হাতে বেলফুলের মালা, পকেটে টাকা, কোমরে বিছুয়া—ওরা সাতজন সন্ধ্যের সময় বজরাটিতে পৌঁছল। কুন্দন দেখে নিল তার নৌকোগুলো কোথায় আছে।

জেরিনা বসেছিল। কুন্দন তাকে দেখে যেন চেনে না এমনি ভান করল এবং একপাশে বসল।

জেরিনা প্রথমেই ধরল একটি ভজন। তা-ও আবার মাঝখান থেকে। সে কানে হাত চাপা দিয়ে গেয়ে উঠল 'বিষ কা প্যালা রাণাজীনে ভেজা পিবত মীরা হাসি রে'।

গানটি শুনে কুন্দন অবাক।

এদিকে সিদ্ধির শরবত এসেছে এবং গণেশী তাকে অনুরোধ করছে। কুন্দন ও তার সঙ্গী শরবতটি নিল। পাশে রাখল।

হঠাৎ বাইরে 'হর হর আহা আহা রাম রাম' ইত্যাদি চেঁচামেচি শোনা গেল মাঝি-মাল্লাদের। একটি বড় ভাও নৌকো ধাক্কা দিয়েছে ওদিকে অন্য নৌকোকে। আর নৌকোয় নৌকোয় ধাক্

লেগে এ বজরাতেও ধাক্কা লেগেছে। সে ধাক্কায় জেরিনার গানটি থেমে গেল এবং শরবতের গেলাস উলটে যায়।

বড় নৌকো সরে গেল। গণেশী একবার গালাগালি দিল তার মাঝিদের। জেরিনাকে বলল, 'ভাল গান গাও!' সে আবার শরবত আনতে বলল। শরবত এল।

'নাও, গেলাস নাও! কুন্দন ভাই!'

কুন্দন চেয়ে দেখল একটি নৌকো বজরার গায়ে এসে লেগেছে। তার মনে হলো এ বোধ য় বুড়ো ভীমের নৌকো। ভীম তাদের অনেক পুরনো মাল্লা। ভীমের মতো দড় এবং দক্ষ াঝি কম আছে। কথা ছিল ভীম আসবে এবং সে নৌকোয় জেরিনাকে তুলে দিয়ে কুন্দনরা ারামারি করবে।

কুন্দন বাইরের দিকে চেয়ে আছে দেখে গণেশী বলে, 'কুন্দন, কই শরবতের গেলাসে হাত দিচ্ছ না কেন?'

না। ভীম নয়। ও বোধ হয় গণেশীর লোক। কিন্তু কুন্দনের মাথায় রোখ চেপেছে। না াকুক ভীমের নৌকো, সে মারামারি করবে। গণেশীর মাঝি-মাল্লাদের ফেলে দেবে জলে। তারপর এই বজরা নিয়েই পাড়ের দিকে যাবে। জেরিনাকে ফৈজাবাদে পাঠিয়ে দেবে। নিরাপদ আশ্রয়ে।

সে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'গণেশী, তুমি কি ও শরবতে বিষ দিয়েছ?'

গণেশী ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মতো গর্জন করল এবং লাফিয়ে উঠল। তার সঙ্গে দশটি লোক। ন্দনের সঙ্গে ছ'টি। নিমেষে আঠারোটি বিছুয়া ঝলকে উঠল।

ঠিক এমন সময়ে ভীমের গলা শোনা গেল। সিদ্ধি বা গাঁজার প্রসাদে বিজড়িত গলা। ভীম গান গাইছে 'হা রে রামভরোসেকা ক্ষেতকা মকাই কৌন্ সে চুরি কিয়া রে?'

জেরিনার মাথার পেছনের জানালা দিয়ে ভীম উঁকি মারল। শাদা মাথা, লাল চোখ, কালো এবং লম্বা। বজরার ভেতরে সবাই হতবাক্। ভীম জিব দিয়ে চ্চু চ্চু ক'রে খেদ সূচক শব্দ করল এবং বলল, 'কৌন?'

কুন্দন হা হা ক'রে হাসল। জেরিনাকে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে বলল। ভীমকে বলল, লেড়কীর জিম্মাদার তুই!'

জেরিনাকে আব বলতে হলো না। 'খুদা বাচাইয়ে' ব'লে সে নিমেষে লাফ মারল। তাকে পালাবার সুযোগ ক'রে দিতে গিয়ে কুন্দন হাতে চোট খেল।

তারপর মারামারি হৈচৈ। এরই মধ্যে হঠাৎ যেন সব আঁধার হয়ে গেল। সেই বিরাট, প্রতিকায় ভাও নৌকোটি নিঃশব্দে যেন বজরাটার ওপর উঠে এল।

একটি সম্মিলিত চিৎকার। তারপরই সব চুপচাপ। ভাও নৌকোটি আছে, বজরাটি নেই। দারুণ হৈচৈ এবং চিৎকার। নৌকো থেকে নৌকোয় বিপদের সঙ্কেত ছড়িয়ে পড়ল। প্রায় সব নৌকোই কুন্দনের।

'সর্বনাশ হয়েছে, সর্বনাশ!' সবাই চেঁচাতে লাগল এবং দাঁড়ের বাড়ি মেরে এ নৌকো ও নৌকোকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। জলে ঝপ ঝপ ক'রে দাঁড় পড়ছে।

'আরে, তোরা দাঁড় মেরে কি মালিকের মাথা ফাটাবি না কি?' এ ওকে সাবধান করল। তারপর সকলের গলা ছাপিয়ে ভীমের গলা শোনা যায়, 'আরে চিরঞ্জীকে বেটা, বালুলালকে নাতি তুম কিধার হো!' মাল্লারাও চেঁচাল ধুয়া ধ'রে 'আরে কিধার হো!'

কুন্দনের হাতে, পায়ে, কাঁধে বিছুয়ার আঘাত। জলে প'ড়ে সে মাথা তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার প্রভুভক্ত মাল্লারা দাঁড় মারছে ঝপাঝপ। মাথায় লাগলেই সর্বনাশ।

সে মাথা ডোবাল।

কিন্তু দম রাখা যায় না। শরীর অবসন্ন। চোখের সামনে আঁধার। কুন্দন অনেক দূর গিয়ে একবার মাথা তুলল। আঃ বাতাস! বুক ভরে নিশ্বাস নিল। সে যেন শুনতে পেল জলের ওপর দিয়ে ভীমের গলার স্বর ভেসে আসছে 'চিরঞ্জীকে বেটা তুম কিধার হো!'

সে মনে মনে বলল, 'এতদিনে ব্যাটার মনে পড়েছে আমার বাপের নাম!'

তারপরই চোখ বুজে এল। শরীর এলিয়ে পড়ল।

কুন্দনের জ্ঞান হলো এক সময়ে।

সে চেয়ে দেখল ওপরদিকে একটি বটগাছের পাতা দেখা যাচ্ছে। তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে একটি কিশোর। সে সুমিষ্ট সুরেলা কণ্ঠে ডেকে চলেছে, 'বাবুজী, বাবুজী!'

কুন্দন লাল টকটকে চোখ মেলল। বলল, 'তুমি কে?'

শ্যামল রঙ, হাসি হাসি মুখ, ভাসা ভাসা চোখ এবং কপালের ওপর চুলের থোকা ঝুলছে। কিশোরটি হাসল। খুব কাছে ওর মুখ তাই কুন্দন দেখতে পায় হাসির ভঙ্গীটি বড় সুকুমার। ঠোঁটের কোণটা একটু বেঁকে যায়, চোখের পাতা থরথর ক'রে কাঁপে।

'আমি বজরঙ্গী।'

'বজরঙ্গী?'

'হ্যাঁ বাবুজী, আমি বজরঙ্গী।'

'বেশ।' কুন্দন আবার চোখ বুজল।

॥ নয় ॥

ক'দিন ধরে এই হাঙ্গামার কথা মুখে মুখে ফিরল। কুন্দনকে পাওয়া যাচ্ছে না, গণেশী গুরুতর আহত। এই সুযোগে জেরিনা কাশী ছেড়ে পালাল।

গণেশীর খুব আঘাত লাগে। দাঁড়ের বাড়ি খেয়ে মাথা ফেটে যায়। তাকে বেশ ক'দিন পড়ে থাকতে হলো বিছানায়।

বজরঙ্গী মালিকদের চাকর। আদি কেশব মন্দিরের কাছে ওরা থাকে। যাত্রীরা মাঝে মাঝে নৌকো চড়ে বেড়াতে চায়। বজরঙ্গী দাঁড় বায় আর যাত্রীদের বলে উচ্চস্বরে, 'এটি হরিশঘাট. ওটি কালুডোমের বাড়ী।'

নৌকোগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই কুন্দনের। বজরঙ্গী তা জানে না। সে শুনেছে তাদের মালিকরা শহরে থাকে। বজরঙ্গীর সব কারবার নাওদারদের সঙ্গে। তারাই তার মালিক।

বজরঙ্গী তাকে প্রথম দিন ছাড়ে নি। নৌকোর ধাক্কা কুন্দনকে জলে ফেলে দিয়েছিল। মাথায় চোট লেগেছিল।

বজরঙ্গী নৌকো-মালিক ভাওয়াইদের চাকর। বজরঙ্গী কেমন ক'রে কুন্দনকে খুঁজে পেল, সে-ও আশ্চর্য।

কাশীর মণিকর্ণিকা ও হরিশঘাটে দাহ করলে মৃতের অনন্ত স্বর্গলাভ হবে, এ বিশ্বাস হিন্দুমাত্রেই রাখে। তাই আশপাশ থেকে, গ্রাম থেকে, মানুষ এখানে মৃতজনকে আনে। আর যাদের পয়সা আছে, সেইসব ধনী, ঠাকুর, চৌধুরী, তালুকদাররা, তিন-চারদিনের রাস্তা বয়ে বাজনা বাজিয়ে লাল সিল্কের কাপড় মুড়িয়ে রাম নাম গান করতে করতে আনে শবদেহ।

শ্মশানঘাটে তাই মৃতদের ভিড়।

তবে সমস্ত শবদেহই যে দাহ অন্তে ছাই হয়, তা সত্যি নয়। অনেক সময়ই দাহর কাজ আধখানা, তিনভাগ কাজ শেষ হতে না হতেই চিতাসুদ্ধ ভেঙে হুড়মুড় ক'রে জলে ফেলে দেওয়া হয়। জোয়ারের টানে ভেসে চলে সেই সব দেহ। ভাঁটার সময় দেখা যায়, পাড়ে পাড়ে লেগে আছে। আদি কেশবের মন্দিরের পরে নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেইখানে জমতে থাকে দেহগুলি। শকুনি সেখানে ভিড় করে।

কুন্দন ভাসতে ভাসতে সেই চড়াতেই এসে ঠেকেছিল। বজরঙ্গী যাত্রী নিয়ে দর্শন করাতে এসেছিল সেখানে। যাত্রীরা দর্শন করছে। ভাওয়াই তাদের সঙ্গে আছে। সে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ, মৃতদেহের পাশে একটা শরীরকে এপাশে ওপাশে নড়তে দেখে, কাতরোক্তি করতে শুনে সে আকৃষ্ট হয়।

তাতেই কুন্দনের প্রাণ বেঁচে গেল।

বজরঙ্গী ওকে নিজের ঘরে রাখল। ও ঘরে থাকে না। একটি বড়, জীর্ণ নৌকো পাড়ের উপর আছে। সেখানেই বজরঙ্গীর ঘর। কুন্দনের গায়ের আঘাতগুলো দেখে ওর কি ভাবনা!

কুন্দনের খুব জ্বর। আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কোথায় এসেছে, কার কাছে এসেছে বুঝতে পারে না।

বজরঙ্গী বড় ভাবনায় পড়ল। একবার ভাবল চলে যায় শহরে। লোকজন ডেকে আনে। কিন্তু তার হাত-পা বাঁধা। নাওদাররা কাল গেছে ওদিকে। এখনো আসেনি।

কুন্দনের জ্ঞান হলো পরদিন।

বজরঙ্গীকে সে দেখছিল মন দিয়ে। বজরঙ্গী তিনটি ইঁটের উনোনে দুধ জ্বাল দিচ্ছিল। কুন্দনকে তাকাতে দেখে সে হাসে। কাছে এসে বলে, 'ওঠ। দুধ খাও। গায়ে জোর পাবে।'

কুন্দন উঠল।

জামাকাপড় নোংরা, রক্তের দাগ শুকিয়ে আছে। নৌকোর ওপর বসে আছে সে, নিচে ছাগল চরছে। সামনে গঙ্গা, একটি বটগাছের ঝুরি নেমেছে।

বজরঙ্গী তার কাছে এসে বসে। বলে, 'দুধ খাও। তোমায় গরম জিলেপী এনে দেব। জান, ওদিককার দোকানটায় কি চমৎকার জিলেপী ভাজে।'

'বজরঙ্গী, তুই কি নাওদারদের ছেলে?'

'না।'

'তুই কে?'

'জানি না। শুনেছি আমি যখন খুব ছোট, নাওদার আমায় তুলে আনে।'

'কোথা থেকে?'

'গঙ্গা থেকে। আমার বাবা, মা ঠাকুর্দা সবাই নাকি দক্ষিণ থেকে তীর্থস্নান করতে এসেছিল। চন্দ্রগ্রহণের দিন স্নান করতে গিয়ে তাদের নৌকো ডুবে যায়।'

'কি বললি?'

'কেন? তুমি এমনধারা করছ কেন?'

কুন্দন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। বলে, 'কতদিন আগে?'

'হিসেব ক'রে নাও। আমার বয়স পনেরো হলো। তেরো বছর আগে যে যোগস্নানের দিন পড়েছিল সেদিন আমাকে জল থেকে তুলে আনে নাওদার।'

'কেমন ক'রে জানলি তুই সেই বাপ মা-র ছেলে?'

'এই যে, আমার গলায় একটি কবচ আছে। সেটা দেখিয়ে নাওদার বলে এটা আমার গলায় ছিল। সে কবচ না কি মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের পুরোহিতের দেওয়া। জান, আমার খুব ইচ্ছে করে একদিন চলে যাই সে দেশে। আমার ঘর খুঁজি, ঠিকানা খুঁজে বের করি।'

'তোকে কোন্ নাওদার আনে রে?'

'ভীম।'

কুন্দন চুপ। তার হাত থরথর ক'রে কাঁপছে। হাতটি সে বজরঙ্গীর মুখের পরে বুলোয়। তেরো বছর আগে! তেরো বছর বাদে ভগবান তাকে এক বজরঙ্গীর কোলে তুলে দিল।

'বজরঙ্গী! তোর বাপ-মা এখানে কোথায় ছিল? কার সঙ্গে নাইতে এসেছিল ?'

'বাবুলাল, বাবুলাল!' বজরঙ্গী একটু হাসল। মুখে হাসি মেখে কুন্দনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। বলল, 'বাবুলালকে আমি দেখেছি। জান, ভগবানের মতো চেহারা তার। ধপধপে রঙ, গঙ্গার ঘাটে বসে থাকত।'

'কেমন ক'রে দেখলি?'

'বাঃ, আমি যে নৌকো ক'রে যাত্রীদের নিয়ে বেড়াই। অসি ঘাট থেকে আদি কেশব। আমি ওদের সঙ্গে যেতে যেতে কতদিন দেখেছি বাবুলালকে।'

কুন্দন ওকে ডাকল। বলল, 'আয়, কাছে আয়।'

বজরঙ্গীকে কাছে টানল।

'তোমার হাত কাঁপছে, কেন কাঁপছে?'

'ও কিছু না।'

'জান, নাওদার বলে আমি গঙ্গার ছেলে। মা-বাবার কথা ভাবতে নেই।'

'তুই ভাবিস বুঝি?'

'না. তাদের দেখিনি, জানি না। কে জানে মা-র ভালবাসা কেমন।

ভাবিস না। আমার মা আছে। মা আমার ভালবাসে না।'

তোমার কষ্ট হয়?'

কুন্দন হাসল। হাসতে গিয়ে বুকের মধ্যে ব্যথা করছে। এ কেমন এক অজানা অনুভূতি। ওর দিকে যেন কুন্দনের সকল ভালবাসা গলে গলে পড়ছে। ভালবাসা! ভালবাসা কেমন তা

কে কুন্দন জানে? কাউকে বিশ্বাস করবি না কুন্দন। না। ঠাকুর্দার সে নির্দেশ সে মেনেছে। কিন্তু আজ যেন এই নির্জন গঙ্গার সামনে এই বিরাট আকাশের নিচে বসে ওকে বিশ্বাস করতে প্রাণ চাইছে।

'বজরঙ্গী, তোকে নাওদার ভালবাসে?'

'আমায় ভালবাসে? হবেও বা।'

বজরঙ্গীর মুখটি করুণ হয়ে গেল। সে যেন কি ভাবল। অমন করে ও চায় কেন? ওর দুটি চোখে যেন আকাশের ছায়া। ওর কথায় যেন গঙ্গার জলের মতো পবিত্রতা, সরলতা। হবে না কেন?

'ওরা আমায় খেতে দেয় না। দেবে কোথা থেকে? ওরাও তো গরীব নাওদার। ওদের মালিক বোধহয় ওদের পয়সা দেয় না।'

'কি খাস তুই?'

'এখনই দেখবে। দাঁড়াও তোমার জিলেপী আনি।'

'পয়সা পাবি কোথায়?'

'আছে। একটি পয়সা আছে আমার।'

বজরঙ্গী ছুটে গেল। শালপাতার ঠোঙায় চারটি ছোট ছোট জিলেপী আনল।

'বজরঙ্গী তুইও খা।'

'না না, আমি তো ভাত খাব।'

বজরঙ্গী পেতলের থালায় তার ভাত ঢালল। ভাত, করলা সেদ্ধ, লবণ। খেতে খেতে সে হাসল। কুন্দনের বুকে যেন ওর হাসিটি কে আগুন দিয়ে দেগে দিল।

তারপর বজরঙ্গী বলল, 'তুমি শোও। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।'

'দে।'

একটি নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল কুন্দন। ওর কোলেই মাথা রাখা যাক। একটু পরে কুন্দন বলল, 'জানিস, তোর বাবা মা-র গল্প আমি বলতে পারি।'

'কেমন ক'রে জানবে?'

'শোন্ না। হয় তো তোর বাবা, তোর মা খুব ভাল লোক ছিল।'

'হবে।'

'তাই তুই-ও হয়েছিস।'

'তারপর?'

'ব্যস। গল্প ফুরিয়ে গেল।'

বজরঙ্গী খুব হাসল। কুন্দনও হাসল। দুজনে হাসছে, গল্প করছে, এমন সময় বজরঙ্গী বলে, 'ঐ যে নাওদাররা আসছে।'

'বজরঙ্গী আমার কাছে বস্।'

'ওরা যে বকবে।'

'কিছু বলবে না। তুই দেখ।'

ভীম এবং অন্যান্য নাওদাররা চোখ রগড়াল। তারপর ভীম ওর পা ধরল। বলল, 'মালিক!'

বজরঙ্গী অবাক্। সে এর দিকে চায়, ওর দিকে চায়। ভীম এবং নাওদাররা একসঙ্গে কথা

বলতে শুরু করে। কুন্দন মরে গেছে বলেই সবাই ধরে নিয়েছিল। ভীম বলে, 'বজরঙ্গী! তুই কাকে গুড়ের জিলেপী খাইয়েছিস তা জানিস?'

'ভীম, তুই বজরঙ্গীর কথা আমায় বলিসনি কেন?'

ভীম মাথা নিচু করল। তারপর বলল, 'মালিক, তুমি ওর সঙ্গে কথা বলছিলে?'

বজরঙ্গী ভয় পেয়েছে। সে অসহায়ভাবে তাকাল। কুন্দন হাসল। বলল, 'বজরঙ্গী, দেখছিস আমি তোর মালিকের মালিক।'

বজরঙ্গী কিছু বলল না।

বড় নৌকোয় বিছানা পাতা হলো। কুন্দন এবার বাড়ী যাবে।

সে বলল, 'বজরঙ্গী, নৌকোয় ওঠ!'

বজরঙ্গী নৌকোয় ওঠে। নৌকো ছেড়ে দেয়। কুন্দন বলে, 'এখানে আয়।'

ঠোঁটটা একটু ফুলিয়ে বজরঙ্গী কাছে এসে বসে। কুন্দন বলে, 'বল, তুই কি বকশিশ চাস?'

'কিছু না।'

'বল, কি তোর ভাল লাগে বল!'

ভীম বলে, 'ওকে পেশোয়া-প্রাসাদে চাকর ক'রে দাও। নহবৎখানার চাকর।'

'কেন?'

'ওকে শুধোও।'

'বজরঙ্গী ভীম কি বলছে?'

'বজরঙ্গী, কেঁদে ফেলে। বলে, 'আমি সানাই শুনতে যাই লুকিয়ে। পেশোয়ার প্রাসাদে সকালে সানাই বাজে তাই শুনি।

'আর কি?'

'আর আমার একটা সারেঙ্গী আছে। নন্দলালজীর কাছে গিয়ে বলেছিলাম আমি তোমার চাকর হব। আমায় সারেঙ্গী শেখাও।'

'কেন রে?'

'সানাই শুনতে ভালবাসি, সারেঙ্গীয়া হতে চাই তাই ওরা আমায় ঠাট্টা করে।

'তুই সারেঙ্গী শিখতে চাস?'

'না।'

'কেন?'

'কে শেখাবে?'

কুন্দন ভাবতে থাকে। নৌকো দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছয়। কুন্দন নামে। বজরঙ্গীকে বলে. 'আয়।'

কুন্দন ওর হাত ধ'রে নিয়ে চলে। বজরঙ্গী ভয় পেয়েছে। অবাকও হয়েছে।

কুন্দন বাড়িতে ঢোকে। ওপরে ওঠে। চাকররা ছুটে আসে। সেলাম করে। বজরঙ্গীর পানে চায়।

কুন্দন নিজের ঘরে ঢোকে। বলে, 'বজরঙ্গী, এই তোর ঘর।'

'মালিক!'

'এখানে থাকবি তুই। আমার সঙ্গে।'

'তুমি ঠাট্টা করছ।'

'ঠাট্টা করছি? কুন্দন ধমক দেয়। বলে, 'আমি ঠাট্টা করি? এখানে থাকবি তুই। নন্দলাল ɒাকে এখানে এসে সারেঙ্গী শেখাবে। আমি আর তুই থাকব। তুই আর আমি।'

বজরঙ্গী কেঁদে ফেলল। পরক্ষণেই হাসল। বলল, 'মালিক, মালিক, তুমি আমার মালিক। ɒামাকে আমি দেখেই চিনেছি।'

'চিনেছিস! আমাকে কি একপলকে চেনা যায় রে?'

'কেন যাবে না? সকালে উঠে গঙ্গার জলে একটি মালা ভেসে যেতে দেখলাম। কেন যেন ন হলো দিনটা বড় শুভ।'

'তাই বুঝি আমাকে খুঁজে পেলি?'

'তাই তো! তুমি হাসছ?'

বজরঙ্গী তার হাতটি দু'হাতে ধরল। নিজের মাথায় রাখল।

এমনি ক'রে বজরঙ্গী এল।

কুন্দনের সব মনে আছে। তাকে কেমন জামা কাপড় কিনে দিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে কেমন ɒড়াত। গঙ্গার বুকে দাঁড় বাইতে বাইতে বজরঙ্গী কেমন তাকে গল্প বলত।

বজরঙ্গী, বজরঙ্গী, বজরঙ্গী! একদিন, অতি শৈশবে সে তার গায়ে হাত বুলিয়েছিল। তার য়ের কোল থেকে কুন্দনের দিকে চেয়ে হাসছিল।

মনে করলে বুকটা ফেটে যায়। আর সে আসবে না। আর তার দিকে চেয়ে হাসবে না। লবে না, 'মালিক, তুমি ভাল হও। মালিক, তুমি লোককে অমন কষ্ট দিও না।'

দেয়নি। বজরঙ্গীকে পেয়েই কুন্দন যেন আশ্রয় পায়। কুন্দন আস্তে আস্তে গুণ্ডাবাজী ছেড়ে য়। কলকাতায় এল। একটির পর একটি ব্যবসা। বজরঙ্গী হয়তো সব জানত না।

সেই বজরঙ্গী আর নেই। বুকের নিচটা গুরুভার। দু'চোখে আঁধার। এখন আঁধার রাতে চোখ চয়ে জেগে থাকে কুন্দন। একবার সে আসুক। তাকে নিজের কাছে নিয়ে যাক।

তা হয় না। সে পূণ্যবান, সে নিষ্কলঙ্ক। তার দুটি চোখে আকাশের ছায়া। তার মনটি ঙ্গার মতো পবিত্র। দেবতাদের ছেলে যেন ক'দিন ধুলোখেলা ক'রে দেবতাদের ঘরে ফিরে গছে। একজনের বুক ভেঙে দিয়ে গেছে। যার পায়ে কাঁটা লাগলে বজরঙ্গী বুক পেতে দিতে ারত, তাকেই একলা ফেলে চলে গেছে। কেন এমন হলো?

॥ দশ ॥

শিরীন বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল। তবু শিরীনকেই ডেকে পাঠাল কুন্দন।

খিদিরপুরের বাড়ীতে যাবার জন্যে সে তৈরী হচ্ছে। এমন সময়ে মা এল। কুন্দনের মা।

'কুন্দন, তুই কি বেরোচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কথাটা শোন।'

'বল।'

'তুই তো জানিস কোন্ কথা?'

'মা, তুমি ভুলে যাচ্ছ তুমিই একদিন বলেছিলে আমাকে, বিয়ে করিস না।'

'কুন্দন, সে কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি আমি। তোর মন ভেঙে গেছে, তোর রাতে ঘুম হয় না। সে মেয়েটার চেয়ে অনেক সুন্দর বউ এনে দেব আমি।'

'কার চেয়ে?'

'লায়লী আশমান।'

'মা, আমি বিয়ে করব না।'

ওরে এমন একলা একলা কেউ থাকতে পারে না।'

'মা।' কুন্দনের চোখ লাল। গলা রুক্ষ। 'মা, আমি কারুকে ভালবাসতে পারব না। আমার বুকে ভালবাসা নেই।'

'তা কি হয় কুন্দন!'

'না না।' কুন্দন রুমাল নিল, রুমাল রাখল পকেটে, একটু পায়চারি করল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমরা এমন ক'রে আমায় কষ্ট দিচ্ছ কেন? তোমরা যে যা চেয়েছ তোমাদের তাই দিয়েছি। আমি কাউকে চাই না।'

'কুন্দন!'

'তুমি বুঝবে না। তুমি যাও।'

কুন্দন মাথার চুল টানল। তারপর হাসল। বলল, 'তুমি ভাব আমি একলা থাকি? না না। সে থাকে। আমার সঙ্গে থাকে। আমাকে দেখা দেয় না।'

'কুন্দন, আমি বলছি তুই স্বস্ত্যয়ন কর। তুই মঙ্গলকবচ পর। তোর ওপর ওর নজর লেগেছে।'

'কার?'

'লায়লী আশমানের।'

'হা ভগবান। লায়লী, লায়লী, লায়লী! কি জান তুমি তার সম্বন্ধে? কতটুকু জান? সে আমার কলজেটা মুচড়ে মুচড়ে মজা দেখত। এখনো দেখে। কিন্তু তার কথা আমি...'

কুন্দন নিজেকে সামলে নিল। বেরিয়ে গেল।

শিরীনকে হাত ধরে ওপরে আনল কুন্দন। শিরীন ঘরে ঢুকে ভুরু কুঁচকে বলল, 'ও আয়নাটা তুমি কোথায় পেলে কুন্দন?'

'কেন বল তো?'

'আয়নাটা কোথায় পেলে?'

'নিলাম থেকে। ওর মারা যাওয়ার খবর পেয়ে যখন এলাম তখন দেখি সব কিছু নিলামে তুলে দিয়েছে।'

'কে বল তো?'

'ওর কে সব আত্মীয়স্বজন এসেছিল যে।'

শিরীন আয়নাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরে বাতি জ্বলছে। কুন্দন মুখ নিচু ক'রে গেলাসে বরফের কুচি ঢালল এবং তার উপর মদের বোতলটি কাত করল। তারপরই সে চমকে উঠল।

শিরীন চীৎকার ক'রে আয়নার কাছ থেকে সরে এল। তার মুখ সাদা।

'কি হয়েছে শিরীন?'

'কুন্দন, ঐ আয়নাটা...'

'আয়নাটা? কি?'

শিরীন বাতিটি নিল। আয়নাটির কাছে গিয়ে সে দেখল। তারপর একটু হাসতে চেষ্টা করল। হাত বাড়াল। কুন্দন নীরবে গেলাসটি এগিয়ে দেয়। শিরীন ঢকঢক ক'রে গেলাসটি খালি করে। মুখ মুছে বলে, 'এমন ভুলও মানুষের হয়?'

'কি?' কুন্দনের হাত কাঁপছে।

'আমি আয়নাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঢাকনাটা তুলে যেমন চেয়েছি অমনি মনে হলো...'

'কি মনে হলো?'

'লায়লী যেন আমার দিকে চেয়ে আছে। সত্যি বলছি কুন্দন। দেখ, বলতে গিয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। লায়লী যেন আমার দিকে চেয়ে হাসল। আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি। হঠাৎ দেখি কিছু নেই। আয়নায় শুধু আমারই মুখ দেখা যাচ্ছে। আমি ভয় পেলাম।'

কুন্দন কিছু বলল না। চাকরকে ডাকল। চাকর এসে ঘরের সবগুলো বাতি জ্বালায়। সমস্ত ঘরটা ঝলমল করে। কুন্দন বলে, 'আলো আঁধারিতে এমন ভুল আমারও হয়েছে। ও কিছু না।'

'কিন্তু কুন্দন, এমন ক'রে তুমি একা যেন এ ঘরে এস না।'

'কেন শিরীন?'

'হঠাৎ ভয় পাবে। বলা যায় না......বলা যায় না, হয়তো ও এ ঘর ছেড়ে যেতে পারেনি।'

কুন্দন তাকিয়াতে হেলান দেয়। বলে, 'বসো।'

শিরীন বসে। কুন্দনের গলা ভারী, কণ্ঠস্বর উদাস। কুন্দন বলে, 'মরা মানুষকে এত ভয় কেন শিরীন?'

'চুপ চুপ! ওকথা বলে না।'

'কেন, ভয় কেন? ভয় আমি পাই না। বেঁচে থাকতে যে এত প্রিয় থাকে মরেছে বলেই তাকে ভয় করব? না।'

কুন্দনের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। চোখের নিচে কালি। ক্লান্ত চেহারা।

'ভয় আমি পাই না। আমার ইচ্ছে হয় ও আসুক। আসুক, আমার সামনে দাঁড়াক। যতদিন ছিল, আমার কলজেটা যেন হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছিল। চোখে দেখে মন ভরে না। দূরে গেলে শান্তি পাই না।'

'ভালবাসলে এমন হয়।'

'ভালবাসা? ওকে তুমি ভালবাসা বল? না না। এর নাম সর্বনাশ। এর নাম নেশা। ওকে দেখবার জন্যে আমি এখানে বসে থাকি। কত দিন, কত রাত।'

কুন্দন কপালের ঘাম মুছে ফেলে। বলে, 'হারামজাদী, শয়তানী আসে না! একবার যদি ওকে পেতাম.......'

'কি করতে?'

'শুধোতাম কি মন্ত্রে ওর মন পাওয়া যায়! জিগ্যেস করতাম, কিসে ও সুখী হবে।'

কুন্দন গলা নামিয়ে বলল, 'এত কথা বলছি, কিন্তু হয়তো কিছুই শুধোতাম না। বলতাম তুমি থাক। তোমার কাছে আর কিছুই চাইব না। শুধু তুমি থাক।'

'লায়লী হতভাগী, তোমার এত ভালবাসা তা ও বুঝল না। না চাইতে যে পায় সে দা দিতে শেখে না, জানলে কুন্দন?'

'ভালবাসা ভালবাসা কেন বলছ জানি না। এর নাম যদি ভালবাসা হয় তা'হলে এতে মানু শান্তি পায় কি? সুখ পায় কি?'

'না।'

'আমার মনে হয় না লায়লীকে আমি ভালবাসতাম। ও কারো সঙ্গে কথা কইলে হিংসে হ'ত। সন্দেহে জ্বলে-পুড়ে যেত মন। কত সময়ে বলেছি অমন করলে টুঁটি ছিঁড়ে দেব। ও হাসত। ও ভয় পেত। ওর আমার প্রতি কোন ভালবাসা, স্নেহ বা মমতা ছিল না।'

'তাই তো বলি...'

'ছিল না সেটা আমার ভাল লাগত। সত্যিই তো বলতে গেলে আমি ওকে কিনেছি। টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে আমার ঘরে এনেছি। ও দেখতে পারত না আমায়, সেটা আমি বুঝি ইদানীং কিন্তু...'

কুন্দন উঠে যায়। আয়নার সামনে দাঁড়ায়। আয়নার দিকে চেয়ে শিরীনের দিকে পেছ ফিরে বলে, 'জান তো, আমি ছোটবেলা থেকে মেয়েদের সঙ্গ ছাড়া। রুক্ষ-সূক্ষ্ম মানুষ। ভালবা পাওয়া যায় বলে আমি বিশ্বাস করি না। ও আকাশের বিষ্টির মতো। না চাইতে অজস্র পাবে চাইলে পাবে না।'

'কুন্দন, হেঁয়ালি ক'রে কথা কইছ।'

'না শিরীন। হেঁয়ালি আমি জানব কোথা থেকে? আমি কি লেখাপড়া শিখেছি? আমি কি হেঁয়ালি করবার সময় পেয়েছি?'

'যাক। তারপর বল।'

'লায়লী আশমানকে নাকি পাওয়া যায় না। যা কেউ পায় না, তাই পেতেই আমার ভা লাগে। অনেক টাকা লাগে। লাগুক। রাজী হ'য়ে গেলাম।'

সে সব কথা মনে পড়ে। কথাবার্তা হয়েছিল এই বাড়িতে ব'সে। লায়লী, কুন্দন আ বজরঙ্গী। বজরঙ্গী বাইরে দাঁড়িয়েছিল। কুন্দন ওকে ভেতরে ডাকে। লায়লী বলে, 'ও, কে কুন্দন?' কুন্দন বলে, 'ও বজরঙ্গী। আমার বজরঙ্গী।'

'তোমার বজরঙ্গী?' লায়লীর অধরে হাসি। লায়লী বলে, 'যাক, এখন তুমি আমি কথা ব কুন্দন। ওকে যেতে বল।'

'না না, ও থাক।'

'বেশ থাক।'

বজরঙ্গী উঠে পড়ে। বলে, 'মালিক, আমি নিচে যাচ্ছি।'

লায়লী বলে, 'কুন্দন, কাজের কথা বল।'

'তুমি বল।'

'আমি তোমায় ভালবাসি না। আমি বোধ হয় শুধু নিজেকেই ভালবাসি। কিন্তু তাতে কি এসে যায় কুন্দন? তুমি যদি আমার সঙ্গে ছলনা না কর আমিও তোমায় ঠকাব না, কোন দিন না।'

'তুমি কি আমায় কিছুই দেবে না?'

লায়লীর উত্তর শোনবার আগেই কুন্দনের হৃৎপিণ্ডটা যেন বেতালা শব্দ করে। বুকের ভেতর ব্যথা করে। এত সুন্দর, কিন্তু এত নির্মম। কি বলবে লায়লী?

লায়লী তার বেণীটি সামনে আনে। লম্বা বেণী, মুক্তোর ফুল বসানো। বড় বড় চোখ। হালকা নীল শাড়ীর আঁচলটি মাথা ঘিরে আছে। লায়লী বলে, 'যা পারি তাই দেব। ঠকাব না তোমাকে। তোমাকে গান শোনাব, গল্প করব তোমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে দাবা খেলব, বেড়াব, আর তুমি যদি চাও—'

'তবে?'

'ভালবাসবার ভান করব।'

'ভান করতে করতে একটু ভালবাসতে পারবে না?'

'পারলে বাসব। ভান করতে করতে কি ভালবাসা যায়?

'যায় না?'

'হয়তো যায়। আমি জানি না। তারপর—'

'বল।'

'এই বাড়ীটি আমায় দেবে?'

'দেব। লেখাপড়া করব? বল তো আজই করি।'

'না না। আমার যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন আমিই বলব লেখাপড়া করতে।'

'এখন নয় কেন?'

'তুমি বুঝি ভাবছ কোনমতে একটা লেখাপড়া ক'রে ফেললেই আমায় বেঁধে ফেলতে রিবে? না না। তুমি ভুল করছ। আমি যদি ক'দিন পরে তোমার কাছে থাকতে না চাই, তবে মার মনে হবে শুধু এই বাড়ী, টাকা, এ সব নেবার জন্যেই যেন ছলনা করেছি। তুমি আমায় বহার করতে দিও।'

'দেব। বাড়ী, তোমার। তোমায় আমি সুন্দর একটি গাড়ী দেব, একটি পালকি। একটি বজরা ব, তাতে তুমি নদীর বুকে বেড়াবে। শুধু একটি শর্ত আমার।'

'বল!'

'অন্য কারো যাতায়াত থাকবে না।'

'সে কি? শিরীন, নিসার, আমার পুরনো বন্ধু যে তারা!'

'তারা আসুক। কিন্তু অন্য কোন পুরুষ, আঃ—বুঝে নাও না, কি বলতে চাই!'

'বুঝেছি। বেশ তাই হবে।'

শিরীন বলল, 'কি ভাবছ?'

'ভাবছি!' কুন্দন একটু চেয়ে রইল। 'তোমায় কেন ডেকেছি জান? লায়লী তোমায় কি লেছে তাই জানতে চাই।'

'তাই জানতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'কুন্দন, সে আমায় যা বলেছে তা এমন কিছু নয়। আমি বলছি। তবে একটা কথা!'

'কি?'

'তুমি যেন আজও আমায় কোন আংটি বা গহনা দিও না। ছি ছি, আমার মনে হয় ও বড় বিশ্রী হবে। আমাকে লায়লী কি বলেছে, কি বলেনি, সবই তুচ্ছ কথা। সেজন্যে কিছু ঘুষ দিতে হবে না তোমায়।'

'বেশ, দেব না।'

'দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার থাকলে কি হয় জান? কেমন যেন একটা ধারণা হয়ে যায় দিচ্ছ বেশী, পাচ্ছ কম!'

'বাঃ শিরীন বাঃ! নিসার তোমায় এমনি ক'রে সাজিয়ে সাজিয়ে কথা কইতে শিখিয়েছে বুঝি? না, আমার আর কিছুই হলো না। আমি যেমন চাষা তেমন চাষা-ই রইলাম। কথাবার্তা কইতে শিখলাম না।'

'শেখবার দরকার কি?'

'বল বল, যা বলছিলে বল।'

'বলছি। একটা কথা আমার খুব মনে পড়ে। ও দিনের পর দিন আমায় বলত বজরঙ্গীকে দেখতে পারি না আমি। কুন্দনের সবটুকু ও-ই জুড়ে আছে।'

এ কথা শুনতে বুক ফেটে যায়, তবু যেন এক আশ্চর্য আনন্দ। বজরঙ্গীকে হিংসে করত! তবে কি লায়লী একটু একটু ভান করতে করতে কুন্দনকে ভালবেসে ফেলেছিল?

'বজরঙ্গীকে যখন সরিয়ে দিলে তুমি, চলে গেলে গাজিপুর, তখন ও এসে তোমার কথা বলত। শুধু তোমার কথাই বলত।'

তবে তাকে একটু ভালবেসেছিল লায়লী। তবে আর মদ খাবে না কুন্দন। মদের গেলাস সরিয়ে দেয় ও।

'শিরীন, আস্তে আস্তে বল।' আহা, কুন্দন তো কলমের কারবার করেনি। কলম ওর হাতে চলে না। নইলে ও শিরীনের কথাগুলো লিখে নিত। একটি কথাও হারিয়ে যেত না। সকলকে বলতে পারত, জান, লায়লী আমায় ভালবাসে, ভালবাসত।

'লায়লী বলত কুন্দন আমায় বড় ভালবাসে। এত ভালবাসে যে অমন ভালবাসা কোন পুরু কোন মেয়েকে দেয়নি। আমি বলতাম সে কেমন ভালবাসা রে? ও বলত সে তোমরা বুঝবে না। একটি কথা জেনে রাখ, আমায় ভালবাসে বলে কুন্দন একজনকে ভয়ানক শাস্তি দিয়েছে শাস্তি দিতে তার কষ্ট হয়েছে, তবু দিয়েছে।'

শিরীন একটু চুপ করে। বলে, 'কুন্দন, তখন তোমার ওকে ছেড়ে যাওয়া উচিত হয়নি।'

'আমি ইচ্ছে ক'রে যাইনি। আমার কাজ ছিল শিরীন।'

'এই বাড়ীটিতে একা একা থেকে ওর মাথাটা বোধ হয় খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। বড্ড একা পড়ে গিয়েছিল তো!'

'তোমরা তো ছিলে।'

'ছিলাম, কিন্তু জ্বালায় ছিলাম, যন্ত্রণায় ছিলাম। মাঝে মাঝে এসেছি। যখনই এসেছি দেখেছি ায়লী এই আয়নাটার সামনে বসে আছে। সেজে গুজে, একদিন এক একরকম সাজে। দিনের র দিন। কি যে ও ভাবত!'

'আমি যদি থাকতাম!'

'ও যে নিজের মনে কথা কইত। দোর বন্ধ ক'রে। তাই মনে হয় ওর মাথাটা বোধ হয় ারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আজ তাই আয়নাটা দেখে চমকে গেলাম। ওর কথাই মনে পড়ল। হয়তো স জন্যেই...

শিরীন নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'কেন যে মরতে গেল। হতভাগী, জীবনটা যে ঈশ্বরের দওয়া। তাকে নষ্ট করতে নেই। কি জ্বালা ছিল তোর?'

কুন্দন নীরব।

'কেন এমন করল কে জানে! একদিন দেখলাম তোমার দেওয়া সব উপহার ও গালচেয় ়ছিয়েছে। আর নিজে কি করেছে জান? লাল শাড়ী, হলুদ চেলি, জরির ফুল দেওয়া ওড়না পরেছে। হাতে পায়ে সোহাগ কুঙ্কুম এঁকেছে। গয়না পরেছে। বলল, দেখ তো আমায় হিন্দুবাড়ীর বউয়ের মতো দেখাচ্ছে কি না? আমি বললাম, না। তাদের আমি দেখিনি। ও াসতে লাগল। বলল, কুন্দন আসুক, একদিন এমন সাজে সাজব।'

কুন্দন বলল, 'আর বলো না। থাক।'

শিরীন উঠে পড়ল। বলল, 'আবার যদি কিছু মনে পড়ে তো বলব।'

'বেশ।'

কুন্দন দাঁড়িয়ে রইল। শিরীন চলে গেল। কুন্দন ঘরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, লায়লী একদিন ছিল, আজ নেই। নেই এটাই যেন নির্মম সত্য। এর চেয়ে কঠোর আর কোন সত্যই য়।

'দাদা!'

কে?'

ভীষণ চমকে উঠেছে কুন্দন। কে তাকে ডাকল? সে দরজার দিকে চেয়ে অবাক।

'কি হয়েছে গোপাল?'

'বলছি।'

কাছে এল গোপাল। বলল, 'তুমি বাড়ী চল।'

'কেন? এ কি, এরা এসেছে কেন? গোপাল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'জী নহীঁ।' একজন এগিয়ে এল। কুন্দন ক্রুদ্ধ হয়েছে।

'কি হয়েছে আরবি?'

'জী, গণেশীপ্রসাদ এখানে এসেছে।'

কবে? এ ঘরে নয়, বাইরে চল।'

াইরে বেরিয়ে এল ওরা। গোপাল এদের মধ্যে অস্বস্তি অনুভব করছে। ভাইয়ের দিকে কাতরে চাইছে।

আরবি এবং অন্যরা একসঙ্গে কথা কইতে থাকে। গণেশী কলকাতায় এসেছে। সে মৌলালীতে একটি বাসা নিয়েছে। সে আজই বড়বাজারে গিয়েছিল। গদীতে উপবিষ্ট গোপালকে দেখিয়ে সঙ্গের লোকটিকে বলেছে, 'এ নয়, কুন্দন। কুন্দনের কথা বলছি।'

'তাতে হয়েছে কি? শালা ভীতু, মেয়েমানুষ, তাতে হয়েছে কি!'

'হুজুর, তার পরই ওরা খুন করেছে ভীমকে!'

'কি?' কুন্দন চেঁচিয়ে ওঠে। 'ভীম তো বাড়ীতে থাকে। ভীমকে ওরা খুন করেছে কে বলল?'

'জী, খুনটা হলো চৌরাস্তায়। ওরা বোধ হয় গায়ে পড়ে হল্লা লাগায়।'

'মেরেছে কে?'

'আন্টুনি বাগানের সিতাব।'

'তারা কোথায়?'

'সিতাব থানায়। লাশ পুলিশ নিয়ে গেছে। গণেশী গা ঢাকা দিয়েছে।'

কুন্দন বলল, 'ওদের যা হবার হোক গে! গোপাল তুমি ভেব না।'

গোপালের মুখ লাল। গোপাল সম্ভবত অপমানিত হয়েছে। সে আস্তে আস্তে বলল, 'বাড়ীতে সবাই ভয় পেয়েছে। তুমি একলা এসেছ।'

কুন্দন একটু হাসল। বলল, 'গোপাল; সাপের কামড় লোকে এড়াতে পারে না। সাপ নিঃসাড়ে আসে। মানুষ জানতে পারে না। গণেশী হলো সেই রকম। ও শুধু চোরাগলি খুঁজবে, বিছুয়া মারতে চাইবে। আলোতে ভয় নেই। আঁধারেই ভয়।'

আরবি বলল, 'হুজুরের এ বাসায় বড় ঝোপঝাড়, গাছপালা। গা ঢাকা দিয়ে থাকতে সুবিধে।'

তারা নেমে এল।

গাড়ীর দিকে চলতে চলতে কুন্দন বলল, 'ওর হাতে বুঝি টাকা পয়সা হয়েছে আবার?'

তা হবে। ওদের কপাল তো অদ্ভুত। একবার পড়ে, একবার ওঠে।'

গাড়ীতে উঠল কুন্দন। গোপালের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ভেব না। আমি জানি তোমার সাবধান হওয়া বেশী দরকার। ছেলে আছে, মেয়ে আছে। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেব।'

।। এগারো ।।

ভীম মরল। সিতাব জেলে গেল। গণেশী গা ঢাকা দিল। কুন্দন ক'দিন তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকল। গণেশী এসেছে তা বোঝা যাচ্ছে। কেন না শহরের এখানে সেখানে পাকা হাতের জালিয়াতি এবং জুয়াচুরির খবর মিলতে লাগল। কুন্দনকে ডেকে ওর মা, ওর ঠাকুমা সাবধান হতে বলে। বিরক্ত হয়ে কুন্দন বাড়ীর ভেতর যাওয়া ছেড়ে দিল।

ঠাকুমা এল একসময়ে। 'হ্যাঁ রে কুন্দন, কারো কথা যে শুনিস না, ভয় করে না?'

'কিসের ভয়?'

'ও তোকে মারবে।'

'আমি কি ইঁদুর? আমাকে টিপে মারবে?'

'তুই না হয় বাড়ীতে থাক ক'দিন। বেরোস না।'

কুন্দন চাকরদের ডেকে বলল, অন্দর থেকে কারুকে যেন তার মহলে আসতে দেওয়া না য়। দরজা বাঁধা থাকবে।

সে আরো হুকুমজারী করে। তাকে যেন অযথা কেউ বিরক্ত না করে, তার মন-মেজাজ াল নেই, সে বিষয়-কর্মের ঝামেলায় থাকতে চায় না। সকলেই সন্ত্রস্ত হলো। আড়ালে লাবলি করল 'মালিকের মন-মেজাজ বিগড়ে গেছে।'

'ভীম মরে গেছে ব'লে দুঃখ পেয়েছে।'

'কে বলল?'

'ভীমকে ডেকে ডেকে কথা কইত যে। ভীম মালিকের অনেক দিনের নাওদার।'

কুন্দন সত্যিই দুঃখ পেয়েছে।

দুর্ধর্ষ এবং দুঃসাহসী ভীম। বজরঙ্গীকে তো সেই মানুষ করে। জল থেকে তুলে, না জানি ত যত্নে। যত্ন করেছে নিশ্চয়, নইলে কি অতটুকু ছেলে বাঁচত?

ভীম বলত, 'মালিক, ওকে নিয়ে গেলাম আমার ভাবীর কাছে। ভাবী বাজারে বসে তরকারী বচে। ছেলেপুলে নেই বলে বড় দুঃখ। ছোটবেলাটা দুধ খাইয়ে খাইয়ে সে মানুষ করে। নইলে কি বাঁচত? ভাবী বেশীদিন বাঁচল না। তারপর আমার কাছে আনি।'

খুব হাসত ভীম। বলত, 'কি জানি কেমন ক'রে ছেলেটাকে বড় ক'রে ফেল্লাম।'

সেই ভীমও চলে গেল।

গণেশীর কথা তো কুন্দনের মনেই ছিল না। বংশে-বংশে বিরোধ, এ সব যেন গল্প কথা মনে য়। কিন্তু গণেশীই বা কি করবে। গোপালকে না হোক, অন্তত কুন্দনকে না মারলে ওর শান্তি বে না। হয়তো ও গোপালকে, গোপলের ছেলে তিনটেকে, সকলকেই মারবে। আগে ন্দনকে মেরে তারপর। কুন্দনকে রেখে যদি গোপালকে মারে, কুন্দন তবে হয়তো ভীষণ তিশোধ নেবে। গণেশীর ছেলেদের মেরে ফেলবে। তাই আগে কুন্দনকে মেরে ফেলা রকার।

কুন্দন আরবিকে ডেকে পাঠাল। একটা কথা মনে হয়েছে তার।

'হ্যাঁ রে আরবি, গণেশী তো গতবছর ভাদ্রমাসে একবার এসেছিল চন্দননগর, আসেনি?'

'জী।'

'তখন কলকাতা এল না কেন? খবর নিয়েছিলি?'

আরবি বিব্রতভাবে বিড়বিড় ক'রে কি বলে চুপ করে রইল।

'বল্! কিছু জানিস ব'লে মনে হচ্ছে?'

'জানি মানে কি যেন শুনেছিলাম।'

'বল্!'

'আপনি রাগ করবেন।'

আরবির কোমরে একটি ছুরি বাঁধা। কুন্দন ছুরিটা নিল। বেশ বাঁকানো ফলা, ছোট ছুরি। হাতলে কারুকাজ করা। ছুরিটা লুফতে লুফতে কুন্দন বলল, 'বেশ ছুরিটা, তাই না! সুন্দর ধার।'

ছুরিটা সে সহসা আরবির পেটের ওপর ধরল। হাসতে হাসতেই বলল, 'বল্! নইলে এই ছুরি এদিক থেকে ওদিক চালিয়ে দেব।'

আরবি হাসল। কিন্তু তার চোখের কোলটি আতঙ্কে ঘোলা হয়ে উঠল। কুন্দনের হাসতে যতক্ষণ, ছুরি বসাতেও ততক্ষণ। সে শুকনো গলায় বলল 'বলছি'।

কুন্দন ছুরি সরাল।

'বজরঙ্গী ছিল বলে গণেশী আসেনি।'

'বজরঙ্গী ছিল বলে? কেন? তাতে কি হয়েছে?'

'সবাই বলে—'

'কি বলে? আরে কি বলে তাই তো জানতে চাচ্ছি রে। তোর যে মুখে কথা নেই। আরে মেয়েমানুষ, মেনিমুখো শয়তান, কথা বল্!'

'সবাই জানে বজরঙ্গী আপনাকে রক্ষা করত। সবাই জানে ও মন্তর-তন্তর জানত। ও যতদিন আছে ততদিন আপনাকে মারবার উপায় নেই। আপনাকে যখন সাপ কামড়াল তখন আপনি মরলেন না, কেন মরলেন না? বজরঙ্গী ছিল বলে।'

'আরবি, এ আজগবী গল্প তুই বিশ্বাস করিস? আমাকে দণ্ডরাজ সাপে কাটে। আরে দণ্ডরাজের কি বিষ থাকে? ওর কামড়ে মরবে কে?'

'দণ্ডরাজ?'

'হ্যাঁ আরবি।'

আরবি আর কিছু বলল না, তবে বিশ্বাসও করল না। কুন্দন পরিহাসের সুরে বলল, 'এখন আমার মরবার সময় হয়েছে?'

'জী, ও যাচিয়ে দেখছে বজরঙ্গী আছে কি নেই।'

'কি ক'রে জানলি?'

'আমি জানি। আমি রটিয়ে দিয়েছি বজরঙ্গী তীর্থ করতে গেছে, এবার এল বলে।'

'ও!'

কুন্দন আরবির দিকে চেয়ে রইল। সে রেগেছে না খুসী হয়েছে আরবি বুঝল না। শুধু বলল, 'হুজুর, ও কবে আসবে?'

'আরবি, তুই যা!'

আরবি সভয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কুন্দন ছুরিটা তুলেছে।

'নে।'

ছুরিটা ছুঁড়ে দিল কুন্দন। আরবি লুফে নিল। আরবি চলে গেল। কুন্দন অশান্তভাবে পায়চারি করতে লাগল। তার মনটা অস্থির ক'রে দিয়ে গেল আরবি। লোকে জানে বজরঙ্গী তার রক্ষাকবচ। লোকে জানে বজরঙ্গী বিদেশ গেছে, আবার আসবে।

কুন্দন বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল। সে গাড়ী ডাকাল। গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে সে টুকরি বোঝাই ফল খরিদ করল। ফল, মিষ্টি, সাদা রেশমের থান। শিরীন তাকে দেখে অবাক হলো। নেমে এল।

ওপরের ঘরে বসল তারা। কুন্দন অস্থির, অশান্ত। বলল, 'যাও যাও, নতুন শাড়ীটি পরে এস।'

নতুন শাড়ী পরে শিরীন এল। কুন্দনের সামনে বসল। পিচ ও আঙুরগুলো গুঁড়ো বরফে ডোবানো হলো। আপেল ঘষে ঘষে চকচকে করা হলো। কুন্দন বলল, 'ভাল লাগছে না। একবার দিল্লী যেতে ইচ্ছে করছে। যাবে?'

'আমি?'

'হ্যাঁ তুমিই।'

হাসতে লাগল কুন্দন। বলল, 'তুমি আর আমি। দুজনের বয়সই মানান সই। দুজনে দুজনকে দেখতে পারি না। দুজনে সারাদিন, সারা হপ্তা, এমন কি মাস কাটলেও দুজনকে স্মরণ করি না। আমরা একসঙ্গে থাকলেও আমি ভাবি লায়লীর কথা, তুমি ভাব নিসারের কথা। আমরা দুজনেই তো দুজনের উপযুক্ত সঙ্গী শিরীন।'

'ঠাট্টা করছ?'

'না। আমি ভাবছি এবার দুজনে দুজনের বন্ধু হব। কি, রাজী?'

'না।'

'কেন? একলা থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠছ তা কি আমি জানি না?'

'সত্যিই। একা থাকতে আর পারছি না। জান? ভাই ভাইপো সব আসতে বলেছি।'

'বেশ করেছ। নিজের কিছু হলো না। এখন পরকে নিয়ে সুখী হও। তোমরা, মেয়েরা এত জোড়াতালি দিতেও জান।'

শিরীন একটু চুপ ক'রে থাকে। কি যেন ভাবে। তারপর কুন্দনের কথার জবাব না দিয়ে বলে ওঠে, 'এই, একটা কথা মনে পড়েছে।'

'কি?'

'হঠাৎ মনে পড়েছে!'

'বল।'

'জান, লায়লী তোমাকে একটা কথা চেপে যায়। ও বজরঙ্গীকে আগে দেখেছে। আগে থেকেই চিনত।'

'কি বললে?' কুন্দন তীক্ষ্ণ গলায় বলে।

'ঠিকই বলেছি। শেষ যেদিন লায়লীর সঙ্গে দেখা হয়, সেদিনই ও বলল। আগে বলেনি।'

'কি বলল?'

শিরীন বলে যায়।

সেদিন লায়লী শিরীনকে ডেকে পাঠায়। শিরীনের সঙ্গে আলি শাহর প্রসাদে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ থাকে এবং পূর্ব পরিচিত কয়েকজনকে নেমন্তন্ন ক'রে আসে। সন্ধ্যেবেলা চীনেলণ্ঠন দিয়ে বাড়ী এবং বাগান সাজায়। সব আলোয় আলো। হলঘরে মস্ত ফরাস পেতে তাতে সুখাদ্য সাজানো হয়। একজন চীনে বাবুর্চিকে ডাকা হয়েছিল, সে রান্নাবান্না করে।

এলাহি আয়োজন ও অভ্যর্থনার বহর দেখে সবাই অবাক। আলি শাহর দরবারের তবলচি, সারেঙ্গীয়া, তিনজন কবি, দু'জন বিগতযৌবনা নর্তকী, কাঁচের কুঁজোয় শরবত, বোতলে বোতলে উৎকৃষ্ট সুরা। বরফ, ফল, রাবড়ি এবং ফিরনি। বড় বড় সাদা কাঁচের বাসনে নানারকম মাংস। সুঘ্রাণ পেশোয়ারী চাল ও মাংসের বিরিয়ানী। ডিম, মাংস ও মটরশুঁটির চীনে পিলাউ।

সে উৎসবে নিসারও এসেছিল।

খুব আনন্দে খাওয়া-দাওয়া হয়। তারপর সবাই চলে যায়। শিরীনকে যেতে দেয়নি। শিরীনকে নিয়ে সে নিজের ঘরে ঢোকে। ওর কথাবার্তা শিরীনের কানে বেসুরো লাগে। এর আগে ও যেন বড় বেশী উচ্ছল, চটুল এবং চঞ্চল হয়েছিল। এখন যেন বড় বেশী গম্ভীর, ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ।

ওরা দুজনেই স্নান করে।

টবে উষ্ণজল, তাতে ল্যাভেণ্ডার ও বাথসল্ট দেওয়া হয়। লায়লী স্নান ক'রে চুল ভিজিয়ে উঠে আসে।

শিরীনের ঘুম পাচ্ছিল। সে এবং লায়লী দুটি ছোট বিছানায় শুয়ে পড়ে। হঠাৎ লায়লী তাকে ঠেলে তোলে। বলে, 'শিরীন, শুনতে পাচ্ছ?'

'কি?'

'কে ডাকল না?'

'না তো!'

শিরীন বলে, 'নিচে দরোয়ানরা রয়েছে, গুর্খা সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। ডালকুত্তাগুলো ছাড়া আছে। কে আসবে?'

তখন লায়লী হঠাৎ বলে, 'শিরীন, বজরঙ্গীকে আমি অনেকদিন ধ'রে চিনি। সে কথা কুন্দনকে বলা হয়নি। দোষ হয়েছে কি?'

শিরীন উঠে বসে।

চোখে-মুখে জল দেয়। গালে পান ও জর্দা। বলে, 'তামাক সাজতে বল্। আলবোলা আনতে বল্। সারারাত কথা কইতে সাধ গিয়েছে তো অমন ক'রে খাওয়ালি কেন?'

লায়লীকে দেখে ও অবাক।

জানালা দিয়ে চাঁদের আলো। সাদা বিছানা। ঘরের এক কোণে একটি বাতি। লায়লী একটা খুব পাতলা সাদা শাড়ী পরেছে। পাতলা, ফুরফুরে সাদা। তার পাড়টি কালো। সাদা রঙের লেসের জামা পরেছে, চুলগুলো খোলা। কাঁধ ঢেকে, বুকের ওপর দিয়ে বিছানায় ছড়িয়ে পড়েছে চুল।

শিরীন অবাক হয়ে দেখে সব গয়না ও খুলে ফেলেছে। বিছানায় টেবিলে, মেঝেতে গয়না গড়াগড়ি যাচ্ছে। সে বলে 'কি হয়েছে?'

'ঘুম আসছে না।'

দাসী আলবোলা আনে। হঠাৎ লায়লী বলে, 'এই, নতুন মোমবাতিগুলো আনতে বল্!'

'জী?'

'মোমবাতি আনতে বল্।'

লায়লী মোমবাতিগুলো নিয়ে যেখানে সেখানে বসায়। মেঝেতে, ফুলদানীতে, দেওয়ালের গায়ের পেতলের ব্র্যাকেটে, চৌকাঠে। বলে, 'আলবোলা দিয়ে চলে যা। এদিকে আসবি না।'

তারপর বলে, 'শিরীন আমার কথাটা শুনেছ!'

'শুনেছি। অবাক হয়েছি। কেমন ক'রে চিনলে?'

'সে অনেকদিন আগেকার কথা শিরীন। একবার ঈশ্বরলালজী আমাকে আর মা-কে নিয়ে কাশী গিয়েছিলেন। আমার তখন বয়স খুব কম। বছর বারো হতে পারে।'

'লায়লী, বারো বছর বয়সে তুমি খুব বড়সড় হয়ে গিয়েছিলে!'

'কাশীতে একটি নৌকো ভাড়া করা হয়। নৌকো নয়, বজরা। সে বজরাতে চারটি কামরা ছিল। বজরার পেছনে আর একটা নৌকো বাঁধা ছিল। একটি কামরায় আমি থাকতাম। একটি কামরায় গানবাজনা হ'ত। একটিতে মা, একটিতে ঈশ্বরলাল।'

'তারপর?'

'সেই বজরার গায়ে সবুজ আর সাদা রঙ। বজরার ছাতে একটি নিশান পোঁতা। বজরার গায়ে লেখা বাবুলাল মিশ্র। তখন কি জানি ওটা কুন্দনেরই বজরা?'

'সে বজরা নিয়ে আমরা ওদিকে পাটনা, এদিকে কানপুর অবধি যাই। আমাদের বজরার সঙ্গে নৌকো থাকত। সে নৌকোয় রান্নাবান্নার জিনিস থাকত। সে নৌকোয় একটা ছেলে ছিল। তার নাম বজরঙ্গী।'

'লায়লী, এ আর এমন কি কথা। এ কথা তুই কুন্দনকে বলিস নি কেন?'

'কি জানি। ভুল হয়ে গেছে।'

'বজরঙ্গী-ও কি তোকে চেনেনি? নাকি ও তোর সঙ্গে কথা কইতে সাহস পায়নি?'

'শিরীন, ও আমাদের চাকর ছিল। নৌকো যখন বাঁধা হ'ত ও আমাদের জন্যে সওদা কিনে আনত। আমার মা ওর সঙ্গে আমায় কথা কইতে দেবে কেন?'

'হ্যাঁ রে, ঘুমোবি না? শুধু আজে-বাজে কথা কইবি?'

'ঘুম আসছে না যে। একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে ঐ কথাটা মনে পড়ল। ঘুম আসছে না।'

লায়লী করুণ ও মৃদুকণ্ঠে বলে, 'ঘুম আসছে না, ঘুম আসছে না।'

খানিকক্ষণ গল্পগুজব ক'রে শিরীন আবার ঘুমোয়। কিন্তু ঘুমটা আর গাঢ় হয় না। ভাঙা ঘুম, হালকা ঘুম। বোধ হয় রাত তিনটের সময় তার আবার ঘুম ভেঙে যায়।

লায়লী বিছানায় নেই।

শিরীন ওঠে। বিছানা ছেড়ে বেরোয় ঘর থেকে। সামনের ঘরে বাতি জ্বলছে।

কুন্দনকে সে কথাটি বলতে গিয়ে শিরীনের গলা কাঁপতে লাগল। সে বলল, 'এ ঘরে এলাম। এসে ভীষণ ভয় পেলাম। লায়লী এই আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখ বন্ধ। ও কথা কইছে ফিসফিস, ফিসফিস ক'রে।'

'বল।' কুন্দনের গলা কর্কশ।

'হায় আল্লা, আমি দেখি ওর আঁচলটা লুটোচ্ছে। ঘরের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বলছে। আঁচলটা বুঝি জ্বলে ওঠে। আমি ওকে জোরে ঝাঁকি দিলাম। ওর চমক ভাঙল। ও অবাক হলো। চেঁচিয়ে উঠল।

'আমি ওকে ধরে ঘরে আনি। শুইয়ে দিই। পাঁচপীরের নাম জপ ক'রে দিই ওর বুকে হাত রেখে। পরদিন যখন চলে আসি তখন ও ঘুমোচ্ছে।'

'তারপর?'

'তারপরকার কথা আর জিগ্যেস ক'রো না কুন্দন। আমি ভাবলাম বেচারীকে কেউ তুকতাক করেছে। ওকে নিশিতে ডাকছে। আমি মানিকতলা যাই, পাঁচপীরের দরজায় যাই, আমার বুড়ি ফুফুর কাছে যাই। ওষুধ মাদুলী আনলাম। যত্ন ক'রে রাখলাম। পরদিন নিয়ে গিয়ে পরাব। কিন্তু পরদিন সকাল না হতে আমার দোরে ধাক্কা পড়ল।'

সে-কথা শিরীনের চিরদিন মনে থাকবে। ভোরবেলা দরজায় ধাক্কা। দোর খুলে দিয়ে দাসীরা অবাক। তারা এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে।

'হুজুরাইন; মালকিন, বড় বিপদ।'

'কি হয়েছে?'

একটা চীৎকার শোনা গেল। অসংলগ্ন কথা কইতে কইতে, চেঁচাতে চেঁচাতে উঠে এল লায়লীর দাসী। এসেই শিরীনের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। তার পেছন পেছন নিসার।

নিসারের মুখ সাদা, ঠোঁট কাঁপছে, শরীর কাঁপছে। সে বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে শিরীন!'

শিরীন বলল, 'কুন্দন, তুমি নিসারের কাছে যাও।'

'নিসার? তুমি কি স্বপ্ন দেখছ!'

'নিসার এসেছে কুন্দন। আমি তোমায় সে খবরটি নিজেই দিতাম। নিসার এসেছে পিয়ারে সাহেবের সাথে। পিয়ারে সাহেবকে ডেকেছেন আলি শাহ।

'নিসার। নিসার কি জানে?'

'নিসার তার ক'দিন আগে হঠাৎ কলকাতা এসেছিল। ওকে লায়লী আটকে রাখে। অনেক কথা বলে। তারপর, তারপর ও লক্ষ্ণৌ চলে যায় কুন্দন। আবার এসেছে।'

'নিসারকে লায়লী মনের কথা বলেছিল?'

'হ্যাঁ। ওরা দুটি ছোটবেলার বন্ধু। ভাইবোনেরই মতো।'

'নিসার, নিসার!' হঠাৎ কুন্দনের শিরীনের জন্যে অনেক কিছু করতে ইচ্ছে হলো। এমন কিছু করা যায় না, যাতে ও খুব আনন্দ পায়? সে অন্য কিছু ভেবে পেল না। চট ক'রে বলল, নিসারকে তোমার কাছে নিয়ে আসব?'

'আমার কাছে?'

শিরীন হাসল। বিষণ্ণ হাসি, শান্ত হাসি। বলল, 'কুন্দন, কুন্দন, তুমি কি সেই সুন্দর কবিতাটি জান না?'

'কি কবিতা?'

'ভাঙা হৃদয়, আর ভাঙা আয়না জোড়া লাগে না? ভাঙা বন্ধুত্ব কি আর জোড়া লাগে? আমি সে চেষ্টা কোনদিন করব না কুন্দন, কোনদিন না।'

॥ বার ॥

কুন্দন খিদিরপুরের বাড়ীতে এল।

খিদিরপুরের বাড়ীর বাগানে আজ অনেক আলো জ্বলছে। কুন্দনের হুকুম। চাকর, দারোয়ান পাহারাদার সবাই সেলাম করল এবং হাত পাতল।

'কেন?'

তারা মিষ্টি খাবে। কিন্তু কেন? হঠাৎ কুন্দনের মনে পড়ল গোপালের স্ত্রীর একটি পুত্র হয়েছে। কিন্তু তার বয়সও তো একমাস হলো।

'মনোহর জী-র তিলক হয়েছে।'

'ও।'

কুন্দন ওদের দিকে তাকাল। কুন্দনের ভাইপোর তিলক হয়েছে সে খবর এখানে আগেই পৌঁছিয়েছে।

কুন্দন কয়েকটা টাকা ছুঁড়ে দিল। বলল, 'যা। আমাকে বিরক্ত করিস না।'

ওপরে এল সে। ঘরের চাবি খুলল। আজ বেশ ঠাণ্ডা। তীব্র জলো বাতাস বইছে। নদীর বাতাস। দূর থেকে জাহাজের গম্ভীর ভোঁ শোনা যায়। বাতাসে জুঁইয়ের গন্ধ, চামেলির গন্ধ। নিচের বাগানে ঘন সবুজ গাছে থোকা থোকা জুঁই, থোকা থোকা চামেলি। বর্ষার ফুল, রাতের ফুল।

যেদিন লায়লী এ বাড়ীতে চিরদিনের মতো ঢুকল।

চিরদিনের মতো! কতদিন রইল এখানে? লায়লী এ ঘরে কোন আসবাব রাখতে বারণ করেছিল। বলেছিল, 'খোলামেলা ঘরে নিশ্বাস নিতে বড় ভাল লাগে।'

কুন্দন বজরঙ্গীকে ডেকেছিল।

'জান লায়লী, বজরঙ্গী আমার সবকিছু দেখে-শোনে। শোন্ বজরঙ্গী, এ তোর মালকিন।'

বজরঙ্গী ঘাড় নেড়েছিল। তারপর লায়লী বলে, 'গান গাইব, গান গাইতে ইচ্ছে করছে।'

'লায়লী, বজরঙ্গীকে সারেঙ্গী বাজাতে বল। ও বাজালে তবে হবে তো?'

'কুন্দন, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো আমারও চলবে। তোমার সারেঙ্গীয়া কি গানের সঙ্গে সঙ্গত করে?'

বজরঙ্গী হঠাৎ হেসে ওঠে। বলে, 'পরখ কর।'

'কুন্দন, তোমার সারেঙ্গীয়া কি আদব জানে না? আপনি বলতে জানে না?'

'লায়লী, তুমি ওর কথায় রাগ ক'রো না। ও ঐরকমই।'

বজরঙ্গী সারেঙ্গী ধরেছিল। লায়লী প্রথমেই গায় 'নীর ভরনে কৈসে জাউঁ।'

কুন্দন গানটি শুনে বলে, 'বেশ গান। গাইবার সময়ে ওকে কি সুন্দর দেখায় দেখেছিস বজরঙ্গী?'

বজরঙ্গী বিব্রত হ'য়ে বলে, 'মালিক, এমন ক'রে কথা বলে না।'

'কেন রে?'

'গান ভাল লাগল কিনা, সেটা আগে ভাল ক'রে বলতে হয়।'

লায়লী সকৌতুকে হাসছিল। লায়লী বলে. 'সারেঙ্গীয়া. তুমি তো বেশ কথা কইতে পার?'

পরে বজরঙ্গী বলে, 'মালিক, তুমি এ কি করলে?'

'কেন রে?'

'আমি এত ক'রে বললাম—'

'আরে পাগল, তুই মালকিন এনে দাও বলেছিস ব'লেই তো ওকে আনলাম।'

'মালিক, তুমি একটা ভাল মেয়ে, সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন?'

'এ-ও খুব ভাল।'

কুন্দন তাকে বলে, 'বজরঙ্গী, এর যেমন জেদ, তেমনি খামখেয়াল। একে না কি কেউ ব মানাতে পারেনি।'

'বুঝেছি মালিক।'

'ও খুশী হ'লেই আমি সুখ পাব।'

বজরঙ্গী চেয়ে থাকে। কুন্দন বলে, 'তুই এখানে থাকবি।'

'তবে তোমায় কে দেখবে?'

'আমিও অনেকটা সময় এখানে থাকব।'

'তারপর তুমি ফিরে যাবে, আমি এখানে থাকব?'

কি অবোধ বজরঙ্গী। লায়লী এসেছে তার জীবনে, এখন একটু ওলটপালট তো হবেই কুন্দনের রাগও হলো, মমতাও হলো। সে ধমক দিয়ে বলল, 'বজরঙ্গী, তুই এখানে থাকলে তবে তো আমি নিশ্চিন্ত থাকব। মালকিনের কোন অসুবিধে হলো কিনা তুই দেখছিস জানলে নিশ্চিন্ত। নইলে ওখানে থাকব কি ক'রে?'

বজরঙ্গীর মুখটা একটু উজ্জ্বল হলো। সে বলল, 'তুমি যা বল তাই হবে।'

সে কুন্দনের জামা খুলে নেয়। কুন্দনকে বাতাস করে। বলে, 'তুমি সুখী হবে তো?'

'তুই খুশী হবি?'

'তুমি সুখী থাকলেই আমি খুশী।'

একটু ভেবে সে বললে, 'আমি রোজ ভগবানকে ডাকব, নতুন মালকিন যেন তোকে খুব ভালবাসে।'

কুন্দন আয়নাটির কাছে যায়। আয়নার ঢাকনি তোলে। না, কোথাও কিছু নেই। কোথায় কি থাকবে? মৃত্যুর পরে যদি অন্য জগৎ থাকত! সে আয়নার পাশের দেওয়ালে মাথা রেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। বেশ লাগছে।

বেশ নেশা হচ্ছে। শুধু চিন্তায় এত নেশা কে জানত! শুধু চিন্তা কর, স্মৃতিতে ডুবে থাক আস্তে আস্তে মাথার ভেতর রিমরিম ঝিমঝিম নেশা বুদ্বুদ কাটতে থাকবে। তাতে শান্তি পাবে কুন্দন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকল।

কি সুগভীর স্তব্ধতা! একটা মানুষ কথা কয় না, একটা-ও শব্দ নেই। চাকর-দরোয়ানরা বাইরে। এ বাড়ীর ঘরে ঘরে দোরে দোরে তালা। কুন্দনের মনে হলো এ ঘরটা যেন বড় বেশী নিস্তব্ধ।

তারপরে মনে হলো এই অপার, অতল নিস্তব্ধতার বুকে যেন রিমঝিম শব্দ বাজছে। এত আস্তে, যে কান পাতলে শোনা যায় না।

তারপরেই যেন ভেসে এল একটা ক্ষীণ সুরভি।

ধূপের ধোঁয়া যেমন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে ওঠে তেমনি ক'রেই যেন এ সুগন্ধ কুণ্ডলী খুলছে।

তার কি সত্যিই নেশা হয়েছে? আজ তো বলতে গেলে ব্রাণ্ডি খায়নি কুন্দন। সে তো মাতাল নয়, তেমন নেশা সে করে না। কিন্তু এই তো তার শরীরের সব কটি লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। শরীরের প্রতি লোমকূপের গোড়ায় কে যেন উত্তেজনা সঞ্চারিত করে দিচ্ছে।

চামেলীর আতরের সুবাস।

সে সুবাস যেন নাচের ছন্দে ছুটে এল। এক নিমেষে ঘিরে ফেলল কুন্দনকে।

লায়লী। সে বলল বটে, কিন্তু তার ঠোঁট নড়ল না। সে কান পাতল। অসম্ভবের আশায় তার চোখ বড় বড়, কপাল ঘামছে।

এবার নিশ্চয় সে সেই কণ্ঠ শুনতে পাবে। নিশ্চয়ই এই চামেলীর আতরের গন্ধের মতো সে গানও ভেসে আসবে। সেই 'লাগতা নহী হ্যায় জী মেরা'।

কুন্দন চাইল। ভাল ক'রে চাইল। এসেছে নাকি?

হয় তো এখনি আসবে।

একটি দীর্ঘশ্বাস। কে যেন তার ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা একটি নিশ্বাস ফেলল।

'নিশ্বাস ফেলেনি, না না, কেউ নিশ্বাস ফেলেনি। কেউ এ ঘরে নেই।' নিজের মনকে বোঝাল কুন্দন কিন্তু আবার তার শরীরের লোমগুলো সোজা হয়ে ওঠে, চুলের গোড়ায় গোড়ায় যেন মৃদু উত্তাপ অনুভব করে সে।

লায়লী এসেছে। এসেছে, এ ঘরেই আছে। ঐ আয়নায় আছে। ঐ আয়নায় এখনি তার মুখ দেখা যাবে। সেই ঈষৎ লম্বাটে মুখ, চিবুকের সুন্দর ডৌল। পাতলা ঠোঁট এবং কালো চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে।

কুন্দন আয়নাটার ঢাকনি খুলে ফেলে। হাত কাঁপছে। 'লায়লী, লায়লী, লায়লী!'

কে[illegible]

কে যেন কুন্দনের কপালে চড় মারলে। কারা যেন অট্টহাস্য করলে, কে যেন খিলখিল ক'রে হেসে বলল, 'বোকা!'

কেউ না। সব কুন্দনের মনের ভ্রম। সবই তার মনের কল্পনা।

ঐ তো আয়নায় শুধু কুন্দনেরই মুখের ছবি। হতাশার অভিব্যক্তি। নৈরাশ্যের প্রতিচ্ছবি।

কুন্দন দুর্বল বোধ করল। হাত কাঁপছে, পায়ের নিচে সিরসির করছে। সে বসে পড়ে।

চামেলীর গন্ধ নেই বাতাসে। লায়লী আশমানের আয়নাতে আর লায়লীর মুখের ছবি দেখা যাবে না। কুন্দন আস্তে আস্তে আয়নাটা ঢেকে দিল। বেরিয়ে এসে তালা বন্ধ করল ঘরের। নেমে এল।

মস্ত বড় বাগান। বর্ষার জল পেয়ে বড় বড় হয়েছে ঘাস। সবুজ কোমল ঘাসে পা ডুবে যায়। জুঁই ও চামেলীর ঝাড় থেকে মৃদু সুগন্ধ। এপাশে একটি পাখীর ঘর। জাল দিয়ে ঘেরা। ঘরটি বেশ উঁচু। একটা পেয়ারা গাছ, একটা আতা গাছ এবং আরো কয়েকটা গাছ ঘিরে তৈরী হয়েছিল ঘরটা। বজরঙ্গী নিজে করেছিল। কুন্দন দেখল ঘরের এক কোণে পেয়ারা গাছটা জালের ফাঁক দিয়ে সরু সরু ডাল বের করছে। কি যেন ঝটপট করল ডানা। ঘুমোতে ঘুমোতে পাখীরা অমন করে।

কুন্দন এগিয়ে চলল। লক্ষ্যহীনভাবে সে ঘুরছে। ঘাসের ওপর দিয়ে গাছের নিচে নিচে। ক গাছ। বাড়ীটা যখন কেনে কুন্দন তখন কয়েকটা গাছ ছিল। বজরঙ্গী একটি একটি ক'রে গা লাগায়। গাছের চারা কিনে এনে রাখত সে আর কুন্দনের ঠাকুমার কাছে যেত।

'আরে বজরঙ্গী, বার বার অন্দরে যাস কেন?'

'মালিক, একটি শুভদিন দেখতে হবে।'

'কেন রে?'

'শুভদিন দেখে তবে তো গাছ লাগাব।'

'গাছ লাগাবি তারও শুভদিন?'

'হ্যাঁ।'

সে শুভদিন দেখে গাছ লাগাত। গাছটিকে কত যত্নে বড় করত। সে মালীকে বলে ক' আলি শাহর বাড়ী ও বাগান দেখে আসে। তারপর কি মন খারাপ তার।

'মালিক, ওদের গাছগুলো বাঁচল। আমি এত শখ ক'রে লাগালাম, একটা গোলাপগাছ বাঁচল না।'

মাঝে মাঝে অসময়ে ছুটে আসত। চোখমুখ খুশীতে উজ্জ্বল। 'মালিক, আমাদের নতু গাছটায় আমের মুকুল এসেছে।'

'মালিক দেখ দেখ, চীনে জবা এই প্রথম ফুটল। তুমি বলেছিলে এ ফুল দেখতে ভাল না এখন দেখ তো?'

এখন সেই সব গাছের নিচে থোকা থোকা জোনাকি। অন্ধকারের ফুল। বড় বড় ঘাস। সে থাকতে নিয়মিত সব ঘাস কেটে নিয়ে যেত ঘেসেড়ানী। 'মালিক, এ ঘাসের শীষে কীট থাকে সে কীট থেকে প্রজাপতি হয়, জান?'

বাগানের একপাশে একটি ঘর।

কুন্দন শেকল খোলে। দেশলাই জ্বালে এবং এগিয়ে যায়। ঐ তো ধুলো-পড়া ছোট্ট একটা মোমবাতি। আর একটা কাঠি জ্বেলে নেয় সে। বাতিটা জ্বালায়।

নিচু চৌকির ওপর ধুলো জমেছে। দেওয়ালে সারেঙ্গীটা ঝুলছে। আলনায় দুটি একটি জামা-কাপড়।

বাড়ীর নিচতলায় দুটো ঘর শুধু ওরই জন্যে সাজিয়ে দেয় কুন্দন। সে ঘর ছেড়ে ও একদিন চলে এল। এই ঘরটি নাকি চমৎকার! এ ঘর থেকে গঙ্গা দেখা যায়।

'মালিক, এ জানলাটা খুলে দিলে আমি গঙ্গার বাতাস পাই। দেখ, ঘরটার ভিত কত উঁচু এখানে থাকতে আমার খুব ভাল লাগবে।'

'তোর জিনিসপত্তর নিয়ে আয়।'

'আনব, আনব।'

ক'দিন পর কুন্দন শুধোয়, 'আরে হতভাগা, তুই ও সব আনলি না? একটা চৌকি, একটা আলনা, ব্যস? এই যে একটা টেবিলও এসেছে দেখছি। আবার রামায়ণ এনেছিস? আরে বজরঙ্গী? তুই আবার তুলসীদাস এনেছিস?'

'মালিক, মাঝে মাঝে পড়ব।'

'পড়, ভাই পড়। স্বর্গে যাবি।'

কুন্দন লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যায়। কয়েকদিন বাদে বজরঙ্গীর ঘরে সে আবার এল। জরঙ্গী ঘরে ছিল না। বজরঙ্গী স্নান ক'রে এল।

'আরে পণ্ডিতজী, তোর রামায়ণ কোথায়? তোর সাদা ষাঁড় কোথায়? তুই ঐ বইয়ের লাট ধরে ঝুলতে ঝুলতে স্বর্গে যাবি যে।'

'রেখে দিয়েছি।'

'কোথায়?'

'বাড়ীর ও-ঘরে। আমার পেটরায় রেখে দিয়েছি।'

'কেন? আমি এসেছি বলে? পাপী ঢুকছে বলে?'

এ কথা বললে বজরঙ্গী জবাব দিত না। ভীষণ রেগে যেত। কুন্দনের দিকে আড়ে আড়ে হৈত, জোরে জোরে চুল আঁচড়াত। একটি ঘুনসী দেওয়া পাঞ্জাবি, একটি ধুতি। পায়ের নিচটি ছে নিয়ে সে নাগরা পরত। কুন্দন আবার বলত, 'চল্, পাপীর সঙ্গেই চল্।'

দু'জনে গঙ্গার বুকে বজরায় উঠত। বজরা চলেছে, কুন্দন শুয়ে আছে ছাতে। বজরঙ্গী স আছে পাশে। হঠাৎ বজরঙ্গী বলতে শুরু করত, 'বেশ করেছি। রামায়ণ আর আমি পড়ব া।'

'কেন, গুরুজী? কেন বড় পাণ্ডা?'

'গঙ্গাতীরে বসে রামায়ণ পড়ে কি হবে?'

'কেন? স্বর্গে যাবি?'

'মালিক, তুমি তো যাবে না!'

কুন্দন উঠে বসত। ওর চুল ঝাঁকিয়ে বলত, 'যাব না! উনি নারদমুনি! উনি বাল্মীকি! সব নে-শুনে ব'সে আছেন! যাব না তো যাব না! তোর তাতে কি?'

বজরঙ্গী হাসত। বলত, 'তোমার ঠাকুর্দা, তোমার বাবা, আরো কতজন, সবাই তারা স্বর্গে বে।'

'কেন? আরে তোর শাস্ত্রজ্ঞান তো উলটো-পালটা। যা নিজে বুঝিস তাই ঠিক। কেন রে?'

'ওরা সব মণিকর্ণিকায় পুড়েছে। তুমি কোথায় মরবে, কোথায় তোমায় পোড়াব তা কি তুমি ন?'

'তোর আগে আমি মরব? দেখ, আমার হাতের গুলি দেখেছিস?

'মালিক, আমি রামায়ণ পড়লে নির্ঘাত স্বর্গে যাব। তুমি একলা পড়বে। তাই রামায়ণ রেখে লাম।'

কুন্দনের গলায় তরলতা, ওর জ্বলন্ত বিশ্বাস। কুন্দন আস্তে আস্তে থিতিয়ে যেত। ওর দিকে য়ে কুন্দনের বুকটা যেন অস্বস্তিতে কেমন করত। কত অপরাধই ক'রে চলেছে কুন্দন। ওর লবাসা নিচ্ছে, সেবা নিচ্ছে, এ অপরাধের যেন প্রায়শ্চিত্ত নেই?'

'বজরঙ্গী, তুই এসব কথা বিশ্বাস করিস?'

'বিশ্বাস করব না! মালিক, রত্নাকর দস্যু যে মানুষ মারত, পাপ করত, সে শুধু রাম নাম রই উদ্ধার হয়ে গেল। রামায়ণ পড়লে যে পুণ্য হয়, তা তুমি জান না?'

'না বজরঙ্গী, সত্যিই জানি না।'

বজরঙ্গী একটু চিন্তা করত। তারপর বলত 'তোমারও পুণ্য হচ্ছে, জান?'

'কেমন ক'রে?' বজরঙ্গী সব কিছু নিজের বুদ্ধিমতো বুঝে বুঝে ব্যাখ্যা করে, শুনতে ব মজা লাগে কুন্দনের।

'তুমি যে ঠাকুমা, মা, ভাই, সকলকে প্রতিপালন করছ!'

'আরে শালা, সে কি পুণ্য করবার জন্যে?'

'যে জন্যেই কর, করছ তো! পুণ্য তোমার হচ্ছে।'

কুন্দন তাকে একটা গালি দিত। বজরঙ্গী একটু ভেবে বলত, 'আমাকে যে প্রতিপালন করছ তাতে পুণ্য হচ্ছে না? আমাকে কোথা থেকে তুলে এনেছ। কোন্ ধুলোকাদা থেকে।'

কুন্দন একথাটা শুনলেই তাকে ধমক দিত। 'চুপ কর্, আরে গাধা, শূয়ার, উল্লুক, তুই চু কর। সেদিনের ছেলে তুই! আমার সঙ্গে কথা কইতে জোয়ান মর্দগুলো ভয়ে কাঁপে উ এসেছেন তত্ত্বকথা শেখাতে। সামনে থেকে বেরো!'

বজরঙ্গী হাসতে হাসতে বেরিয়ে যেত। কুন্দনের চাকররা বাইরে সাদা মুখে ব' থাকত। মালিকের গলায় তর্জন-গর্জন শুনে তারা ভেবে নিয়েছে বজরঙ্গী বুঝি খুন হয়ে গেছে বজরঙ্গীকে দেখে তারা বলত, 'বজরঙ্গী সাব, তুমি হাসছ?'

'যাও বাদাম আন, পেস্তা আন, শরবত বানাব।'

কুন্দনের সামনে বসে বজরঙ্গী ঘটঘট শব্দ ক'রে সিদ্ধির শরবত ঘুঁটত।

কুন্দন বজরঙ্গী, বজরঙ্গী কুন্দন। কিন্তু মাঝে মাঝে ভীম চেঁচাতে চেঁচাতে আসত, 'আ বালুলালকে নাতি। চিরঞ্জীকে বেটা, তুম কিধর হো?'

আরবি আসত, দু'জন নিগ্রো আসত। ওরা এসে ঘরে ঢুকত। যেই ঢুকত অমনি সব ফে দিয়ে বজরঙ্গী পালাত। আর তার খোঁজ নেই।

খিদিরপুরে নেই, কোথাও নেই। শ্যামনগরের বাড়ী, পোস্তার গুদাম, বড়াবাজারের গদী

কুন্দন বলত, 'মরুক গে! যেখানে খুশী চ'লে যাক্!' কিন্তু দু'দিন তিনদিন বাদে সে নিজে বেরোত। এদিকে ওদিকে খুঁজত। ভীম বলত, 'শহরে ঢোল বাজিয়ে দাও। খোঁজ পাবে।'

কুন্দন জানত কোথায় পাওয়া যাবে। কুন্দন ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরত। ঝোপ, জঙ্গ বাঁশবন, সব পেরিয়ে এক সময়ে বঁড়শে গ্রামে পৌছত।

চারিপাশে গাছপালা, বড় দীঘি।

গাড়ী রাখত কুন্দন। গ্রামের প্রৌঢ়ারা এখানে, এই বটগাছ তলায় ফুল আর বেলপাতা নি বসেই থাকে। চিনির মঠ, বাতাসা, গুড়ের সন্দেশ নিয়ে ময়রা। ন্যাংটো ছেলে খেলা করে, বৌ ঝি-রা স্নান করে। পালকি আসে, গোরুর গাড়ী আসে। অনেকদূরে দেখা যায় আকাশ-ছোঁ মস্ত কাছারিবাড়ী, নাট-মন্দির। জরাজীর্ণ, তবু দাঁড়িয়ে আছে। সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারিবাড়ী ওরা না কি একসময়ে গোটা কলকাতার জমিদার ছিল।

কুন্দন গাড়ীতে জুতো রাখে। ফুল নেয়, মিষ্টি নেয়। দ্বাদশ শিব মন্দিরের দিকে চলে বারোটি শিব মন্দির। গায়ে কেমন কারুকাজ করা ইঁট। সে মন্দিরে মন্দিরে ফুল, বেলপাত মিষ্টান্ন ও প্রণামী দিতে থাকে আর ভক্তদের লক্ষ্য করে।

জাগ্রত দেবতা। এমন জাগ্রত দেবতা যে, সায়েবরা ভুজুং ভাজুং দিয়ে নাম মাত্র টাকা ওদের কাছ থেকে কলকাতা নিয়ে নিল। তারপর অবস্থা পড়তে থাকল। শরিকে শরিকে বিভাগ মহাদেব জাগ্রত নেত্রে বসে বসে দেখছেন।

কিন্তু না। কোথাও তো দেখা যায় না। নিশ্বাস ফেলে এগিয়ে চলে কুন্দন। ক'দিন ভয়ানক রিশ্রম হয়েছে। আরবি এল, ভীম এল। তারপর দু'জনকে নিয়ে লঞ্চে ক'রে সুন্দরবন। দরবনের গহনে, মাতলা নদীর খালে জল পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ। অনেক কষ্টে চোরাই মাল, লিতী কাপড়, মদ ইত্যাদি বোঝাই নৌকোটা বাঁচানো গেছে। জাহাজের সারেং থেকে খালাসী াই হয়তো ধরা পড়বে। কি করা যায়!

কিন্তু বজরঙ্গী তো তাকে জ্বালাল। এই যে, বসে আছে নহবৎখানার নিচে। দেওয়ালে স দিয়ে, চোখ লাল, গালে জলের দাগ শুকিয়ে আছে। কুন্দন ওর হাত ধরে। হঠাৎ জরঙ্গী যেন ক্ষেপে যায়। সব ভুলে যায়। কুন্দনের হাত ধরে ঝাঁকায় আর বলে, 'কেন; কেন মি ওদের সাথে যাবে? কেন? বল তুমি আর যাবে না? আমি তিনদিন ধরে মহাদেবকে কেছি।'

সবাই অবাক। যারা কুন্দনকে চেনে, যারা চেনে না, সবাই দেখত মস্ত চৌঘুড়ির মালিক, কটি বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে আছে মাথা হেঁট ক'রে। ধুলোকাদা মাখা জামা-কাপড় পরা একটা লে তাকে বকছে, সে চুপ ক'রে শুনছে।

তারপর দু'জন ফিরে আসত।

বজরঙ্গী বলত, 'তুমি এত ভাল, তবু এমন কাজ কর কেন?'

'শালা, এ আমার ধর্ম।'

'মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা। তুমি তো লোভী নও, তবে এত টাকা আন কেন?'

'চুপ কর্।'

'মালিক, তুমি যেও না। আমার ভয় করে। এমন কাজ করতে নেই।'

কুন্দন তখন কত কথা ব'লে ওকে নরম করত, ক্ষমা চাইত।

সে সব কথা মনে পড়ল কুন্দনের।

নির্জন নিস্তব্ধ ঘর।

মালীরা বলে, 'বজরঙ্গী সাবের তো মাথার ঠিক নেই। একদিন ফিরে আসবে ঐ সারেঙ্গীটার া।'

কুন্দন মাথা নাড়ল। চার পাশে ধুলো। উড়ছে, থিতিয়ে যাচ্ছে, আবার উড়ছে।

সেই রাতটা! সেই অদ্ভুত অস্বাভাবিক রাত। কুন্দন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। অকাতরে াতে ঘুমোতে সে যেন কোন্ পরম শান্তির রাজ্যে চলে গেছে। হঠাৎ তাকে কে ধাক্কা দিল। উঠল।

লায়লী। চুল খোলা, জামা ছেঁড়া, মুখ লাল। নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। লায়লী তার বুকের র আছড়ে পড়ল।

মনে পড়ে, সব মনে পড়ে।

সে আর বজরঙ্গী। বজরঙ্গী আর সে। রাতের কলকাতা। ঘোড়ার খুরে খপখপ শব্দ। ভাঙা ঘ অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। রাতটাকে ভূতে পেয়েছে।

বজরঙ্গী তার সামনে। মাথা নিচু ক'রে বসে আছে! কিছু বলছে না। কুন্দন শুধু নিজের র ওপর হাতটা ঘষছে। বলছে 'তুই! বজরঙ্গী, তুই!'

জলঘরের পেছনে সুড়ঙ্গে সেদিন কি বাতাস। ঝড়ের বাতাস। সমুদ্র থেকে সাইক্লোন এল। কলকাতার পথে গাছপালা ভাঙল। গঙ্গা উছলে স্ট্র্যাণ্ড অবধি এল।

জলঘরের বড় বড় জালার পাশ থেকে সাপ স'রে যাচ্ছে।

'মালিক, তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

কথার জবাব নেই। দোর খোলা হলো। ঝোড়ো বাতাস সে সুড়ঙ্গে ঢুকে মাতামাতি লাগিয়ে দিল। গোঁ গোঁ, সোঁ সোঁ। কারা যেন গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকল।

সে আর বজরঙ্গী। মুখোমুখি।

'দেখ্ বজরঙ্গী, আজ সৃষ্টির শেষ দিন। আকাশপানে দেখ্। চন্দ্রগ্রহণ। চাঁদ লাল হয়ে গেছে!'

'মালিক! মেরে মালিক!'

বিছুয়ার মুঠটা বাইরে ছিল, ইস্পাতটা পাঁজরে। মাতালের মতো টলে উঠল বজরঙ্গী। তারপর সেই সময়ে তার গলায় কি অসীম অপার ভালবাসা ঝরে পড়ল। যেন সকল ভালবাসা দিয়ে দুটি নাম রচনা করল বজরঙ্গী। যেন সে নাম বলতে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে এমনি ক'রে অস্ফুটে বলল, 'আমার মালিক! আমার মুন্নি! মেহেরবান মালিক আমার!'

তারপর মেঘ এসে গ্রহণের চাঁদকে ঢেকে ফেলল। এক নিমেষের জন্যে যেন সৃষ্টি ও স্থিতি একাকার ক'রে প্রলয়ের আঁধার নামল।

তারপর। তারপর আর কিছু নেই। কুন্দনের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড আগুনরাঙা লোহার শিক দিয়ে কে যেন দুটি চোখের চাহনি দেগে দিল। সে চোখে আকাশের ছায়া। সে চোখে মাটির মমতা।

কুন্দন উঠল।

দু' চোখ অশ্রুতে অন্ধ। সে দরজা দেখতে পাচ্ছে না। 'বেইমান, বেইমান, বেইমান!' অন্ধ অভিমানে গালি দিতে দিতে সে বেরিয়ে এল।

॥ তেরো ॥

নিসারকে দেখে কুন্দন অবাক।

নিসারকে খুঁজতে সে মেটিয়াবুরুজে গিয়েছিল। শোনা গেল নিসার সেখানে নেই। লালাবাজারে পিয়ারে সাহেব একটি বাসা নিয়েছেন। সেখানে নিসার এসেছে। নিসারের মা এসেছেন।

কুন্দন সেখানেই গেল।

নিচতলাটি আঁধার। চীনে কাঠ-মিস্ত্রীরা কাজ করছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই খুব ভাল লাগে। মস্ত বড় খোলা ছাত। বড় বড় ঘর। ঘরের দরজায় পর্দা। দাসীরা পর্দার আড়ালে সরে যেতে থাকল। একজন ছুটে এল হাত তুলে, 'রুখ জাইয়ে, রুখ জাইয়ে।'

নিসারকে চাই শুনে পর্দার আড়াল থেকে একজন মহিলা ক্ষীণস্বরে বললেন, 'ছাতে নিয়ে যাও সাহেবকে।' সম্ভবত নিসারের মা।

ছাতে বসে ছিল নিসার।

বর্ষার দিন। মেঘ নেই। রোদ চড়া। ছাতের একপাশে টবের বাগান। বড় বড় বালতি ও টিনে মাটি ফেলে জুঁই ও ঝুমকোলতার গাছ বোনা হয়েছে। ঘন সবুজ লতা। চেরা বাঁশের জাফরি ধনুকের মতো বাঁকানো। তার নিচে বসে আছে নিসার।

শীর্ণ দেহ। পরিষ্কার জামা-কাপড়। চুল বড় বড়। কোমল দাড়ি ও গোঁফে মুখটি ঢাকা। নিসারের চেহারায় বেশ তপস্বী তপস্বী ভাব। তার ব্যবহারটি আরো বিস্ময়কর। সে পায়রাকে দানা ও মটর খাওয়াচ্ছে। একটি চাকর পাশে দাঁড়িয়ে।

'আরে নিসার, ভেল পলট্ লিয়া?'

'চুপ চুপ।' নিসার ঠোঁটে আঙুল তুলল। চাকরকে বলল 'কুর্সী আন্।'

কুন্দনকে বলল, 'রোজ পাখীকে খাবার দিতে হয়, ফকিরকে পয়সা ও খাবার। মা পুণ্য করাচ্ছেন।'

'কেন?'

'মরে যাব ব'লে। কুন্দন, এরা আমাকে বাচ্চা বানিয়ে ফেলেছে। জান, এখন আমি রোজ স্নান করি?'

'বল কি?'

'হ্যাঁ। দু'বার। মাংস খেতে দেয় না আমায়। শুধু দুধ আর ফল। কুন্দন, আমি আর বাঁচব না।'

'কেন, ভালই তো আছ। বেশ কথাটথা কইছ। আমি শুনেছিলাম গলার স্বর সরে না!'

'না। একটু ভাল আছি। কিন্তু বাঁচব না তো! জান, মা কেন এসেছেন?'

'কেন?'

'এখান থেকে আমায় নিয়ে যাবেন মুর্শিদাবাদ। সেখানে নাকি মস্ত বড় কোন্ ফকির আছেন, তার ওষুধ অব্যর্থ।'

'ভালই তো!'

নিসার হাসল। বলল, 'তোমায় দেখে খুব ভাল লাগছে। ওরা কেমন আছে?'

'কারা?'

'এই শিরীনরা।'

'শিরীন ভালই আছে! তুমি আসবে সে কথা তো সে বলল।'

'জানি, আমার খবর রাখে।'

'নিসার, তুমি একদিন খিদিরপুরে আসবে? চলাফেরা করতে পার? গাড়ী পাঠিয়ে দেব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলাফেরা করতে পারি। কিন্তু কেন যেতে বলছ? হঠাৎ নিসার সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। বলল, 'একসময়ে অনেক টাকা পয়সা দিয়েছ। ফেরত চাইবে না তো? আমাদের অবস্থা কিন্তু ফোঁপরা। এই চাকরদাসী যা দেখছ শুধু মা-র জন্যে। মা-র পুরনো দিনের অভ্যেস। চাল বদলাতে পারেন না।'

'না। টাকা চাইব না।'

কুন্দন নেমে এল। আসবার সময়ে দেখল বলিষ্ঠদেহ এক প্রৌঢ় পুরুষ উঠে আসছেন সিঁড়ি দিয়ে। কুন্দনকে নীরবে অভিবাদন জানালেন। কুন্দন টুপিটি ছুঁল এবং নেমে এল। প্রৌঢ়

পুরুষটির পরিধানে নীল পাঞ্জাবি এবং সাদা চিপা। সম্ভবত উনিই পিয়ারে সাহেব। লায়লীর বড়ে ভাই।

নিসার এল।

বলল, 'আমার কাছে তুমি লায়লীর কথা শুনবে?' সে একটু সময়ের জন্যে চিন্তামগ্ন হলো। তারপর বলল, 'লায়লী নেই, বজরঙ্গী নেই, এ বাড়ীতে একা একা আছ কি ক'রে?'

'এ বাড়ীতে তো থাকি না।'

'আস তো! ভাল লাগে?'

কুন্দন জবাব দিল না। একটু ঝুঁকে পড়ে কার্পেটের ওপর কিসের দাগ পড়েছে তা দেখল। নিসার বলল, 'বুঝেছি।'

'কি?'

'হঠাৎ মনপ্রাণের হিসেব মেলাতে ব'সে সব গোলমাল ক'রে ফেলছ।'

'না নিসার।'

নিসার হঠাৎ নিজের কথা বলতে শুরু করে। 'বড়ে ভাইকে বলেছিলাম এবার আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আর ক'দিনই বা বাঁচব? লক্ষ্ণৌ-এর বাড়ীতে একটি কোণে পড়ে থাকি। তা শুনল না। ওর ভয় আমি হয়তো রোগের জ্বালায় বিষ খাব বা বর্ষায় গোমতীতে ঝাঁপ দেব। আমার সে সাহসই নেই। তা বোঝে না।'

তারপর কুন্দনকে বলে, 'কুন্দন, তুমি বড় বোকা।'

'কেন?'

'তখন চলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি তোমার। কেন চলে গেলে? তুমি না চলে গেলে হয়তো লায়লী অমন করত না।'

'নিসার, লায়লীর নিয়তি ঐ। আমি কি তাকে বাঁচাতে পারতাম? তা কি কেউ পারে?'

'তখন আমি ফিরে যাব ঠিক করেছি। গিয়েছিলাম, আবার এসেছি, আবার যাব। হঠাৎ একদিন লায়লী এল। বলল, আমার সঙ্গে চল ছোটে ভাই। আমার মনে বড় অশান্তি। আমি বললাম কি হয়েছে? ও বলল কুন্দন চলে গেছে।'

তখন লায়লী দিন নেই রাত নেই ফুর্তি করে। ও বাড়ীতে আলো জ্বলে, উৎসব হয়। লায়লী চাকরদের বাজারে পাঠায়। বলে, 'বাতি কিনে আন। ফানুস আন।

ঘরে ঘরে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে। দেয়ালের কোণে, সিঁড়িতে বাতি। রোজ বাড়ী আলো দিয়ে সাজানো হয়। দেওয়ালির মতো। বাগানের গাছে গাছে চীনেলণ্ঠন। কোথাও একটু আঁধার দেখলেই লায়লী বলে, 'ঐ যে আঁধার! আলো জ্বেলে দে!'

বলে, 'কাঠের ভুসো কিনে আন। তাতে কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দে। খুব দাউদাউ ক'রে জ্বলবে।'

গহর, পান্নাবাঈ, আখতার, শিরীন, আয়েষা, সকলের বাড়ীতে গাড়ী পাঠায়। সন্ধ্যে হলেই জলসা, সন্ধ্যে হলেই লোকজন।

সকলকে বলে, 'কুন্দন যে কেন গেল! কবে যে আসবে!'

সবাই বলে, 'লায়লী, এতদিনে তবে তোমার মন কেউ পেল?'

'হ্যাঁ। কুন্দনকে যে ভালবাসি আমি। জান না?'

ওর দাসী বলে, 'জানি নে। এরা চলে গেলেই মালকিন একা একা ছাতে ঘোরে। একা একা াগানে ঘোরে।'

'লায়লী, তখন আঁধার দেখে ভয় পাও না?'

'না। কখনো আলো ভাল লাগে। কখনও আঁধার। কিন্তু সে সব কথা কেন? গান গাও।'

গান, নাচ, ফুর্তি, বাজী পোড়ানো। এক একদিনে এক এক রকম পোশাক। কোনদিন শখ রে ঢাকাই শাড়ী, সোনার গহনা।

'দেখ দেখ, নতুন সাজ দেখ লায়লীর।'

'লায়লী, এত সাজ কাকে দেখাচ্ছ?'

'আয়নাকে দেখাচ্ছি। আমার আয়নাকে।'

কিন্তু তবু লায়লী একদিন নিসারকে কাছে ডাকল। নিসার বলে, 'ও আমার হাত ধরল। ঠাণ্ডা ়ত, যেন সাদা পাথরের হাত। বলল আমি শান্তি পাচ্ছি না। আমি বললাম লায়লী, আমি একটা ়তভাগা মাতাল। আমি তোমায় কি বলব? ও বলল শোন, আমার কথা শোন। কুন্দন, তুমি তা জান ও তোমাকে নিজের ভাইয়ের মতোই দেখত!'

'জানি।'

'আমায় বকত, শাসন করত। সেদিন ও কাঁদতে লাগল। কুন্দন, আমার কষ্ট হচ্ছিল, আমি বাকও হলাম। কে জানত ও একদিন চোখের জল ফেলবে! ও তো কাঁদত না। ওর মা ওর চাখে কোনদিন জল দেখেনি। কুন্দন, তুমি লায়লীর ছোটবেলার কথা কিছুই জান না, তাই না?

'না।'

লায়লীর ছোটবেলা। কুন্দন কেমন ক'রে জানবে? লায়লী মানেই যেন যৌবন। হাতির াতের মতো রঙ, ধপধপে সাদা গাড়ারা, সাদা জামা, হালকা নীল শাড়ী। পায়ে নাগরা। মাথায় াকরাশ কালো চুল।

'কুন্দন পায়রা এনে দাও।'

ভাল লাগল, একসঙ্গে একশো পায়রা কিনল। ভাল লাগল না, সবগুলোই উড়িয়ে দিল। স্থির, চঞ্চল, প্রগল্ভ। আবার কখনো গম্ভীর।

কখনো কুন্দনকে পাশে বসিয়েছে। কাঁচের বাটিতে জল রেখে কাঠি দিয়ে বাজিয়েছে। ালেছে, 'শোন কি সুন্দর বাজনা!' কখনো ধুমধাম ক'রে বেড়ালের বিয়ে দিয়েছে। নহবৎ াজিয়ে, বাজি পুড়িয়ে। আবার কখনো চুপ ক'রে বসে থেকেছে। বলেছে, 'এস কুন্দন, বসো, দখ দেখ, ঐ মেঘটা কেমন রং বদলাচ্ছে।

একটির পর একটি খেয়াল। যখন যা খুশী তাই। না। হয়তো লায়লীকে ভরা যৌবনে দখেছে সে জন্যেই কুন্দন ওর শৈশব কল্পনায় আনতে পারে না।

কুন্দন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বলল, 'ওর ছোটবেলার কথা ও বলত না। ও একদিন ধু বলেছিল জান, এ ভালই হয়েছে।'

'কি ভাল হয়েছে লায়লী?' কুন্দন শুধিয়েছিল।

'এই যে ভগবান আমাকে সংসার দেয়নি, সন্তান দেয়নি।'

'তাতে ভালটা কি হলো?'

লায়লী কুন্দনের কোলে মাথা রেখে ছাতে শুয়েছিল। লায়লী বলে, 'দেখ, আমার যদি সে সব পাবার কপাল হ'ত ভগবান আমায় অন্য ঘরে পাঠিয়ে দিত। তা তো দেয়নি!'

'দেয়নি ভালই হয়েছে। তবে কি আর আমি তোমাকে দেখতে পেতাম?'

'তোমার ঘরেও তো যেতে পারতাম!'

'কি যে বল! তাহ'লে নাকনাড়া দিতে। বলতে তোমায় ভালবাসি না।'

লায়লী সহসা হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'কথাটা উলটো বললে। তখন আমি তোমায় সহজেই ভালবাসতাম। কোন বিচারই মনে আসত না।'

'সে কি?'

'তখন তুমি স্বামী হতে তো! স্বামীকে কি বিচার ক'রে ভালবাসে কেউ? এমনিই ভালবাসে।'

'এত কথা জানলে কি ক'রে?'

'সে কথা থাক কুন্দন। আমি বলছিলাম আমার মতো যারা, তাদের সন্তান না হওয়াই ভাল।'

'কেন?'

'কেন?' হঠাৎ লায়লী রেগে যায়। ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'তারা সন্তানদের ভালবাসতে পারে না। তাদের সন্তানরা একা একা মনের দুঃখে মানুষ হয়।'

'তুমিও তো একজনের সন্তান।'

'ইস!' লায়লী কুন্দনের গালে আঙুল বোলায়। বলে, 'আমি কোনদিনই ছোট ছিলাম না। আমি চিরদিনই এমন বড়টি ছিলাম। ভগবান আমায় এমনি ক'রে গড়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়। জানলে?'

নিসার বলল, 'জান কুন্দন, ছোটবেলা ও অন্যরকম ছিল। আমি আর ও একবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাই, তখন আমরা খুব ছোট। শহরে জিপসীরা এসেছে। সবাই বললে ছেলে ধরে, ওরা ছেলেধরা। আমি আর লায়লী ঠিক করলাম যেতে হবে, দেখতে হবে। দুপুরবেলা পালিয়ে গেলাম দুজনে।

'গিয়ে দেখি ওরা দিব্যি সংসার পেতে বসেছে। বড় বড় গাছের ডালে দোলনা ঝুলছে, তাতে কচি ছেলে শোয়ানো। নিচে রান্না হচ্ছে, গাছের ডাল ভেঙে মাটি ঝাড়ু দিচ্ছে কেউ। শেকল বাঁধা বাঁদর ছানা চোখ মিটমিট করে। একটা বুড়ী বসে একমাথা জট নেড়ে নেড়ে কি যেন বকছে।

'ওরা আমাকে আর লায়লীকে খুব ভোলায়। বলে আমরা দু'দিন থাকব। যাবার দিন এসো। যা চাও তাই দেব। এই বাঁদরটা, ঐ কুকুরটা। সবুজ একটা টিয়াপাখী দেব, একটা হরিণের শিং।

'আমরা গিয়েছিলাম। লায়লী আর আমি। কিন্তু বড়ে ভাইকে কে যেন বলে দেয় ওরা উটের পিঠে বোঝা চাপাচ্ছে আমরা দু'জন সেখানে। বড়ে ভাই কে'কজন নিয়ে গেল। কি মারটাই না মারলে জোয়ান জোয়ান পুরুষদের। ওরা না কি আমাদের নির্ঘাত ধ'রে নিয়ে যেত। হয় বেচে দিত নয় আরো কিছু! ওরা বড় নিষ্ঠুর। নিজেদের ছেলেপুলেকেও ওরা স্বচ্ছন্দে বেচে দেয়। মায়া-দয়া বলতে কিছু নেই ওদের।

'আমি ভীতু ছিলাম। ভ্যাঁ ভ্যাঁ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এলাম। লায়লী আমার দাদাকে ḳ বললে না। আমার মা-র কাছে গিয়ে তার সে কি চোটপাট, বেশ করেছি গিয়েছি। তোমার জর ছেলেকে মার। মা বললে হ্যাঁ রে, তোর বিচার তো ভাল? আমার ছেলেকে মারব? কে মারব না? কেন রে? তা ও কি বললে জান?

'ও বললে ছোটো ভাইয়ের তো তুমি আছ। তুমি কত ভাল মা। তুমি থাকতে ও কেন াতে গেছল? আমি পালাব বেশ করব।

'কেন রে? মা আবার শুধোয়। ও অম্লান বদনে বললে, আমার মা শুধু নিজেকে ভালবাসে। াকে ভালবাসে না। অথচ আমরা জানি মেহরুন্ন ওকে কি ভালই না বাসত! ও চোখের ঢ়াল হ'লে খুঁজতে আসত এ-বাড়ী সে-বাড়ী।'

॥ চৌদ্দ ॥

মেহরুন্ন ছিল লক্ষ্ণৌ-এর নামী বাঈজী।

বেগমকোঠির কাছে তার বাড়ী। সাদা রঙের দোতলা বাড়ী, সামনে টানাবারান্দা। তে সবুজ রঙের ঝিলমিল লাগনো। বাড়ীটা দেখতে বড় সুন্দর। বছর বছর রাজমিস্ত্রী গে। কলি ফেরানো হয়, দরজা জানলায় রঙ পড়ে। ছাতে একটা বাঁশের ডগায় একটা া, একটা হাঁড়ি, একটা চট। দেখতে খানিকটা বিসদৃশ কিন্তু ঈদ বা মহরমের দিনও ঁ নামাবার জো নেই। মেহরুন্নের মা তখনই পালকি ডাকিয়ে বাড়ী থেকে রওনা বে।

মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে নয়। প্রাণের ভয়ে। বুড়ীর মৃত্যুকে বড় ভয়। সে দিন নেই রাত ই রাজ্যের তুকতাক নিয়ে আছে। বাড়ীতে যেখানে সেখানে কোথাও একটি কাঠের পুতুল, াথাও একটি টিনের কৌটো, ভাঙা শেকল, ছুরির ফলা হাতে তৈরী খড়-পোরা পাখী, এ সব খা যাবে। কোনটি ঝুলছে, কোনটি সযত্নে রক্ষিত।

ওগুলোর মানে কি কেউ জানে না। তবে ছাতের বাঁশ, ঝাঁটা হাঁড়ি এবং চট ঝড়-বিষ্টির হাত ়াবার জন্যে। বাজ পড়লে যেন ঐ হাঁড়িতে ঢোকে, বিষ্টি এলে ঐ চটে বসে। ঝড় এলে যেন ঝাঁটা দেখে ছুটে পালায়। বুড়ী না কি বে-পাড়ার কোন হিন্দু রাজমিস্ত্রীকে ডেকে ঐ তুকতাক খে নিয়েছে।

বুড়ী সারাদিন তুকতাক মন্তরতন্তর নিয়েই থাকে। বয়স সত্তর, আশি না একশো তা ধরবার ায় নেই, ধবধবে রঙ। ফুরফুরে সাদা চুল, ভুরু, চোখের পাতা। হাতের ও মুখের চামড়ার ার 'পরে ফুটফুট ছোট অস্পষ্ট তিলের মতো অসংখ্য দাগ। মাথার চুলগুলো ঝুঁটি বাঁধা। নে একটা সাদা ঢিলে পোশাক। ফাঁপানো হাতা ব্লাউজ, খুব ফোলানো ঘাগরা। চোখ দুটো কবারে কটা। বুড়ী থেকে থেকে মেহরুন্নকে চিনতে পারে না, লায়লীকে চিনতে পারে না, কে 'মার্গারেট! ক্লদ!'

তখন দাসীরা ছুটে যায়। মেহরুন্নের সামনে দাঁড়ায় অভিবাদন ক'রে। বলে, 'বুড়ী আম্মা বার ইমলি হয়ে গেছে।'

মেহরুন্ন ছুটতে ছুটতে আসে। মাকে ঘরের ভেতর নিয়ে যায়। বলে, 'চুপ, আম্মা চু করুন।'

'না না। আমি ওদের চাই। ওদের ডাক্।'

'কাকে আম্মা?'

'মার্গারেট, ক্লদ্!'

মেহরুন্ন ঠোঁট কামড়ায়। বলে, 'আম্মা, দেখুন, আমি যে মেহরুন্ন!'

তখন বুড়ীর চোখ কোমল হ'য়ে আসে. 'তাই তো তাই তো, তুই তো মেহরুন্ন-ই! মেহরু আমার মোয়াজ্জেম-এর মেয়ে।'

'হ্যাঁ আম্মা!' মেহরুন্ন আশ্বস্ত হয়।

'কিন্তু ক্লদ কোথায়? ক্লদ? মার্গারেট?' তারপর বুড়ী অল্প অল্প দোলে। মনে পড়েছে ত সে চোখ বুজে কি যেন ভাবে। বলে, 'মেহরুন্ন, তুই মোমবাতি পাঠাস? ফুল পাঠাস?'

'চুপ করুন আম্মা, চুপ করুন!'

'বল্, পাঠাস তো?'

'পাঠাই আম্মা!'

আবার এক একদিন সে ঘরে ব'সে বালিশ ছিঁড়তে থাকে। তুলো ওড়ায় ঘরের ম আয়না ভাঙে জিনিসপত্র ছোঁড়ে। তখন মেহরুন্ন ছুটে আসে, ঈশ্বরলাল আসেন। দাসদ চাকর-বাকর সবাই আসে।

বুড়ী আম্মাকে সবাই চেপে ধরে। সে চেঁচাতে থাকে, 'টিপু নেই, মাইশোর টাইগার ডে পিয়ের নেই। তোরা আমাকে ক্লদের কাছে যেতে দে!'

ওরা তার দু'হাত ধরে থাকে শক্ত ক'রে। ও হঠাৎ এদিক ওদিকে ঘাড় ঘোড়ায়। বলে, ' যাও। ক্লদ্ আসছে, ক্লদ্ লা মার্তিন।'

বলে, 'হ্যাঁ ক্লদ্ হ্যাঁ। পিয়েরের বন্ধু তুমি, তুমি এমিলিকে আশ্রয় দেবে।'

সবাই হাসে। মেহরুন্ন তখন জোর ক'রে বুড়ীকে ভেতরের ঘরে নিয়ে যায়। দোর বন্ধ ক দেয়। বলে, 'থাক, বন্ধ হ'য়ে থাক। একা একা চেঁচাক, মাথার গরম নামবে।'

বিকেল বেলা দোর খুলে দেখে বুড়ী চুপ ক'রে বসে আছে। খুব কান্নাকাটি হ ইতিমধ্যে, সামনে লায়লী বসে আছে। স্নানঘরের দোর দিয়ে ঢুকেছে নিশ্চয়। আলবো তামাক সাজা। বুড়ীর হাতে নল।

বুড়ী বলে, 'মেহরুন্ন এদিকে আয়।'

মেহরুন্নের এখনো মাকে দেখলে ভয় করে। মাঝে মাঝে। বুড়ী বলে, 'তোর সঙ্গে আ কথা আছে। শোন্, মাঝে মাঝে আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। তোকে মনে থাকে না। তুই মার্তিনদের বাড়ী লোক পাঠা তো! আমি সাক্ষী চাই, উইল করব।'

কপালে করাঘাত করে। বলে, 'আম্মা গো, আপনি সব ভুলে যাচ্ছেন। ওঁদের বাড় সায়েবদের ইস্কুল হয়েছে না? ওঁরা কোথায়!'

'ওরা কোথায়?'

'মারা গেছেন।'

'পিয়ের কোথায়?'

'সেরিঙ্গাপত্তমে আম্মা!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। সেরিঙ্গাপত্তম, সেরিঙ্গাপত্তম! পিয়েরকে ওরা কবর দিয়েছিল?'

'তাই তো শুনেছি।'

'ক্লদ?'

'ক্লদ আসাই-এ আম্মা।'

'আসাই, আসাই-এ কেন?'

'ক্লদ যে সিন্ধিয়াদের কমাণ্ডার ছিল আম্মা!'

'ছিল, ছিল কেন?'

'আসাই। ঔরঙ্গাবাদের উত্তরে আম্মা। আপনি যে বলেন যুদ্ধ হয়েছিল!'

'তাই তো!' বুড়ী খুব মন দিয়ে নল টানে। তারপর চিন্তিত মুখ তুলে বলে, 'হ্যাঁ রে ক্লদকে ওরা কবর দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ আম্মা।'

'কি লিখে দিয়েছিল রে? ক্লদ মোরাঁ, পিয়ের মোরাঁর ছেলে—'

সিন্ধিয়ার ক্যাভেল্‌রিতে কমাণ্ডার'—

'বয়স একুশ, সাহসের সঙ্গে'—

'যুদ্ধ করতে করতে কর্তব্যরত অবস্থায়'—

'প্রাণ বিসর্জন।'

'প্রাণ বিসর্জন।'

'দাই উইল বী ডান।'

'বী ডান!'

হঠাৎ বুড়ী ককিয়ে কেঁদে ওঠে। ফুলে ফুলে কাঁদে। বলে, 'ওরা লাতিনে লিখল না, ফরাসীতে লিখল না। ওরা ইংরেজীতে লিখল।' মেহরুন্ন চুপ ক'রে থাকে।

'ইংরেজদের আমি চাই না চাই না। পিয়েরকে ওরা সেরিঙ্গাপত্তমে মারলে, ক্লদকে আসাই-এ।'

'আম্মা, ও সব কথা ভুলে যান।'

'মেহরুন্ন তুই জানিস না। তখন মার্গারেট ছোট্ট মেয়ে। এই এতটুকু।' হাত দিয়ে দেখায় বুড়ী, তারপব বলে, 'লা মার্তিনরা বড় ভদ্রলোক ছিল রে। ক্লদের নাম ওরাই দেয়। লা মার্তিন যে ক্লদের ধর্মবাপ হলো কি না! ক্লদ মরতে আমি বিপদে পড়লাম। তখন তোর বাবা আমায় টপ ক'রে বিয়ে ক'রে নিলে।' সে নলটা রেখে উঠে আসে। বলে, 'দাঁড়া না, যাব আমি নবাববাড়ী। বলব মোয়াজ্জেম তো তোমাদের বংশেরই এক ছেলে! তা ক্রীশ্চান মেমসায়েব বিয়ে করেছে বলে তার মেয়েকে বাপের জা'গীর দেবে না? দাঁড়া না মামলা করব আমি।'

বলে, 'ইস, আমি কি পুরো মেমসায়েব? আমার মা তো কাশ্মীরি মেয়ে।'

এক একদিন আবার কিছুই মনে পড়ে না বুড়ীর। সে ক্লদকে খোঁজে, পিয়েরকে খোঁজে। মার্গারেটকে খোঁজে। দাসীদের মারতে যায়। বলে, 'ইমলি, ইমলি, ইমলি! ইমলি তোরা খাস! তোরা কিচমিচ ক'রে কথা বলিস। তোরা ইমলি খাস। আমার নাম এমিলি। এমিলি মোরিয়া।'

সব ভুলে যায় বুড়ী। হতাশ হয়ে কাঁদতে বসে মেহরুন। কে ওকে মনে করিয়ে দেবে মাইশোর টাইগার টিপু সুলতানের প্রিয় ফরাসী গোলন্দাজ অফিসার পিয়ের মোঁরা ১৭৯৯ সালে সেরিঙ্গাপত্তমে মারা গেছে সেই কবে! থেকে থেকে সব ভুলে যায় বুড়ী।

ভুলে যায় সে পিয়ের-এর ছেলে ক্লদ মরে গেছে আসাই-এ, ১৮০৩ সালে। ক্লদের বোন মার্গারেট এক ফরাসী ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে। কটকে থাকত সে। সেখানেই মারা যায়।

ভুলে যায় মেহরুনের এ সব জানবার কথা নয়। মাঝে মাঝে মেহরুনের বলতে ইচ্ছে করে, 'আমি মেহরুন। আমার বাবা মোয়াজ্জেম আলি বখ্‌ত। অযোধ্যার নবাববাড়ীর এক জ্ঞাতির ছেলে। বাবাকে তুমি বিয়ে করলে ১৮০৬ সালে। ১৮০৮ সালে আমি হলাম। এখন ১৮৪৭ সাল আম্মা। আমার বয়স উনচল্লিশ হলো। আর অনেক সাধনায় যাকে পেয়েছি, ঐ আমার সেই মেয়ে। মোটে সাতবছর বয়স।'

কিছুই বলতে পারে না। কেন না তখনি তার মা ফিসফিস ক'রে বলে, 'ওটা কিরে?'

'আপনার খাবার আম্মা।'

অনুতপ্ত মেহরুন টেবিল টেনে আনে। আতপ চালের নরম পিলাউ, মাংসের ক্বাথ, ফিরনি। বলে, 'আমি খাইয়ে দেব?'

'এ কি রে মেহরুন?'

'পিলাউ আম্মা! আপনি যে ভালবাসেন সাদা পিলাউ।'

'ও কি, মটরশুঁটি, মাংস, ডিমের টুকরো!'

'হ্যাঁ আম্মা।'

তখন বুড়ী সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চোখ দুটো আবার ঘুরতে থাকে। এর মুখ থেকে তার মুখে। বলে, 'না মার্গারেট, না সোনামণি, এ সব বিলাসিতা আমাদের শোভা পায় না। ভুলে যেও না তোমার বাবা টিপুর জন্যেই যুদ্ধ করতে করতে মারা যান! নবাব তাঁকে একদা প্রচুর মোহর ও মুক্তো দিয়েছিলেন। এখন সেই নবাবের ছেলেরাই কলকাতায় কয়েদ। আহা কলকাতার জল নরম। আহা সে দেশে তাদের কত কষ্ট হচ্ছে। আমরা, অন্তত তাদের কথা মনে করে-ও এ সব বিলাসিতা করব না!'

গম্ভীরভাবে বুড়ী টেবিল থেকে হাত তুলে নেয়। গলায় হাত দিয়ে কি যেন খোঁজে। বোধ হয় চেনে বাঁধা ক্রুশটা-ই। তারপর দুলে দুলে বলে, তাঁহাকে আমি সেবা করি। তাঁহার নাম হৃদয়ে লই। একটি রুটি ও একটু লবণ আমার খাদ্য হউক, খাদ্য হউক।'

দাসীরা মজা দেখে। লায়লী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ফুঁসতে ফুঁসতে বাইরে চলে যায় মেহরুন। বলে, 'আমাকে সকলের কাছে অপদস্থ করাই ওঁর কাজ।'

ঈশ্বরলাল হাসেন। বলেন, 'ধৈর্য ধর মেহরুন, ক্ষমা কর ওঁকে। বয়স আশি হয়েছে। এ জীবনে শোকতাপ তো কম পেলেন না! তাই সব ভুলে যান।'

মেহরুন বলে, 'আমার কথা তো বলেন না। বাবার কথা বলেন না। অথচ বাবা ওঁর জন্যে কত কষ্টই না করেছেন!'

'মেহরুন, তোমার বাবাকে যখন উনি বিয়ে করেন তার আগে জীবনের ভাল সময়গুলো ওঁর কেটে গেছে। প্রেম, ভালবাসা, সন্তান—সব পেলেন, সব হারালেন। তোমার বাবার প্রতি ওঁর কৃতজ্ঞতা থাকতে পারে, ভালবাসা কেমন ক'রে থাকবে?'

মেহরুন্ন বোঝে না। মেহরুন্ন বোঝেনি। কিন্তু লায়লী বুঝেছিল। অনেক পরে। সে যখন বড় তখন।

মেহরুন্ন ঈশ্বরলালকে বলেছে, 'এত তুকতাক, এত মন্তরতন্তর, ক্রীশ্চানরা কি তা করে?'

'মেহরুন্ন, তুমি মনটা একটু বড় কর তো'!

'বাঃ, খুব কড়াকথাটা বললে!'

'শোন, আমার কথা শোন! ওঁকে তোমার আমার মাপকাঠিতে বিচার করলে ভুল হবে। ওঁর বাবা সেই বাংলাদেশের নবাব সিরাজদৌল্লার দলে ছিলেন। পরে এসে হায়দার আলীর দলে যোগ দেন। প্রথম স্বামী ছিলেন টিপুর দলে।

'কত জায়গায় থেকেছেন, ঘুরেছেন। কত দেশ, কত রকম অবস্থা। অর্ধেক রক্ত দেশী, বাকিটা ক্যাথলিক। খালি যুদ্ধ বিগ্রহ করে যারা তারা কি লেখাপড়া শিখতে পায়? নানা জায়গায় থাকতে থাকতে, নানা মানুষের সঙ্গে মিশতে মিশতে ঐ সব সংস্কার, বিশ্বাস ওঁর ভেতরে ঢুকে গিয়েছে। করলেই বা তুকতাক! যা ইচ্ছে করুন। ক'রে সুখে থাকুন।'

তবু মেহরুন্নের ধৈর্য থাকে না। সে একদিন বলে, 'এখন আবার সান্ত্বনা দেন মামলা ক'রে জা'গীর আনবেন! মামলা ক'রে তো সবই খুইয়েছেন!'

ঈশ্বরলালের মুখের ওপর দিয়ে একটা ছায়া ত্বরিতে ভেসে চলে যায়। তিনি বলেন, 'তোমার তো কোন অভাব নেই! আর টাকাপয়সা বোধ হয় যত থাকে ততই অশান্তি বাড়ে।'

'কি যে বল!'

মেহরুন্ন অবাক হয়ে চায় ঈশ্বরলালের দিকে। বলে, 'টাকা থাকলে অশান্তি হয় কে বলেছে? আমার যখন যা এসেছে আমি একটি টাকাও নষ্ট করিনি। সব সুদে খাটিয়ে খাটিয়ে এখন দেখ কোন অভাব নেই। টাকাকে হেনস্থা করতে আছে?'

ঈশ্বরলাল হাসেন। বলেন, 'তোমার বয়সটাই বেড়েছে। বুদ্ধিশুদ্ধি বাড়েনি মেহরুন্ন।'

লায়লীর বুড়ী দাদীকে খুব মনে পড়ে।

বুড়ী দাদী ওকে মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে যায় নিজের ঘরে। বলে, 'মার্গারেট! তুই বড় হবি না? তুই যদি ছোটটি থাকবি তবে আমি কার সঙ্গে কথা কইব?'

'বুড়ী দাদী, আমি মুন্নি, আপনার নাতনী।'

'ও তাই তো!'

বুড়ী হেসে ফেলে। বলে, 'শোন্, তোর মা-কে যেন বলিসনে আমি তোকে মার্গারেট বলেছি!'

'না না! মা-কে আমি কোন কথা বলি না!'

'হ্যাঁ রে, তুই বাড়ীর বাইরে যাস?'

'কেন বলুন তো?'

বুড়ী ফিসফিস ক'রে বলে, 'যদি যাস, তবে বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখে আসবি ছাতে সে বাঁশটা আছে কি না?'

'কেন বুড়ী দাদী, আমি তো সিঁড়ি দিয়েই ছাতে যেতে পারি।' বলতেই বুড়ী ওকে ফোক মুখে চুমো খায়। বলে, 'না না। ছাতে একা একা যাসনে। হয়তো একটা খারাপ বাতাস লে যাবে।'

'তা কি হয়?'

'নিশ্চয়।'

বুড়ী দাদী ওকে ফিসফিস ক'রে অনেক গল্প করে। মাঝে মাঝে বুড়ী দাদীকে ধ'রে নি দাসীরা নাওয়াতে যায়। বুড়ী দাদীর হাতে ও পায়ে গাঁটে গাঁটে ব্যথা, পায়ের গোছা ফোলা লায়লী দেখেছে টিপলে টোল পড়ে। সেখানে ব্যথা করে। দাদীর নিজের দাসী হায়দ্রাবাদে মুসলমানী। মোটা, বলিষ্ঠ, কালো রঙ, প্রৌঢ় বয়স। সে এ-বাড়ীর হেকিমও বটে। অসুখবিসু সে-ই চিকিৎসা করে।

সে বলে ঐ পায়ের গোছায় জোঁক বসালে বদরক্ত বেরিয়ে যাবে। শুনলেই বুড়ী দা চেঁচিয়ে ওঠে ভয়ে। বুড়ী দাদীর পায়ে মোজা পরা থাকে। লায়লী আগে আর কারুকে মো পরতে দেখেনি। তার অনেকদিন অবধি ধারণা ছিল বুড়ী দাদীর পায়ের চামড়ার রঙ বদলা কখনো গোলাপী হয়, কখনো বাদামী।

হপ্তায় একবার বুড়ী দাদীর স্নানঘরে মস্ত সাদা টবে গরম জল ঢালা হয়। তাতে দাদীর দা কি সব ওষুধ ফেলে। একটা লালচে সুগন্ধ পাথর দাদীর পিঠে ঘষা হয়। পিঠে, গায়ে, হা গলায় আশ্চর্য, পাথরটা গলে যায় আর টবটা ফেনায় ভরে ওঠে।

স্নান ক'রে বুড়ী দাদী টপটপ ক'রে কতগুলো জামা দু'তিনটে ঘাগরা প'রে নেয়। তার বারান্দায় রোদে এসে শুয়ে থাকে।

হায়দ্রাবাদের ঐ মেয়েটি বুড়ী দাদীর ঘরের দরজা-জানলা খোলে। জানলার বাইরে কার্নি কার্নিশে রুটির টুকরো বাদাম ও ছোলা। পাখীদের খেতে দেয় বুড়ী। একটি পরিত্যক্ত পুর রঙীন ছাতার লোহার শিক থেকে হাত-পা বাঁধা ছোট ছোট পুতুল ঝোলে। পুরনো ন্যাকড় তৈরী পুতুল। বুড়ী জানে ওর কোনটি তার গেঁটে বাত, কোন্‌টি দাঁতে ব্যথা, কোন্‌টি হাত- সিরসির্, মাথা ঘোরা। ওদের উপর বিবিধ মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়, টাঙিয়ে রাখা হয়।

দাসীটি সব রোদে দেয়, পরিষ্কার করে। একদিন ও সাহেবদের আয়া ছিল, ওর মনিব ছিলেন মিশনারী। ভারী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মেয়েটি, সর্বদা ধোয়া-মোছা ঝাড় পোঁছ নিয়ে থাকে। পরে লায়লীর মনে হয়েছে ছোটবেলায় ওকে পেয়েছিল ব'লেই সে বাঁচতে পেরেছি ও ওর হাত-মুখ ধোয়াত, চুল আঁচড়াত, জামা-কাপড় বদলাত।

বুড়ী দাদীর হয়তো ভীমরতি হয়েছিল, হয়তো মেহরুনের কথা তার মনে থাকত না। কি লায়লীর তাকে ভাল লাগত। ফুরফুরে চুলের গোড়ায় ফিতে বাঁধত বুড়ী। সমস্ত গায়ে পাউডা মাখত। ফিরিঙ্গী দোকানীদের কাছ থেকে যেমন ক'রে হোক পাউডার এনেই দিতে হ' মেহরুনকে।

লায়লীকে পাউডার বা সাবান ছুঁতে দিত না বুড়ী। বিষণ্ণ হেসে মাথা নেড়ে বলত, 'না ন তোর দাসী তোকে সর-ময়দা, বাদামবাটা, লেবুর রস মাখাবে।'

'তাতে কি হবে?'

'তুই আরো অনেক সুন্দর হবি।'

সন্ধ্যেবেলা বাইরের মহল থেকে গানের আওয়াজ, ঘুঙুরের ধ্বনি, ঘোড়ার গাড়ী এসে থামবার শব্দ, পুরুষ কণ্ঠের হাসি ভেসে আসত।

লায়লী এসে বুড়ীর কাছে বসত।

মাঝে মাঝে বুড়ী বেশ গল্প করত। টিপু সুলতান নাকি মস্ত নবাব, সবাই তাঁকে ভয় পেত।

'তাঁর একটা কলের বাঘ ছিল জানলি? একটা গোরা সেপায়ের ওপর থাবা দিয়ে ব'সে সে বাঘটা সত্যি গর্জন করত।'

'আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কোথায়?'

'কে জানে। হয়তো ওটাও ভেঙেচুরে ফেলেছে।'

কখনো বলত, 'মোয়াজ্জেম আমায় খুব ভালবাসত রে! ঘাগরা পেশোয়াজ প'রে বসে আলবোলা টানতে তো সে-ই শেখালে। আমি আর ও ব'সে থাকতাম, মেহরুন্ন ঘুরে ঘুরে নাচ দেখাত।'

'আমার মা?'

'হ্যাঁ রে! যেমন গাইত, তেমন নাচত। আমি যদি ওর বাপ মরলে বুদ্ধি ক'রে ওকে নিয়ে পারীতে পালিয়ে যেতাম দিব্যি হতো।'

পরে লায়লী শুনেছিল ওর বুড়ী দাদী ও মাতামহকে বিয়ে করবার সময়ে বেশ টাকাপয়সা আনে। ওর মাতামহ নাকি বউয়ের কথা খুব শুনতেন।

উত্তর জীবনে লায়লী কুন্দনকে তার মাতামহীর কথা বলত। বলত, 'আমি শুধু এই ভেবে পাই না, উনি আবার কেন আমার মাতামহকে বিয়ে করতে গেলেন!'

বলত, 'শেষের দিকে বছর খানেক আর কোন জ্ঞানই ছিল না। কি যে বলতেন, কাকে যে ডাকতেন, তাও বুঝত না কেউ। কি কি ভাষায় কথা কইতেন তাও বোঝা যেত না।'

সত্যিই তাই মরে যাবার বছর খানেক আগে সব জ্ঞানই হারিয়ে ফেলে বুড়ী। আর নড়তে-চড়তে পারত না। তখন তার বয়স পঁচাশি। লায়লীর বয়স বারো বছর হলো। তার বেশ মনে পড়ে।

তখন বোধহয় বুড়ী দাদী আবার প্রথম জীবনের সুখ-শান্তির স্বর্গে ফিরে গিয়েছিল। রাতদিন পিয়ের, ক্লদ, আনা, হেলেন, মার্গারেট যাদের ডাকত তাদের মেহরুন্নও চিনতে পারত না।

লায়লী বসে বসে সাতপাঁচ ভাবত। সে কুন্দনকে পরে একদিন বলেছিল, 'দাদীর জন্যে আমার কষ্ট হয়। বোধহয় খুব একলা পড়ে গিয়েছিল তাই আবার বিয়ে করলে। কিন্তু নিজে বোধহয় শান্তি পায়নি। তুমি জান না, ওর সেই মেয়ের ছেলে এসেছিল কটক থেকে। ওর মৃত্যুর পর। মা তাকে কি অপমানটাই না করল!'

মেহরুন্ন খুব অপমান করে।

তখন গোরদাফন চুকে গেছে। বুড়ীর সেই নাতি এসেছিল খবর পেয়ে। সে নাকি কাজে ফৈজাবাদ আসে। এ খবর সে খবর নিতে নিতে শোনে মোয়াজ্জেম বিদার বখ্‌তের মেমবেগম মরে গেছে।

সে বলে, 'তাঁর একটা কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই?'

মেহরুন্ন বলে, 'না না!'

ভদ্রলোক বোধহয় বুড়ীর টাকার জন্যে এসেছে। মেহরুন্ন বলে, 'না না। টাকাপয়সা কিছু নেই!'

ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে বলে, 'না, টাকাপয়সা চাইনি। ওঁর ব্যবহারের জিনিসপত্র কিছু যদি থাকে। কিছু বিব্রত হবেন না। আমি এমনি জানতে চাইছিলাম। উনি আমারও মাতামহী ছিলেন।'

মেহরুন্ন ওঁর সামনে যায় নি। চিকের আড়াল থেকে কথা কয়। ভদ্রলোক চলে যান।

মা-র ব্যবহারে লায়লী আশ্চর্য হয়েছিল। সে জানত তার দিদিমা এই নাতিকে চিঠি লিখতেন, উপহার পাঠাতেন। সে এ-ও জানত তার দিদিমার ব্যবহারের সোনার নস্যিদানী গোলাপপাশ ও আরো দু'একটা জিনিস ছিল।

মেহরুন্ন বলে, 'ইস! আমি দেখলাম, সেবাযত্ন করলাম, খাওয়ালাম পরালাম, এ সব আমার!'

লায়লী এ-ও জানত শুধু রেষারেষি ক'রে মেহরুন্ন লোকটিকে ফিরিয়ে দিলে। অমন দু' একটা জিনিসের পরোয়া মেহরুন্ন করে না।

বুড়ী এমিলি বেগম মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লায়লীর জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

॥ পনেরো ॥

মেহরুন্নের বাড়ীটি ভারী মজার।

বাইরের বৈঠকখানা মহলটি সুন্দর। সাজানো গোছানো। বড় বড় টানা বারান্দা, ঝিলিমিলির সবুজ রঙের 'পরে সাদা আঙুরলতা। একটি বড় ঘরের পঙ্খের কাজ করা দেওয়াল বড় বড় আরশিতে ঢাকা। মেঝেয় গালচে, চৌকিতে ফরাস। ছোট ছোট তাকিয়া। ঘরের ছাতে ঝাড়লণ্ঠন দোলে। চারকোণে চারটি বড় বড় পেতলের হাতি। শুঁড় তুলে অভিবাদন করছে।

সে ঘরের দু'পাশে দুটি ঘর, সংলগ্ন স্নানঘর। সাহেবদের দেখাদেখি দোতলা বাংলো বাড়ীর ছাঁদে বানানো।

একটি মস্ত বড় চকমেলানো উঠোন। তারপর অন্দরমহল। বাড়ীর এ অংশটিও সুন্দর। বেশ বড় বড় বাসযোগ্য চারখানা ঘর। সঙ্গে ছোট ছোট ঘর, স্নানঘর। চারদিকে টানা বারান্দা। এ বাড়ীতে লায়লী, মেহরুন্ন এবং বুড়ী এমিলি থাকত।

তারপরই শুরু হলো গোলকধাঁধা। রসুইখানা, দাস ও বাঁদীদের থাকবার ঘর। আত্মীয়দের থাকবার ঘর। কোন ঘর দেড়তলা। কোথাও দোতলায় শুধু তিনটে স্নানঘর। কোথাও মনে হয় ঘর-দোর শেষ হয়ে গেছে। মাটির উঠোন. মুরগী চরছে। আবার তারপরে দু'খানা ঘর, রসুইঘর, কুয়োতলা।

সারা বাড়ীতে যেখানে সেখানে ইঁদারা, যেখানে সেখানে ঘর, গোসলখানা, ছাত, বারান্দা। খন বুড়ী এমিলি শক্ত-সমর্থ ছিল তখন সে এবং মেয়ে মেহেরুন রেষারেষি ক'রে ঘর তুলত। ান করতে করতে বেরিয়ে আসত এমিলি তোয়ালে চাদর জড়িয়ে। বলত, 'বান্দা, মিস্ত্রী ডাক দ! পূবদিকে ঘর তুলবে, ইঁদারা কাটবে।'

মেহরুন শুনে ফোঁসফোঁস করত, 'আমি ছাতে একটু বসি। পূবদিকে ঘর তুলে আমার আলো বাতাস বন্ধ করা? দাঁড়াও।'

এই করতে করতে বাড়ীটা এমনিধারা গোলকধাঁধা হয়ে গেল। নিজের বাড়ীতে ছেড়ে দিলে মহরুন এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে আসতে পারবে না। দাস-দাসীরা থাকে। দূর-দুরান্তের আত্মীয়রা থাকে। পুরো বাড়ীটা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল একসময়ে। জানা গেল মহরুনের সম্পর্কিত পিসী, পিসতুতো ভাই, সবাই বাইরে পড়ে গেল। তখন পাঁচিল বন্ধ ক'রে দওয়া হয়। পাঁচিলের জন্যে ইঁট, চুন, সুরকি আনা হয়, তার ওপর লাফিয়ে দাস-দাসীদের ছলেমেয়েরা খেলত।

বুড়ী এমিলি যখন শক্ত ছিল তখন হায়দ্রাবাদীর সঙ্গে গিয়ে গিয়ে দেখত। বলত, 'দেখ, তারা বেশ ছোট একটি বাড়ী তৈরী করেছে! যেন পুতুল খেলার ঘর।' সে কথা শুনে হায়দ্রাবাদী বলত, 'সাহেবান্, ওরা তো আপনার ঘরেই বাস করছে। ওরা যে রংরেজী।'

বুড়ী এমিলি যখন শোনে তার বাড়ীতে ইতিমধ্যে একত্রিশটি ঘর, ন-টি ইঁদারা, এগারোটি উঠোন তৈরী হয়ে গেছে, তখন সে বলে, 'না বাপু, সব দেখতে গেলে বুকে হাঁপ ধরে যাবে।'

তারপর থেকে সে নিজের মহল ছেড়ে বেরোয়নি।

বৈঠকখানা মহল আর তাদের অন্দর খাস, এর মাঝামাঝি জায়গায় আর আশেপাশে সুন্দর বাগান। কত ফুলগাছ, ফোয়ারা, মেহ্দী পাতার গাছ সুন্দর ক'রে ছাঁটা।

তারপর দাসদাসী, আত্মীয়-স্বজনদের ঘর-দোর। ওপাশে, বাইরের দিকে যে সব ঘর-দোর সেখানে মেহরুন ইচ্ছে ক'রে রংরেজীদের বসিয়েছে, ধোপাদের আর দর্জিদের বসিয়েছে। তাদের ঘরের পর বড় রাস্তা। তারা রাস্তা দিয়ে ঘুরে সদরমহল দিয়ে ঢোকে। বলে, 'মালক্নি, আর্জি আছে। আর্জি আছে।'

মেহরুন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে শোনে। বলে, 'তোরা ঘরে থাকিস, আমি তো খাজনা নইনে। ঘরে কলি ফেরাবি, দরজা-জানালা রং করাবি তা নিজেরা করাবি না?'

'মালকিন, পয়সা কোথায়?'

'আমি তোদের দিয়ে কাপড় রঙ করাই, জামা সেলাই করাই, আমি তো মজুরী দেই। পয়সা কোথায় পাবি তা আমি কি জানি!'

তারা তখন মাথা নাড়ে। বলে, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

রংরেজীদের ওখানে মেহরুনের সংসারের জামা-কাপড় রং হয়। বড় বড় মাটির গামলায় রঙ করা হয় দাসদাসীদের জামা-কাপড়। লায়লী ও মেহরুনের পাতলা পাতলা ওড়নায় অভ্রের কুচি ঝিকমিক জ্বলে। দরজা-জানলার বারোমেসে পর্দায় সবুজ রঙ, নীল রঙ। উৎসবের দিনে সব ধপধপে সাদা। সাদা পর্দা, সাদা চাদর, বালিশের ঢাকনি সব হায়দ্রাবাদীর কাছে থাকে।

হায়দ্রাবাদী। লায়লীর ছোটবেলার এক অন্তরঙ্গ স্মৃতি।

সে যেন জেলখানার পাহারাদারনী। খাসমহল থেকে লায়লীর বেরুবার হুকুম নেই খাসমহলে কয়েকজন বাছাই করা দাসী ঢুকতে পায়। রসুইঘর থেকে মেহরুন্ন আর লায়লীর খাবার আনে বুড়ো বাবুর্চি। চীনে মাটির মুখ ঢাকা বাসন। বাবুর্চির হাতে মোমবাতি। চাকরের হাতে খাবার।

হায়দ্রাবাদী সব দেখে। এমিলি থাকতে ও পঞ্চাশ টাকা তন্‌খা পেত। মেহরুন্ন ওকে পঁচাত্তর টাকা দেয়। ওর হাতে সোনার বালা মুখ গম্ভীর। মেহরুন্ন ওকে একটু সমীহ করে কেননা ও-ই খাসমহলটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। বাসনপত্র, জামা-কাপড়, আসবাব পাতির হিসেব রাখে। ওর তাঁবেতে দাসদাসী খাটে। লায়লীকে দেখাশোনা করবার ভার ওর ওপর।

লায়লীর দিদিমা মরে যেতে লায়লীর দুশ্চিন্তা হয়, ও ঘরে এখন কে থাকবে। হায়দ্রাবাদী খুব গম্ভীর হয়ে তাকে আড়ালে নিয়ে বলে, 'তুমি যেন রাতে কোন শব্দ শুনলে ভয় পেও না চোখটি বুজে থেকো।'

'কেন?'

'তোমার বুড়ী দাদী হয়তো ও ঘরের মায়া কাটাতে পারে না, রাতে আসে।'

ও কথা শুনে তখন লায়লী বেণী নাচিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু রাত হ'লে সে মহামুশকিলে পড়ে। শরৎকালের রাত। ফটফট করছে জ্যোছ্না। যেন বই ধরলে বই পড়া যায়। এমন রাতে আবার তার মা আসেনি। আজ বাইরের বাড়ীতে খুব ধুম।

লায়লী চেয়ে দেখে তার ঘরের কোণে ছোট খাটে হায়দ্রাবাদী তো শুয়ে নেই। অথচ দরজাটা খোলা। লায়লী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার বুড়ী দাদীর ঘরে চাঁদের আলো পড়েছে টেবিল, চেয়ার, মস্ত ঘড়ি, আলনা সব দেখা যাচ্ছে। লায়লী ওদিকে তাকাতে চায় না, তবু তার চোখটা ওদিকে চলে যাচ্ছে। মা-র ওপর রাগ হচ্ছে।

শেষে অনেক চেষ্টায় সে একটুও শব্দ না ক'রে খাট থেকে নামল। চটি চাই না, খালিপায়ে পালাতে চাই শুধু। তারপরই পাথর হয়ে গেল সে। ও ঘরে কারা যেন নড়ছে চড়ছে। লায়লী চেঁচাতে চাইল, গলায় শব্দ ফুটল না। তারপর মস্ত বড় একটা বিস্ময় তাকে ঘা মেরে যেন অবশ ক'রে দিলে।

হায়দ্রাবাদী আর সেকেন্দার।

রংরেজীদের কর্তা। চল্লিশ বছর বয়স হবে। দিনরাত ওর বউদের মারে, ওর বাচ্চাদের পেটায়। অনেক পয়সা কামায়। ওর বউরা নিত্যি কাঁচের চুড়ি ভাঙে, নিত্যি কেনে। সেকেন্দার এখানে কেন?

ঘরের মধ্যে ওকে আনতে আছে? ওরা দু'জন গিয়ে খাটের 'পরে বসল। লায়লী দেখল সেকেন্দারের মুখে কি যেন তুলে দিচ্ছে হায়দ্রাবাদী।

লায়লী খাট থেকে লাফিয়ে নামল। 'ঐ তো গোসলখানার দরজা খোলা। ইস্। এতদিন কি ভয়ই না সে পেয়েছে। বুড়ী দাদী ঐ এল, ঐ এল!'

সে বোঁ ক'রে ছুটে যায়। হায়দ্রাবাদীরা বুঝতে পেরেছে কি না কে জানে! সে ছুটতে থাকে উঠোন, বাগান, ফোয়ারা। আবার দরজা, উঠোন, বারান্দা, সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে দরোয়ান বড়ঘরের দরজায় কাঁচের পুঁতির পর্দা। আলো পড়েছে বাইরে। হাসি, গল্প।

ঘরে ঢুকে সে এদিক ওদিক চায়। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কাঁচের গেলাস, বোতল, ৮ রকম খাবার। লাল গোলাপফুল ছড়ানো সাদা ফরাসে।

অত গয়না পরা, ঐ তার মা? সে মা'র গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'আমি একা একা থাকব না, থাকব না, থাকব না! বিচ্ছিরি হায়দ্রাবাদী, বিচ্ছিরি সেকেন্দার, মাকে ভয় দেখাচ্ছে।'

'মুন্নি!' মেহরুন্ন অবাক হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসেছে। গায়ে মাথায় পড় দিয়েছে। বলেছে, 'তুই?'

'হ্যাঁ। বেশ করেছি এসেছি। আবার আসব। আমি ওখানে একা থাকব? বুড়ী দাদী ওখানে ৮ হ'লে আসে না? আমায় যদি ধরে নেয়?'

তখন পেছন থেকে কে যেন তাকে কাছে ডেকে টপ ক'রে কোলে তুলে নিয়েছে। বলেছে, ঃ বাঃ, তোমার মেয়ের নাম দিয়েছি সেই কবে! কতদিন দেখিনি। এমন সুন্দর হয়েছে বুঝি?'

সুন্দর নাক, চোখ, মুখ। কানে হীরে, সাদা জামা-কাপড়। চোখদুটি ভারী হাসি হাসি। 'না তুমি ওখানে যেও না। মেহরুন্ন এ তোমার বড় অন্যায়। যখনই জিগ্যেস করি, তুমি বল ও ক আছে, ওকে দেখার লোক আছে।'

'অন্যায় কি?' মেহরুন্ন তবু হেসেছে। তারপর সেদিন তাড়াতাড়ি আসর থেকে উঠেছে. ড়াতাড়ি অন্দরে এসেছে।

হায়দ্রাবাদীর সঙ্গে কি কি কথা হলো, লায়লী তা জানেনি। তবে এবার বুড়ী দাদীর ঘরে জ্যের জিনিসপত্র গুদাম করা হয়েছে। অত সুন্দর চকচকে স্নানের টবে রাখা হয়েছে পুরনো প তোশক। ঘরটায় তালা পড়েছে।

লায়লীর খাট এসেছে মেহরুন্নের ঘরে। ক'দিন মেহরুন্ন লায়লীর দিকে খুব মন দিল। রপর আবার যে কে সেই। লাভের মধ্যে হায়দ্রাবাদী একটু নরম হয়ে গেল। লায়লীর ম্পর্কে উদাসীন। হয়তো ইচ্ছে ক'রেই।

কিছুদিন পর হায়দ্রাবাদী পালাল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু গয়নাগাঁটি, টাকা-পয়সা উধাও। রাতে সেদিন মেহরুন্ন বাড়ীতে নেই। লায়লী বুঝেছিল হায়দ্রাবাদী ঘরে চলাফেরা করছে, টলি বাঁধছে সে একবার শুধোয়। 'বু, কোথায় যাচ্ছ?'

'না না, কোথাও যাচ্ছি না। এই জামা-কাপড় গোছাচ্ছি। সময় পাই না তো!'

'বু, এত রাতে কেন?'

'দিনে যে সময় পাই না!'

'বু, তুমি কাঁদছ?'

'না না।'

ওর গলা ভার ভার, কথা কইছে নিচু গলায়। লায়লীর পাশে এসে একবার বসল। বলল, মোও, মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।'

লায়লী ঘুমিয়ে পড়ে। একবার যেন ভাঙা ঘুমে শুনল 'মেয়েটার জন্যে কষ্ট হচ্ছে।' খুব চু গলা। আবার কে বলল, 'কষ্ট ক'রে কি হবে! ওকে তো আমি বাঁচাতে পারব না। এই রের মেয়ে। যে কপাল ক'রে এসেছে। আবার কে যেন বলল, 'ও কি, জানলাটা বন্ধ রলে না?'

লায়লীর খুব ঘুম পায়। চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে, উপায় নেই। চোখের পাতা যেন শক্ত আঠা দিয়ে জোড়া। এত ঘুম কেন পাচ্ছে কে জানে! হায়দ্রাবাদীর কাছে ব্যথা কমাবার ওষুধ আছে। ছোট ডিবেয় থাকে। কালো কালো, আঠাআঠা। এতটুকু মুখে দিয়ে বসে ঝিমোয় হায়দ্রাবাদী।

'ওগুলো খাও কেন বু?'

'ওতে ব্যথা কমে।'

'কোথায় ব্যথা তোমার?'

'মুন্নি, আমার মনে ব্যথা।'

আজ শোবার আগে লায়লীর পোকা ধরা দাঁতটা কনকন করছিল। ও বলল, 'বু, আমার দাঁতের ব্যথা তোমার ও ওষুধটায় কমবে?' হায়দ্রাবাদী হাসল। বলল, দাঁড়াও, দিই একটু।'

খড়কে কাঠির ডগায় এতটুকু। সে জন্যেই বোধহয় ঘুমটা অমন গাঢ় হলো।

সকালবেলা সে কি হইচই। মেহরুন্ন ভোরবেলা ফিরেছে, বেলা অবধি ঘুমোচ্ছে। দাসী বাঁদীরা এসে তাকে ডেকে তুলল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে উঠে এল। বাঁদীরা বলল 'সাহেবান, মুন্নি উঠছে না।'

'উঠছে না? এই কথা বলতে আমায় ডাকলি?'

'হায়দ্রাবাদী নেই। পালিয়ে গেছে।'

'মুন্নির কি হয়েছে?'

ওরা এসে ঘরে ঢোকে। মেহরুন্ন হঠাৎ মেয়েকে তুলে নেয়, এবং বুকে জড়িয়ে বারান্দায় এসে বসে। সে চীৎকার ক'রে কাঁদতে থাকে। মেহরুন্নের এক বুড়ী পিসী এলেন। ওরা অনেক হাঁকডাক ক'রে লায়লীকে ঘুম থেকে তুলল। মাথায় বুঝি জলটলও ঢেলেছিল।

তখন আবার উঠোনে নতুন হইচই শুরু হলো। আব্রুর কথা, নিষেধের কথা ভুলে গিয়ে লাফ দিয়ে ভিতরে চলে এল সেকেন্দারের বড় ছেলে আর তার তিন মা। ছেলেটার বয়স বছর আঠারো হবে। তাগড়া জোয়ান। বেঁটে এবং শক্ত চেহারা। ওর তিন মা-র কাপড় চোপড়ে রঙ মাখামাখি। ওরা চেঁচাতে থাকল। মেহরুন্ন বলল, 'ওদের দূর ক'রে দে বাড়ী থেকে।'

সেকেন্দারের বড় বিবি বুঝি স্বামীরই বয়সী। পাকানো শরীর, চোখের নিচে কালি। গলাটা বাঁশীর মতো সরু। সে বললে, তারা স্বামীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে মোটেই উৎসুক নয়। তারা মিনতি করছে সাহেবান যদি দারোগাকে খবর দেন তবে দারোগা তাদের ধরে টাকা-পয়সা কেড়ে নিতে পারে। সেকেন্দার সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে বাড়ী থেকে।

সেকেন্দারের ছেলেটা মুখ তুলে হাঁ ক'রে লায়লী ও মেহরুন্নকে দেখছিল। মেহরুন্ন বিরক্ত হয়ে লায়লীকে টেনে ভেতরে নিয়ে আসে।

তার কিছুদিন পর্যন্ত লায়লীর ওপর মেহরুন্ন খুব নজর রাখে। যে মা অতদূরে ছিল, তাকে কাছে পেয়ে লায়লী যেন বর্তে যায়।

আবার একদিন মেহরুন্ন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লায়লীকে দেখবার তিনটি দাসী তাই তার চুলে চিরুনী পড়ে না। ওর জামাকাপড় তোরঙ্গ বোঝাই তবু ও ময়লা গাঢ়ারা পরে ঘোরে।

মাঝে মাঝে ভাঙা পাঁচিলের ফোকর গলে পালায়। রাস্তা পেরিয়ে আমবাগানে। আমবাগানের পর একটা পুকুর। আমবাগানের ছায়ায় ঝুড়ি নিয়ে ভিখিরীরা শহরের ছেঁড়া ন্যাকড়া, ভা

হাঁড়ি-কুঁড়ি সাজাতে থাকে। ওরা শহরের সব জঞ্জাল এক জায়গায় ক'রে আগুন লাগিয়ে দেয় মাঝে মাঝে।

ওরা লায়লীর দিকে চেয়ে থাকে। ছুট ছুট। একেবারে দুধআম্মার বাড়ী। সেখানে পৌঁছলে আর ভাবনা নেই। বড়ে ভাইকে সবাই ভয় পায়। তাঁর গলা গমগমে গম্ভীর। তাঁর ঘরে রিমঝিম সেতারের আওয়াজ হয়।

সেখানে দুধআম্মা থাকে। দুধআম্মা কারুকে হঠাৎ বকে না। হঠাৎ ভালবাসে না। দুধআম্মার কাছে গেলে সে তেলজল দিয়ে বেণী বেঁধে দেয়। স্নান করিয়ে দেয়। তারপর কাছে বসে খাওয়ায়।

রোজ রোজ দুধআম্মার কাছে যাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে মেহরুন্ন চটে যায়। বলে, 'নিত্য নিত্য পরের বাড়ী যাস কেন?'

তখন লায়লী নিজের বাড়ীতেই ঘোরে। দাসী-বাঁদীদের সংসার দেখে।

ওদের সঙ্গে রসুইখানায় বসে ভাত রুটি খায়। ঈদের দিনে মিঠাইয়ের থালায় প'ড়ে মিষ্টি কাড়াকাড়ি ক'রে খায়। ওদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে উঠোনে দাগ কেটে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করে।

॥ ষোল ॥

লায়লীর জীবনে প্রথম ভালবাসার মানুষ ওর মা।

একবার মা আর ঈশ্বরলালজী ওকে আলি শাহর দরবার দেখাতে নিয়ে যায়।

ওর মা যখন গান গাইছিল লায়লী অবাক হয়ে ওপর পানে চেয়েছিল। ছাত থেকে সার সার অভ্রের মালা নেমে এসেছে।

সে আলি শাহের জন্মদিন। লক্ষ্ণৌ-এর গরীবখানা, এতিমখানা, মখতব আর মসজিদে নবাববাড়ী থেকে ভেট যাচ্ছিল। দরবারে কত লোক এসেছিল কত ধুমধাম। কিছুই দেখেনি লায়লী, সে অবাক হয়ে ঐ অভ্রের মালা দেখছিল।

সেদিন ঈশ্বরলাল ওর কথা শুনে খুব হাসেন।

'শোন, শোন মেহরুন্ন। তোমার মেয়ে অভ্রের মালা চাইছে।'

পরে তিনি লায়লীকে একজোড়া বুলবুল এনে দেন। আশ্চর্য, আস্তে আস্তে অভ্রের মালার কথা ভুলে গেল লায়লী।

মাকে সে কাছে পেত না। মাকে দূর থেকে দেখত। মা'র সঙ্গে ঈশ্বরলালের সম্পর্কটা সে বুঝতে পারে একটু বড় হয়ে।

সে সন্ধ্যায় জলসা নেই। বাইরের লোক নেই। সে একসময়ে গাদা করা বালিশ আর তাকিয়ার আড়ালে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভেঙেছে মা-র চাপা হাসি শুনে। সে নড়েনি। চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে দুটো গলার আলাপ শুনেছে।

মা'র গলা কেমন মৃদু, নরম। ঈশ্বরলালের গলা ভার ভার। স্বর একটু জড়ানো।

'মেহরুন্ন, এমন দূরে দূরে থাকতে পারি না।'

'কি করবে বল?'

'চল, কোথাও চলে যাই।'

'কোথায় যাব?'

'যেখানে হোক।'

'মুন্নি রয়েছে যে!'

'ওকে নিয়ে চল।'

'না।'

'কেন?'

'যেখানেই যাই, তোমার আমার জাতে যে মিলবে না। ধর্মে যে অনেক তফাত।'

'আমি ধর্ম ছাড়ব।'

'না না। অমন কথাও ব'লো না।'

'মেহরুন্ন, কাছে এস।'

এই তো কাছেই আছি।'

'মেহরুন্ন, তুমি জান না তোমায় আমি কত ভালবাসি।'

'জান, আমার মনে হয় আমি আর তুমি পরস্পরকে পাচ্ছি না তাই তোমার এই টান!'

'ছি মেহরুন্ন!'

'তুমিই তো বলেছ একদিন তোমার স্ত্রীকে-ও কত ভালবাসতে।'

'সে ঘেন্না করে।'

'কি জানি, হয়তো সে দূরে সরিয়ে দিল বলেই তুমি আমার কাছে এলে।'

'না না! অবিশ্বাস ক'রো না।'

'কেন?'

কথাগুলো শুনে লায়লী অবাক হয়েছিল । কই তার সামনে তো ওরা এমন ক'রে কথা ক না। তার আড়ালে ওরা কেমন ভালবেসে কথা বলে।

লায়লীর শৈশবটা তাড়াতাড়ি কেটে গেল।

দশবছর বয়স হতেই মেহরুন্ন মেয়ের দিকে নজর দিলে। আর সময় নষ্ট নয়। এখন ওে শেখাতে হবে, তৈরী করতে হবে।

হঠাৎ লায়লীর জীবনে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা শুরু হলো।

ভোর থেকে চোখে-মুখে জল দিয়ে গান গাইতে বসতে হয়। মেহরুন্ন তার সামনে একা বড় মোমবাতি বসিয়ে দেয়। মোমবাতিটি জ্বলে জ্বলে অর্ধেক হ'লে তবে সকাল বেলা ছুটি

দাসীরা দুধ ও বাদাম বাটা মাখিয়ে ওর রঙ সাফ করে। চুলের যত্ন করে। আর উঠো নামার হুকুম নেই। আপন মনে বাড়ীতে ঘুরে বেড়াতেও দেয় না মেহরুন্ন।

সে মেয়েকে তার গয়না-গাঁটি দেখায়, মোহর চেনায়। বলে, 'আমি পরি নি। তুই সোনা পিকদানে পিকফেলবি। তোর পঞ্চাশটা বাঁদী থাকবে।'

ঈশ্বরলাল আসেন সন্ধ্যে বেলা। তখন লায়লী এসে কাছে বসে। হাতে মেহেদী, চো সুর্মা.

চুলের বেণীতে সোনার ফুল। রঙীন ঘাগরা, রঙীন পেশোয়াজ। ঈশ্বরলাল কাছে ডাকলে সে হাত সরিয়ে নেয়। সে বড় হয়ে গেছে। এখন আর আগের মতো চপলতা শোভা পায় না।

লায়লীর পরে মনে পড়েছে সে ভীষণ হাঁপিয়ে উঠত। ভাল লাগত না তার।

নিসারের সঙ্গে কথা কইবার সময়েও বাঁদী থাকে কাছে। মাঝে মাঝে মা ওকে শিরীনের কাছে পাঠায়।

শিরীনের তখন প্রথম যৌবন। খুব নাম হচ্ছে। সেখানে লায়লী শিরীনের মা-র কাছে নাচ শেখে। দোর বন্ধ ক'রে প্রৌঢ়া মজহবীন তাকে নাচ শেখায়।

তারপর আবার বাঁদীর সঙ্গে পালকি চড়ে ফিরে আসে।

আবার রূপচর্চা। দুধচন্দন ঘষে ঘষে স্নান। আবার রেওয়াজ। জানলায় দরজায় ভারী পর্দা। খড়খড়ি ফাঁক ক'রেও বাইরে চাইবার হুকুম নেই। বাঁদীরা বলে দেয় মা-কে।

লায়লী মাঝে মাঝে কাঁদে। বাঁদীরা তাকে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ক'রে বলে, 'তুমি হচ্ছ মা-র মোহরের গাছ। এখন বড় করছে। পরে তোমায় নাড়া দিলে সোনা ঝরবে।'

কে জানে সে সব কথার মানে কি!

সেই সময়ে, তার বুড়ী দাদীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে ঈশ্বরলাল মেহরুন ও লায়লীকে নিয়ে নৌকোয় বেড়াতে বেরুলেন।

কাশী থেকে বড় নৌকো আর বজরা ভাড়া করা হয়। কাশী থেকে একবার পাটনা, পাটনা থেকে কানপুর, আবার কানপুর থেকে কাশী।

হঠাৎ যেন বিধি-নিষিধের সব শেকল খসে পড়ল। অবাধ স্বাধীনতা, অপার মুক্তি।

পরে লায়লী বুঝেছে ঈশ্বরলাল ও মেহরুন পরস্পরের সঙ্গ বেশী ক'রে পাবেন বলেই সেই নৌকাভ্রমণ।

তাঁরা সন্ধ্যায় সকালে নৌকো থেকে নামতেন। পাড়ে বেড়াতেন।

লায়লী বজরার ছাতে বসে দেখত কত নৌকো চলেছে, কত মানুষ। সেই সময়ে একদিন সে ছাত থেকে হুড়মুড় ক'রে নেমে আসে।

'মা, ও মা শীগগির এস। ওরা ওকে মেরে ফেললে।'

ঈশ্বরলাল আর মেহরুন বেরিয়ে আসেন। নৌকো পাড়ে বাঁধা।

প্রৌঢ় নাওদার একটি কিশোর ছেলেকে ভীষণ মারছে। ছেলেটা মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে কিন্তু কাঁদছে না।

মেহরুন দেখে ভেতরে চলে আসে। বলে, 'কি হয়েছে, বাড়ীতে বাঁদীদের চাবুক মারত হায়দ্রাবাদী দেখিসনি?'

ঈশ্বরলাল নাওদারকে ধমক দেন। বলেন, 'কি হয়েছে?'

'হুজুর, ছেলেটা একটা থালা জলে ফেলে দিল।'

'দিয়েছে দিকগে! কি আর হবে। তুমি আমার কাছ থেকে দাম নিও।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলা লায়লী ছেলেটাকে ডাকল। ছেলেটা ছোট একটা কাপড় পরে উনোনে মাটি দিচ্ছিল। বলল, 'এই, এই ছেলে, এখানে এস।'

ছেলেটা চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'আমায় ডাকছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম বজরঙ্গী।'

'আমার নাম মুন্নি। আমার নাম লায়লী। তুমি এস না বাপু।'

ছেলেটা নৌকোর গলুই থেকে লাফ মেরে বজরায় উঠে এল। লায়লী বলল, 'এখানে বসো। আমার একা একা ভয় করছে।'

'ওঁরা কোথায়?'

'বেড়াতে গেছে। তুমি বসো না।'

তারা বসে রইল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। গ্রামে আলো দেখা যাচ্ছে। গোরুর গলায় ঘণ্টা। নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে জল ভরা কলসী মাথায় নিয়ে কি বলছে।

লায়লী ছেলেটার দিকে চাইল। বলল, 'এই, পেয়ারা খাবে?'

'পেয়ারা? কোথায় পাবে?'

'খাও না। দেখ কি মিষ্টি।'

একটু পরেই নাওদাররা বাজার করে ফিরে এল। বজরঙ্গী তাড়াতাড়ি নেমে নৌকোয় উঠল। বলল, 'বলো না যেন, আমি এখানে এসেছিলাম।'

'ওরা মারবে বুঝি?'

'বকবে, ভীষণ বকবে।'

তারপর লায়লীর সঙ্গে বজরঙ্গীর বেশ ভাব হয়ে গেল। বজরঙ্গী আর লায়লী মাঝে মাঝে পাড়ে নেমে বেড়ায়। দু'জনে ক্ষেত থেকে ভুট্টা ছিঁড়ে আনে। উনোনে সেঁকে নেয়।

'ভুট্টা খেলে দাঁত খুব সুন্দর হয়, জান?'

'তোমার দাঁত তো খুব সুন্দর বজরঙ্গী।'

'ভুট্টাদানার মতো?'

'হ্যাঁ। তোমার গায়ে খুব জোর তাই না?'.

'নিশ্চয়। দেখ না হাতটা কি চওড়া। নৌকোয় যখন গুণ টানতে হয় তখন গায়ে জোর ন থাকলে পারা যায় না।'

তারা ঘুড়ি ওড়ায়। বজরঙ্গী লাল নীল কাগজ কেটে কেটে ঘুড়ি বানায়। বলে, 'এস পতংগ ধরবে এস।'

লায়লী ধরে। ঘুড়িটা আস্তে আস্তে উপর পানে উঠতে থাকে। লায়লী চেঁচিয়ে বলে, 'গেল গেল। মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেল।' মেহরুন্ন মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি করে।

ঈশ্বরলাল বলেন, 'আহা খেলুক না ওরা! আর তো খেলতে পাবে না। এমন স্বাধীনভাবে বেড়াতেও পাবে না।'

মাঝে মাঝে বজরঙ্গীকে ইচ্ছে ক'রেই লায়লী দেখেও দেখে না। বজরঙ্গী আড়ে আড়ে চায় বাসন মাজে, মসলা পেষে। ছুরি নিয়ে আলুর শাক কাটে। মুখটা কেমন যেন হয়ে যায় তার ভাবে কখন কি দোষ ক'রে ফেলেছে অজান্তে। নইলে হঠাৎ কথা বন্ধ করবে কেন লায়লী।

বজরঙ্গী আপনার কাজ সেরে নেয়। তারপর নদীর পাড়ে নেমে চুপ ক'রে বসে থাকে ইচ্ছে করেই এদিকে তাকায় না।

লায়লী তখন নেমে আসে। বলে, 'এস এস। দেখ, দড়ি দিয়ে বেঁধে মাটির হাঁড়িটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম তাতে ছোট ছোট মাছ ধরা পড়েছে।'

বজরঙ্গী অভিমান করতে জানে না। তখনই সে ছুটে কাছে আসে। তারপর বলে, 'ছেড়ে দাও। অত ছোট মাছ ধরতে নেই। পাপ হয়।'

ছোট মাছ ধরলে পাপ হয়, চাঁদের কলঙ্ক গণেশ দিয়েছেন, কাছিমকে ভাত দিলে পুণ্য হয় এমনি কত কথা বলে বজরঙ্গী।

বজরঙ্গী নদীর জলে সাঁতার কাটে। ধুতির খুঁট ধ'রে বাতাসে উড়িয়ে শুকিয়ে নেয়।

বজরঙ্গীর খিদে কখন পায় কে জানে। অনেক বেলায়, যখন ভাতের লোভে গাংশালিকগুলো নৌকোর কাছে এসে ঝগড়া করে তখন বজরঙ্গী খেতে বসে। লাল চালের ভাত, লাল দানার লবণ, করলা সেদ্ধ আর কাঁচা মূলো।

'বজরঙ্গী, আমাদের জন্যে কতরকম রান্না হয়, তুমি খাও না কেন?'

'আরে মুন্নি, তুমি বড় বোকা।'

'কেন?'

'তোমাদের রান্না আমার খেতে নেই।'

'বেশ তো তা না খেলে। তোমাদের নৌকোয় ঈশ্বরলালজীর জন্যে কত রান্না হয়, তা খাও না কেন?'

'তা আমায় খেতে দেবে কেন নাওদাররা? আমি ওদের চাকর। তোমরা ওদের নৌকো ভাড়া নিয়েছ। তোমাদের খাবার কি আমাকে দিতে আছে?'

'বজরঙ্গী, তোমার নৌকোয় থাকতে ভাল লাগে?'

'না লাগলে কি করব?'

'চলে যেতে পার না?'

'কোথায় যাব?'

'আর কোন জায়গা নেই যাবার?'

'না।'

বজরঙ্গী হাসে। বলে, 'ও সব কথা ভেব না। তোমার মন খারাপ হবে।'

'কি যে বল!'

'হ্যাঁ মুন্নি, তোমার বড্ড মন খারাপ হয়। কথায় কথায়। তোমার মনটা খুব নরম, তাই না?'

'কে জানে!'

দু'জন বজরার ছাতে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। বজরঙ্গী বলে, 'তোমরা চলে যাবে কেন? আশ্বিন মাস পর্যন্ত থাক। কাশী চল। দেখবে দশেরায়, দীপাবলীতে কত ধুমধাম, আলো, বাজি।'

'বাঃ, বেশ কথাটা বললে!' লায়লী হাসে। বলে, 'আমার কথা কি ওরা শুনবে?'

একটু চিন্তিত হয়ে আবার বলে, 'কেন, আমরা চলে গেলে কি তোমার কষ্ট হবে?'

বজরঙ্গী সে কথার জবাব দেয় না। চুপ ক'রে আনমনে কি যেন ভাবে।

একদিন বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে আসে।

লায়লী খুব আবদার করে, 'মা, ওকে নিয়ে চল, বজরঙ্গীকে।'

'মুন্নি, জ্বালাস না।'

'নিয়ে চল না মা, আমাদের বাড়ীতে তো কত লোকই থাকে।'

'সেখানে ও থাকবে কেন?'

'মা, তোমার মালীদের সঙ্গে থাকবে?'

'যা মুন্নি, জ্বালাস্ না। বাড়ীতে বান্দা নফর গিসগিস করছে। অতগুলো লোকের কোন দরকার নেই, তার 'পরে আবার আর একটা লোক।'

ঈশ্বরলাল বলেন, 'ওকে নিয়ে গেলে ও সেখানে কি কাজ করবে মুন্নি?'

'কাজ করবে কেন? ও পায়রা পুষবে, আমাদের পাখীগুলো পুষবে। ও পতংগ বানাবে, পতংগ ওড়াবে!'

মেহরুন্ন পানের পিচ ফেলে হাত ঘুরিয়ে বলে, 'ও সব কথা বলিসনে মুন্নি। ও সব খেলাধুলোর কথা ভুলে যাও। নৌকোর চাকর আমার বাড়ীতে বসে খাবে-দাবে আর পতংগ ওড়াবে?'

সে বিরক্ত হয়ে ঈশ্বরলালকে বলে, 'এ নিশ্চয় ঐ ছেলেটার বুদ্ধি। ছেলেটাকে ডাক তো!'

লায়লী কাঁদতে শুরু করে। বলে, 'ওকে কিছু বলবে না। ও কি কিছু বলেছে না কি? আমি তো বলেছি! ওকে তুমি বুঝি নাওদারদের হাতে মার খাওয়াতে চাও?'

মেহরুন্নের সে ইচ্ছে ছিল না তা নয়। তবে মেয়ের কান্নাকাটি দেখে ও বেশী কিছু বলে না। শুধু বলে, 'এই তুই তো আচ্ছা বেইমান রে! ওর কাছে খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে নিজের দুঃখের কথা বলেছিস বুঝি?'

'না বিবিজী!' বজরঙ্গী ভয়ে ভয়ে বলে।

'যা। কথায় কথায় অত এ বজরায় আসিস না। বেশী বাড়াবাড়ি করলে নাওদারকে বলে দেব!'

বজরঙ্গী ম্লানমুখে চলে যায়।

তারপর তিনদিন আর সে এল না। কাজের অছিলা দেখিয়ে আড়ালে আড়ালে রইল।

বিদায় নেবার দিন নাওদার যখন দেনা-পাওনার হিসেব নিয়ে ব্যস্ত তখন লায়লী একপাশে দাঁড়িয়েছিল।

বেণীমাধবের ধ্বজার কাছে একটি বাড়ীতে বসে কথা হচ্ছিল।

ঈশ্বরলাল টাকা-পয়সা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

বজরঙ্গীর হাতে মেহরুন্ন একটা টাকা দিয়েছিল। বজরঙ্গী তাই নিয়ে উধাও। লায়লী ভাবে কি আশ্চর্য কত তাড়াতাড়ি আমাকে ভুলে গেল দেখেছ! আমারই কেবল মন খারাপ। কই, ওর তো কিছু হচ্ছে না!

নাওদাররা চলে যাচ্ছে। তল্পি-তল্পা গুটিয়ে। খুশী না অখুশী তা বোঝা যাচ্ছে না। মা বলে, 'দিয়ে ওদের খুশী করা যায় না। মানুষ সদাই আরো নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে।'

লায়লীর বুকটা হতাশায় চুপসে যায়। এখনি তো চলে যাবে ওরা। রাত পোহালে লায়লীরা যাবে বিন্ধ্যাচল। আর দেখা হবে না।

কিন্তু না। বজরঙ্গী তাকে নিরাশ করল না। বজরঙ্গী ছুটতে ছুটতে এল। তার হাতে একটা মস্ত ঘুড়ি। হাসি হাসি মুখ, চোখ দুটো করুণ। লায়লীর মনে হলো ও বোধহয় দুঃখ হলেও হাসে।

মস্ত বড় ঘুড়ি। লাল, সাদা, কালো আর হলুদে চৌরঙ্গী ঘুড়ি। বজরঙ্গী বলল, 'টাকাটা আমি ভাঙাতে পারিনি। কত কষ্টে চারটে পয়সা যোগাড় করেছি। চারটে পয়সা, দুটো দামড়ি। দেখ কি সুন্দর। নাও মুন্নি, পতংগ নাও, লাটাই নাও।'

লায়লী হাত বাড়িয়ে নিল। বলল, 'তুমি কি বোকা বজরঙ্গী!'

'কেন?'

'ওরা কি আমায় পতংগ ওড়াতে দেবে?'

'দেবে না?' কে যেন একটা ফুঁ দিয়ে উৎসাহের বাতিগুলো নিভিয়ে দিলো।

হঠাৎ ভয়ানক কষ্ট হলো লায়লীর। বুকের ভেতরটা ব্যথা করল। একটা কথাও কইতে পারে না। ঘুড়িটা ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

বজরঙ্গী আবার একটু হাসল। বলল, 'আবার এস। আবার আমাদের নৌকো নিও। কেমন?'

'আচ্ছা!'

রাস্তায় অনেক লোক, টাঙ্গা চলেছে, ধুলো। বজরঙ্গী তার মধ্যে হারিয়ে গেল। লায়লী দেখল ও দুলে দুলে চলেছে, ওর ছিটের জামাটি দেখা যাচ্ছে। একবার ও মুখ ফেরালে, হাসল বুঝি।

॥ সতেরো ॥

লায়লী হঠাৎ যেন বড় হয়ে গেল।

সর্বদা মন উদাস। ভালো লাগে না কিছু। থেকে থেকে কি যেন মনে পড়ে, কোথায় যেতে মন চায়। কখনো কখনো নির্জন দুপুরে নিজেকে নিজেই দেখে আয়নায়।

একদিন, তার মা তখন বাড়ী নেই। গানের শেষে হঠাৎ লায়লী কেঁদে ফেলল। কেন চোখে জল এল, কেন সে কাঁদল তা নিজেই জানে না।

নিজের তানপুরাটিতে গেলাপ পরিয়ে রাখলেন ঈশ্বরলাল। তারপর হাসিমুখে তার দিকে চাইলেন। তাঁর নাকের ডগাটা এবং মুখটা লাল। কপালে ঘাম। তাকে টেনে নিলেন কাছে। বললেন, 'খুব সুন্দর হয়েছ তুমি।'

তাকে জড়িয়ে ধরলেন, চুমো খেলেন। খুব আস্তে আস্তে।

হাত বুলিয়ে শিউরে তুললেন লায়লীর দুটি সদ্য-জাগা বুকের কুঁড়ি। লায়লী নীরব নিশ্চল। ভয়, রোমাঞ্চ, সেই সঙ্গে এক অজানিতের প্রবল হর্ষণ শরীরে ও মনে। ঈশ্বরলাল সহসা তাকে খুব কাছে টানলেন। তাঁর হাতটা কাঁপছে, শরীর কাঁপছে।

পুরুষের কামনার সঙ্গে সেই তার প্রথম পরিচয়।

কেঁদে সে পালিয়ে যায় নিজের ঘরে। মুখ তুলে চাইতে পারে না, আবার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত উল্লাস।

সেই প্রথম।

ঈশ্বরলালকে সে তখন আর প্রশ্রয় দেয় নি। গোপন কোন অমোঘ অস্ত্রের মতো একদিন তাঁকে ব্যবহার করেছিল। সে অনেক পরে।

লায়লী আশমান, লায়লী আশমান, হঠাৎ একদিন তার নাম অনেকের মুখে গুনগুন ক'রে ওঠে।

সাদিক লখনৌভী লক্ষ্ণৌ-র এক নামী কবি। প্রৌঢ়, লাল চোখ, ঘন ভ্রূ। কবিতা লেখেন, মুশায়রায় তার নাম থাকলে ভিড় জমে।

সাদিক লখনৌভী লায়লীর নামে কবিতা লিখলেন। লায়লী একটি কথা বলবে সেই আশায় তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকেন। মেহরুন বলে, 'আপনি শুধু গোলাপফুল আনেন। শুধু ফুলে কি লায়লীর মন পাওয়া যায়?'

লায়লীর দিকে সে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকায়। লায়লীর মা মেহরুন। তার হাসিতে ক্ষোভ, তার চোখে সন্দেহ। সে বলে, 'কোথা থেকে এমন মুখ পেলি, চোখ পেলি। আমার মা-র রঙটা অবধি তুই পেয়েছিস।'

লায়লী হাসে। বলে, 'তুমি তো তাই চেয়েছিলে মা। যখন তোমার আসরের বাতি নিভবে তখন আমার আসরে বাতি জ্বলবে।'

'লায়লী তোর বড় অহঙ্কার! এত অহঙ্কার ভাল নয়।'

'মা, অহঙ্কার করবার মতো রূপ থাকলে মনে গর্ব আসে।'

'তুই বড় নিষ্ঠুর।'

লায়লী নীল ওড়না জড়ায়। গলায় মুক্তোর চিক পরে। অলস কণ্ঠে বলে, 'রূপটা কে দিয়েছে জানি না, মনটা তুমি দিয়েছ।'

'আমি নিষ্ঠুর? আমি নির্মম?' মেহরুন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। সে ছুটে চলে যায়। ঈশ্বরলালকে বলে, 'অনেক হয়েছে। এখন চল, আমরা চলে যাই।'

ঈশ্বরলাল জবাব দেন না। তানপুরার তারে আঙুল বোলান। টুং-টাং শব্দ তোলেন। তারপর বলেন, 'সময় চলে গেছে মেহরুন।'

'সময় চলে গেছে?'

'হ্যাঁ। তারপরও সাত বছর আট বছর কাটল। মন কি এক জায়গায় বসে থাকে?'

মেহরুন নিশ্বাস ফেলে। বলে, 'না। আমার ভুল হয়েছে। এখনো নয়। এখনো লায়লী নিজের ভাল বোঝে না।'

সত্যিই কি লায়লীর মেহরুনকে দরকার ছিল?

সাদিক লখনৌভীকে কয়েকমাস সে খুব প্রশ্রয় দিল। লখনৌভী আর বাড়ীতে যান না। তাঁর জমি গেল, আলি শাহর দেওয়া জায়গীর গেল। জহুরীর দোকানে সর্বস্ব ঢালতে লাগলেন আজ হীরে, কাল চুনী, তারপরে মুক্তো।

লায়লী বলল, 'সবাই বলছে তুমি সর্বনাশের নেশায় মেতেছ।'

'এমন নেশায় মেতে বড় সুখ লায়লী।'

'সুখ? তুমি সুখী হয়েছ!' লায়লী যেন হাসছে।

'কি জানি, বুঝতে পারি না লায়লী।'

'তোমার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল।'

'আসুক।'

'আমাকে অনেক কথাই শুনিয়ে গেল।'

'শোনাক।'

'আমি দোর বন্ধ ক'রে দিলাম। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে আমায় অভিশাপ দিল।'

'দিক।'

লায়লী এবার হাসল। বলল, 'বুঝেছি।'

তারপর হঠাৎ একদিন লখনৌভীর মুখের সামনেও লায়লীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ায়লীর সময় নেই। দিল্লীর বাদশাদের নাতি এসেছেন। তাঁকে নিয়ে সে ব্যস্ত।

লখনৌভী বললেন, 'লায়লী, আমি একটি শ্যয়ের লিখে এনেছি। সেটি তোমাকে দেব। দিয়ে চলে যাব।'

লায়লী বলল, 'লখনৌভী, এই কবিতাটি তুমি যদি সোনার পাতে লিখে আনতে, যদি মুক্তো দিয়ে আমার নামটি এঁকে দিতে, তবে আমি যত্ন ক'রে রেখে দিতাম। কাগজের ওপর লেখা ্যায়ের নিয়ে আমি কি করব?'

মেহেরুন্ন বলল, 'সর্বনাশী, তোর জন্যে মানুষটা ফতুর হয়েছে। আজ ওকে তাড়িয়ে দিতে াধছে না তোর?'

লায়লীর হাসিতে যেন মুক্তো ঝরে পড়ল, 'মা তুমি এমন কথা বল! কাগজের কবিতাকে ামী মনে হচ্ছে তোমার? না, তোমার বয়স হয়ে যাচ্ছে।'

লখনৌভীকে সেদিন নিরাশ হয়েই ফিরতে হয়। দু'দিন বাদে লখনৌভীর মৃতদেহ গোমতীর জলে ভাসতে দেখা গেল। লায়লী সেদিন দিল্লীর বাদশার নাতির কাছে তাঁর পিতামহ বাহাদুর াহ রচিত গান শিখতে ব্যস্ত। কিছুদিনের মধ্যেই লখনৌভীর নাম আস্তে আস্তে সবাই ভুলে গেল।

লক্ষ্ণৌ-এ আরো কিছুদিন থাকবার ইচ্ছে ছিল মহামান্য অতিথির। কিন্তু দিল্লীর কোষাগার অনেকদিন আগেই শূন্য হয়েছে। বাদশা বেগমরা পরের দিকে তাকিয়ে দিন কাটান। নিজের াজগী দৌলতীর শেষ অবশিষ্ট কিছু গহনা, মোহর, জেড পাথরের পানপাত্র এবং একটি ত্নখচিত ফলক লায়লীকে উপহার দিয়ে বাদশাজাদা দিল্লী ফিরে গেলেন। লায়লীকে বললেন, ানটি লিখে দিয়ে গেলাম। আমি যেদিন বাদশাহ হব সেদিন তুমি আমার দরবারে এস।'

'আপনি বাদশাহ হবেন?'

'হ'তে পারি। আজকাল কি কিছু সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়? হ'তেও পারি। অবশ্য তুমি তখন ামায় মনে রাখবে না জানি।'

'রাখব।'

'না লায়লী, মাত্র পনেরো দিন তোমার সঙ্গে মিশেছি। তোমাকে চিনতে দেরি হয়নি ামার।'

'মালিক, ঠাট্টা করছেন?'

'তোমার মন এই আয়নাটির মতো। যখন যে সামনে থাকে তখন তার ছায়া পড়ে। যে সরে ায় তার স্মৃতি মুছে যায়।'

তিনি লায়লীর চুলগুলো সরিয়ে দিলেন কপাল থেকে। মৃদুস্বরে বললেন, 'দোষ দিই না, দোষ দিতে পারি না। আয়না থেকে ছায়া সরে যায় ব'লে কি আয়নাকে দোষ দিতে আছে? তোমার দোষ নেই।'

বললেন, 'যদি দিল্লীতে একবার নিয়ে যেতে পারতাম তোমায়, তবে জীনৎমহলকে দেখাতাম। বেগমসাহেবার রূপের গর্ব ভাঙত। কিন্তু তা হলো না। আমি যে এখানে এসেছি তাও তো সকলের জানার কথা নয়। এ গোপনে রাখার কথা। তোমায় নিয়ে গেলে জানাজানি হবে।'

লায়লী খুব মুগ্ধ হয়েছিল। পনেরোটা দিন যেন এক আশ্চর্য মোহের মধ্যে কেটেছে তার

তিনি বলে গেলেন, 'বড় সুখে, বড় আনন্দে এ দিন ক'টা কাটিয়ে গেলাম লায়লী। আমাদের জীবনে সুখ-শান্তি বড় কম।'

'সে কি কথা মালিক?'

'হ্যাঁ লায়লী। আমাদের জীবনের কোন দাম নেই তবু সদাই সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। সে ঐশ্বর্য নেই, সে কোহিনূর, সে ময়ূর সিংহাসন নেই। আছে শুধু হানা-হানি, সন্দেহ, ষড়যন্ত্র। জান তো তৈমুর বংশের কেউ যদি বৃদ্ধ হ'য়ে স্বভাবিকভাবে মরতে পায়, তাকে সৌভাগ্যবান পুরুষ বলা হয়।'

তিনি চলে গেলেন।

দু'বছর বাদে লায়লী তাঁর মৃত্যুর খবর শুনেছিল। তখন লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লী এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র। লায়লীরা তখন সুদূর তিলোয়াই গ্রামে তার পিতার জায়গীরে পালিয়ে গেছে। সে শুনেছিল ইংরেজ সেনাপতি বাদশার সেই নাতিকে বড় নিষ্ঠুরভাবে গুলি ক'রে মেরেছেন।

শুনে সে হেসে ঈশ্বরলালকে বলেছিল, 'দেখলেন, উনি সত্যি কথাই বলেছিলেন।'

তাঁর কথা মনে পড়ত। যখনই সেই গানটি গাইত তখন মনে পড়ত। গানটি সে মুখস্থ ক'রে নেয়। কাগজটি হারিয়ে ফেলেছিল।

'দাগ কাটে না, কিছুতেই ওর মনে দাগ কাটে না। ওকে দেখলে আমার ভয় করে ঈশ্বরলাল।' মেহরুন্ন বলত।

ঈশ্বরলাল জবাব দেননি।

'এক একটি মানুষ ওর কাছে আসে। ও তাদের আনন্দ, উৎসাহ, আশা সব যেন শুষে নেয় ও সর্বনাশী।'

'মেহরুন্ন ও তোমার মেয়ে!'

'জানি। ও আমায় ব্যঙ্গ করে। আমায় দেখে হাসে। আমার বুকে আগুন জ্বেলে দিতে চায় ও। জান, ওর গহনা, মোহর কোথায় কি রাখে আমায় দেখতে দেয় না। আমাকে ও বিশ্বাস করে না।'

'চল, এবার চলে যাই।'

'চলে যাবে?' হঠাৎ মেহরুন্ন যেন চমকে উঠত। বলত, 'কেন যাবে? সেদিন তো যাওনি।

'যাব, এখন যেতে হবে। নইলে সর্বনাশ হবে।'

'এ কথা বলছ কেন? আমি যে তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

ঈশ্বরলাল নিরুত্তর।

'আমি যেতে চাই না, আমি শেষ অবধি দেখতে চাই। আমি এখন চলে গেলে সর্বনাশী হাসবে। বলবে মা ভয় পেয়ে পালাল। মা হেরে গেল।'

'তুমি সর্বনাশ দেখবে বলে বসে আছ মেহরুন্, আমি দেখতে চাই না বলে পালাতে চাই।'

'পালাবে! কোথায় পালাবে? পালানো যায় না। যেখানেই যাবে জঙ্গলে অথবা মরুভূমিতে, টা তো ফেলে যেতে পারবে না। না না ঈশ্বরলাল। নির্জনে বসে মনের আগুনে পুড়তে রব না।'

ঈশ্বরলাল বলতেন, 'আমি কি জানি না সে কথা ? যাওয়া যায় না, পালানো যায় না। জানি নি সব। তবু.......!'

মেহরুন্ ওঁর দিকে অবাক হয়ে চায়। তারপর বলে, 'পালাব কেন? এখনো লোকে আমার ন শুনতে চায়। তোমার ঘরোয়ানা......'

সে ঈশ্বরলালের হাত ধরে। সস্নেহে বলে, 'সে তো তুমি ওকে দাওনি ঈশ্বললাল! তোমার নে এত নাম। এস, এবার আমি আর তুমি শুধু গানের আসর জমিয়ে তুলব।'

'বেশ, তাই হোক!' ঈশ্বরলাল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। করুণ হেসে বললেন, 'আমি ার তুমি বালি দিয়ে বাঁধ দিচ্ছি, তাই না মেহরুন্?'

'কেন?' মেহরুন্ ভয় পেয়েছে।

'তুমি যদি না বুঝে থাক আমি তোমায় বলব না। তবে দুঃখ হয়। হয়তো শেষ আঘাতটা মি আমার কাছ থেকেই পাবে।'

'শেষ আঘাত!'

'হ্যাঁ মেহরুন্, হ্যাঁ। সর্বনাশ এগিয়ে আসছে। ভয়ানক সর্বনাশ। তোমাকে লোকে ভুলে চ্ছে, তোমার গান কেউ শুনতে চায় না। এর চেয়ে অনেক বড় সর্বনাশ এগিয়ে আসছে।

'কি!'

তিনি মেহরুনের হাতটা ধরে টেনে আনলেন। বললেন, 'আমার বুকের ওপর হাত রাখ। ামাকে তুমি ছেড়ে দিও না। সে সর্বনাশ একদিন আমাকে তোমাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে বে। আমি বুঝতে পারছি।'

ঈশ্বরলাল এক ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা বলেছিলেন। কি হতে পারে, কি হতে পারে, তা নেক ভেবেছে মেহরুন্। কূল-কিনারা পায়নি। আত্মীয়-স্বজন পরিবার-পরিজন, সব একে একে ্যাগ ক'রে গেছে ঈশ্বরলালকে। শুধু মেহরুনের দিকে তাকিয়ে তিনি সব ক্ষতি সহ্য করেছেন। হ্যাঁ, টাকা আছে। কিন্তু টাকায় কি সব ক্ষতি পূরণ হয়? টাকা তো মেহরুনেরও আছে। ায়লী তার সন্তান। লায়লীর খ্যাতি লায়লীর প্রতিপত্তি দেখে সে তৃপ্তি পাচ্ছে না কেন?

'যৌবনের মালিকানা ছাড়তে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এখন বুঝতে পারছি এক সিংহাসনে জন রাজা বসতে পারে না কেন!'

অনেক ভেবেছে মেহরুন্। কিন্তু বিপদটা যখন হলো, সে যেন দিশেহারা হয়ে গেল। ায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল। ঈশ্বরলালের কাছে লায়লী তখনও গান শেখে।

কিন্তু ঈশ্বরলাল হঠাৎ একদিন এলেন না। প্রায় পনেরো-ষোল বছর বাদে এই প্রথম তাঁর নুপস্থিতি।

মেহরুন্ অবাক। সে লোক পাঠালে। না, ঈশ্বরলালের কিছু হয়নি। ঈশ্বরলাল অসুস্থ নন। সে আবার লোক পাঠায়। পারলে নিজেই ছুটে যেত। তা সম্ভব হলো না।

লায়লী তার উৎকণ্ঠা দেখে ভ্রূকুটি করল। বলল, 'মা, তুমি বে-সরম হয়েছ কেন? তোমার লজ্জা করছে না?'

'লজ্জা!' মেহরুন্ন কপালে কাঁকনের ঘা মারল। বলল, 'তুই বুঝবি না মুন্নি! তুই যে ভালবাসিস নি। ও আছে বলে আমি কত দুঃখে কষ্টেও হাল ছাড়িনি। কি হলো, এল না কেন?'

লায়লী হাসল। বলল, 'দাঁড়াও। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

লায়লী চিঠি লিখে দিল।

মেহরুন্ন নিজের ঘরে চুপ ক'রে বসেছিল।

সন্ধ্যে হয়েছে। আলো জ্বলেনি। মেহরুন্ন গালে হাত রেখে ভাবছিল। হঠাৎ সেই পরিচিত শব্দ শুনল। টুং-টাং। তারের আওয়াজ। ঈশ্বরলাল মাঝে মাঝে একলাটি বসে তারে সুর মেলান।

সে নিশ্চিন্ত হলো। বুক থেকে গুরুভার নামল। তাড়াতাড়ি চুলটা আঁচড়ে নিল। ওড়না নিল। নিঃশব্দে নেমে গেল সিঁড়ি ধ'রে।

সিঁড়ি ধরে সে উঠল। অস্থির পায়ে এগিয়ে গেল, পর্দা তুলল। ঘরে একটি বাতি জ্বলছে। বাতিদান হাতে দাঁড়িয়ে আছে লায়লী, তার পায়ের কাছে বসে আছেন ঈশ্বরলাল। লায়লীর হাঁটুতে মাথা ঘষছেন।

'লায়লী, লায়লী, লায়লী!' শুনতে পেল মেহরুন্ন।

সে এক রাত!

কোন কথা লুকোন নি ঈশ্বরলাল। যন্ত্রণায় অস্থির কণ্ঠে মেহরুন্নকে বলেছিলেন, 'আমি আর পারছি না। পাঁচ বছর ধরে এই যন্ত্রণা সহ্য করছি মেহরুন্ন। যখন আর পারিনি তখন চলে যেতে চেয়েছিলাম।'

লায়লী বেরিয়ে গিয়েছিল।

ঈশ্বরলাল আর মেহরুন্ন। মাঝখানে একটি বাতি জ্বলছে।

'আমি ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছি। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমার বুকের ভেতরটা যদি তোমায় দেখাতে পারতাম।'

মেহরুন্ন নিরুত্তর। সে অশ্রুহীন চোখে চেয়ে আছে।

পনেরো বছর। ভালবাসা, প্রেম, একসঙ্গে সঙ্গীত সাধনা।

'মেহরুন্ন, তোমার আমার প্রেমের কথা লোকের মনে অমর হয়ে থাকবে।'

কতদিন। কত রাত। একটু একটু ক'রে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দেওয়া।

'এর পরে আর মৃত্যুও আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনতে পারবে না।'

মেহরুন্ন অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এখনো ঈশ্বরলাল কথা বলছেন। কি বলছেন তা সে শোনেনি তো।

তার কানে যায়নি।

ঈশ্বরলাল তার হাত ধরতে চাইছেন। কিন্তু কেন?

আর হাত ধরে কি হবে? বাঈজীর জীবন, নর্তকীর জীবন। গৃহস্থ বৌয়ের মতো সুখশান্তি া কি তারা পায় না। কেমন ক'রে পাবে? পুরুষদের টেনে আনে তারা, কত সুখশান্তির সংসারে াগুন জ্বেলে দেয়। তাই অভিসম্পাত তাদের আশেপাশে ফেরে। কিন্তু মেহরুন্ন তো সে াশান্তি জানত না। সে যে সব পেয়েছিল। ভরা যৌবনেও সে অন্য পুরুষের দিকে চায়নি। এক ঈশ্বরলালকে নিয়েই সে সুখী হয়েছিল।

তবে স্থায়ী বলে কিছু নেই! এমনিই হয়? কিছুই স্থায়ী নয়?

মেহরুন্ন বাতিটি তুলে নিল। বেরিয়ে এল।

মেহেরুন্ন পরদিনই চলে যায়।

সুদূর তিলোয়াই। যেখানে কেউ তাকে চেনে না, জানে না।

যাবার আগে সে লায়লীকে একটি কথাও বলেনি। শুধু ছোট একটি কৌটো তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, 'বিষ। অতি তীব্র বিষ। আমি সারারাত কৌটো হাতে নিয়ে বসেছিলাম। াহস হয়নি। তুই রাখ। তোর কোন দিন দরকার হ'তে পারে। তোরও একদিন যৌবন যাবে তো!'

সর্বনাশকে ভয় পেয়েছিলেন ঈশ্বরলাল। কিন্তু সর্বনাশ যখন এসে সামনে দাঁড়াল তখন তিনি ন এক প্রমত্ততার নেশায় ভেসে চলবেন বলে বদ্ধপরিকর।

'ঝাঁপ দিয়েছি, ঢেউয়ে ভয় কি?' বিড়বিড় ক'রে বলেন তিনি।

লায়লীর সঙ্গে গান করেন। লায়লীর ঘরে পড়ে থাকেন।

দিন নেই রাত নেই মদ খান আর তাকে ভালবাসেন। বলেন, 'সরে যেও না। চোখের ানে থেকে সরে যেও না।'

মাঝে মাঝে বসে থাকেন। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে। মাথা নিচু। কি যেন ভাবেন।

লায়লীকে বলেন, 'লায়লী, তোমার কষ্ট হয় না!'

'মা-র জন্যে? না।'

'একটুও না?'

'না। মা আমাকে যা শিখিয়েছিল আমি তাই করছি। কষ্ট হবে কেন?'

ঈশ্বরলাল অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন। লায়লী হাসে। নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি। বলে, াপনাকে দেখেও কষ্ট হয় না।'

'আমার কথা বলছ কেন?'

'এই যে দিনরাত্তির মা-র কথা ভাবেন। অন্যায় করেছেন সে চিন্তা মন থেকে যায় না াপনার, তা দেখেও কষ্ট হয় না আমার।'

'লায়লী, আমি তোমায় ভালবাসি।'

'ভালবাসেন!'

লায়লী খিলখিল ক'রে হাসে। বলে, 'ভালবাসার আপনি কি বোঝেন? একজনকে পনেরো র ধ'রে ভালবাসলেন। আবার তাকে ভুলে আর একজনকে...'

লায়লী, তুমি যদি কোনদিন ভালবাস তবে জানবে প্রেমে কি জ্বালা!'

কি ক'রে জানব বলুন! ভালবাসিনি তো!'

'ভালবাসনি! লায়লী, আমাকে কি একটুও ভালবাসনি? এতটুকু? এককণা?'

লায়লী মাথা নাড়ে। গম্ভীর হয়ে বলে, 'ঈশ্বরলালজী, আপনাকে দেখে আমি বুঝে ভালবাসায় বড় জ্বালা। না-না! আপনার মতো আজ একে কাল ওকে ভালবাসায় বড় অশাি

সে কি যেন ভাবে। তারপর মুখ নিচু ক'রে তানপুরার তারে আঙুল রেখে বলে, 'মা-র মে একজনকে প্রাণমন দিয়ে ভালবাসায়-ও সুখ নেই। তার চেয়ে ভালবাসার কথা না-ভাবাই ভাল

'আমায় কেন সেদিন অমন ক'রে কাছে টেনেছিলে তা বলবে লায়লী?'

'মা-কে কষ্ট দেব ব'লে। মা-আমায় অনেক কষ্ট দিয়েছে! অথচ মজা দেখুন, মা-কে দুঃ দিয়েছি বলে আপনাকে দেখলেই আমার ঘেন্না করে।'

'ঘেন্না করে!'

'হ্যাঁ। যেদিন মা-র কাছ থেকে আপনাকে কেড়ে নিই সেদিন আমার মনে মনে খুব আ ছিল আপনি আমার অহঙ্কার ভেঙে দেবেন। আপনি মা-র পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন। তা দে হয়তো আমি কষ্ট পাব। তবু আমার বুকটা দশ হাত হ'য়ে যাবে। আমি জানব যে পৃথিবী ভালবাসাই সবচেয়ে বড়। তা যদি দেখতাম ঈশ্বরলালজী, তবে বোধহয় আমিও একদি ভালবাসতে পারতাম। কিন্তু—'

তার চোখ দুটো যেন দপদপ করে, সে বলে, 'আমি দেখলাম একটা অল্পবয়সী মেয়ে রূপযৌবনের জোর অনেক বেশী, তার কাছে পনেরো বছরের পুরনো প্রেম একনিমেষে মি হয়ে যায়। ঈশ্বরলালজী, আমি জিতেছি। কিন্তু এ জয়ে আমার গর্ব হয়নি। আর জিতে পেয়েছি, সে বস্তুর ওপরেও আমার কোন টান নেই।'

সত্যিই ছিল না।

কোন টান ছিল না, কোন আকর্ষণ ছিল না। তাই একদিন অনায়াসে ঈশ্বরলালকে ত্যা করল লায়লী। বলল, 'আর আসবেন না। আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় লায়লী?'

'কলকাতা। আলি শাহ যেখানে আছেন।'

'লায়লী, একেবারে চলে যাবে?'

'একেবারে।'

লায়লী বাড়ীর ভেতর চলে যেতে গিয়ে ফিরে এল। তার চুল রুক্ষ। তার চোখের নি কালি। বলল, 'আর একটা কথা আপনার জানা দরকার। তিলোয়াইতে আমার মা মারা গে তার অসুখ হয়েছিল। সে আমাকে জানায় নি, আপনাকেও জানায়নি। না ঈশ্বরলালজী, লক্ষ্নৌ এ আমি আর থাকতে পারছি না।'

দশদিন বাদেই লায়লী আশমান লক্ষ্নৌ ছেড়ে চলে গেল।

॥ আঠারো ॥

বজরঙ্গী যখন লায়লীকে দেখে, সে আশ্চর্য হয়ে যায়।

কুন্দন এ বাড়ীতে একজন নতুন মানুষকে আনছে তা সে জেনেছে।

তার একদিনের পরিচিত মুন্নিই যে লায়লী আশমান এ খবর তার জানা ছিল না।

লায়লী আসবার আগে এ বাড়ীতে সে কত আয়োজন। বাড়ী রঙ হলো। সাহেববাড়ী থেকে াসবাবপত্র এল। চীনে কারিগর এসে সুন্দর কাঠের ঝরোখা বানাল। নার্সারীর মালী এসে াগানের নকশা করল। দরজা-জানলায় পর্দা, মেঝেতে গালচে, স্নানের ঘরের মেঝেতে সাদা াথর।

বজরঙ্গী দেখে বড় খুশী হলো। তার মালিক এত খুশী হয়েছে, তাতে যেন তারও কত ানন্দ।

লায়লীর সামনে সে আসতে চায় না। মালিক বলেছে, 'ওকে খাতির ক'রে চলিস জরঙ্গী। ও বড় খেয়ালী।'

বজরঙ্গী দূরে দূরে থাকে। লায়লীর কাছে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'কারিগর সেছে। সোফাসেটির ঢাকনি এনেছে।'

কখনো বাগানের ফুল তুলে পাঠিয়ে দেয়। কুন্দন এলে ওকে ডাকে। ও এসে দাঁড়ায়। কুন্দন লে, 'বজরঙ্গী, মালকিনের খুব ইচ্ছে বাগানে একটি ছোট প্যাগোডা বসানো হয়।'

'আচ্ছা।'

'মিস্ত্রী পাওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়। ঐ চীনে মিস্ত্রীরাই খোঁজ দিতে পারবে।'

'বজরঙ্গী, বজরাটার ভেতরে গদী বসানো হয়নি।'

'এবার হবে।'

বজরঙ্গী দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লায়লী জানলার পাশে একটি কুর্সীতে সে আছে। অল্প অল্প দুলছে। একটি রেশমের নরম দড়ি দেওয়ালের গায়ে। সেটির একপ্রান্ত য়লীর হাতে। লায়লী সেটা অল্প অল্প টানছে। ওপরে ঝাড়লণ্ঠনে ঝাঁকানি লেগে শব্দ হচ্ছে . টাং।

লায়লী চোখ বুজে আওয়াজ শোনে। বজরঙ্গীর দিকে চায় না। বলে, 'কুন্দন, আসল থাটাই ভুলে যাচ্ছ।'

'কি লায়লী?'

'মিড্লটন রো-তে মেমসাহেবের সব জিনিস না নীলামে তুলে দেবে? তুমি আমাকে নিয়ে াবে না?'

াত্যিই তো! কুন্দনের মনে পড়েছে। মিসেস এলিস-এর বোর্ডিং-বাড়ীর সব যে নীলামে ঠছে। মিসেস এলিস এতদিন বাদে ব্যবসা থেকে ছুটি নিচ্ছেন। বিয়ে ক'রে চলে যাচ্ছেন াচী। তাঁর বোর্ডিং-বাড়ীর ঘরে ঘরে কত আসবাব, কত পর্দা, চাদর, কাঁচের বাসন! মলক্কা তের একটি সুন্দর সেট কিনতে চেয়েছে লায়লী।

কুন্দন ব্যস্ত হয়ে বলেছে, 'বজরঙ্গী শীগগির খবর দে! গাড়ী জুড়তে বল।'

বজরঙ্গী ব্যস্ত হয়ে নিচে নামে। সে আবদুলকে ডাকে। আবদুল তাড়াতাড়ি ছুটে যায়। সহিস াকে এলোপাতাড়ি ধাক্কা মারে। বলে, 'সরে যা বেটারা, গাড়ী জুড়তে হবে।'

সহিসরা মাথায় টুপি পরে নেয়। গাড়ীর পেছনে উঠে পড়ে। বড় বড় বাদামী ঘোড়া। গায়ের াড়া চকচক করছে। গলায় ঘণ্টা।

গাড়ীবারান্দায় গাড়ী এসে দাঁড়ায়।

বজরঙ্গী ছুটে ওপরে চলে যায়। বলে, 'মালিক, গাড়ী তৈরী।' বলতে গিয়েই সে লজ্জ বেরিয়ে আসে। কুন্দন লায়লীর গলায় হার পরিয়ে দিচ্ছে। লায়লীর শাড়ীর আঁচলটা মাটি লুটোপুটি খাচ্ছে।

সে নিচে চলে আসে। মালী ছুটতে ছুটতে এসে দুটো গোলাপ ফুলের তোড়া তার হা দেয়। গাড়ীতে সেগুলো তুলে দেয় বজরঙ্গী।

লায়লী নেমে আসে, সঙ্গে কুন্দন। নীল বেনারসীর আঁচলটা লুটোতে লুটোতে লায় গাড়ীতে ওঠে। গাড়ীর জানলায় পর্দা। দরজা বন্ধ হ'য়ে যায়। একটা খিলখিল হাসি শোনা য তারপরই গাড়ীটা বেরিয়ে যায় রাস্তায়।

ওপরে আসে বজরঙ্গী।

কুন্দনের অনুপস্থিতিতে তাব অনুমতি না নিয়ে ওপরে সকলের আসার হুকুম নেই। লায়ল দাসীরা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। বজরঙ্গী ঘরে ঢুকে যায়।

ভ্রূকুটি ক'রে দাঁড়ায় সে, ঠোঁট কামড়ায়। বিছানার রেশমের চাদর মাটিতে লুটোচ্ছে। বড় কানবালা, পান্নার কণ্ঠি, বাজুবন্ধ বিছানায় পড়ে আছে।

বজরঙ্গী সেগুলো তোলে। পকেটে রাখে। বেরিয়ে আসে। নিচে নিজের ঘরে বসে মহারাজকে খবর পাঠায়। তাড়াতাড়ি খাবার চাই তার। চীনে কারিগরের খোঁজে বেরুতে হ

কিন্তু ছুটতে ছুটতে আসে একটি সহিস।

'বজরঙ্গী সাব! বজরঙ্গী সাব!'

'কি হয়েছে? আরে, তুই তো গাড়ীর সঙ্গে গেলি রে!'

'আপনি এখনি চলে যান। হগসাহেবের বাজার থেকে ফল নিয়ে যান, মাংস, চাল মটরশু ওরা গাড়ী নিয়ে বারাকপুর চলে গেল। সেখানে কুঠিবাড়ীতে রান্না হবে, খাওয়া হবে।'

'মালিক, মালিকের খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?'

'আমি কি জানি। আপনি একটা কেরাঞ্চি গাড়ী নিয়ে চলে যান।'

বজরঙ্গী উঠে পড়ে। তাড়াতাড়ি জামাজুতো পরে নেয়। গাড়ী ডাকতে বলে।

অনেক পরে বারাকপুরের পথে চলতে চলতে বজরঙ্গী ভাবে আজ আর মালিকের খাও দাওয়া হবে না।

বারাকপুরে গঙ্গার ধারে কুঠি। বাবুর্চি এসে গেছে, চাকররা ছুটোছুটি করছে। আবদার হয়ে জল ভরছে। বজরঙ্গীকে দেখে সবাই অনুযোগ করে আগে থেকে খবর না দিয়ে মা এল কেন?

আবদার বলে, 'বজরঙ্গী সাব, নতুন মাল্কিন তো আশমানের পরী!'

'ওরা কোথায়?'

'বাগানে।'

বাগানে গাছের নিচে গালচে। তাতে আধ-শোওয়া হয়ে বসে আছে লায়লী আর কুন সামনে দাবার ছক। এই ভরদুপুরে দু'জনে দাবা খেলতে বসেছে। পাশে শরবতের গেলা

দাবার ছক যখন তোলা হয় তখন চাঁদ হেলে গেছে।

সন্ধ্যাবেলা লায়লী হঠাৎ বলে বসে, 'আজ আর ফিরব না কুন্দন, আজ এখানে থাক

বজরঙ্গীর মত কেউ জানতে চায়নি। তবু বজরঙ্গী হঠাৎ বলে, 'তা কি ক'রে হবে? মালিকের তাহলে খাওয়া হবে না।'

'তাই বুঝি? তা তোমার মালিক নয় আমার জন্যে উপোসই করল একদিন!'

কুন্দন বিব্রত হয়ে বলে, 'বজরঙ্গী যা, ওদিকে যা। আমার খাওয়ার জন্যে আবার ভাবনা।'

বজরঙ্গী বলে, 'তবে আমিই যাই। কলকাতায় একটা খবর দিই গে।'

'কোথায় যাবি বাপু? আঁধার হয়েছে না?'

'মালিক, খিদিরপুরের বাড়ীর সব ঘরদোর খোলা।'

লায়লী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, 'তাতে তোমার কি? তোমাকে মালিক নিজের কাজে যেতে বলছে যাও না!'

বজরঙ্গী কুন্দনের দিকে চেয়ে থাকে। কথা যদি শুনতে হয় কুন্দনের কথাই শুনবে ও, এমনি ভাবখানা।

'বজরঙ্গী, যা!' কুন্দন চোখটা নামিয়ে নেয়।

বজরঙ্গী চলে এল।

সে বারান্দায় চলে এল।

সে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ঘরে আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে! ওরা বোধ হয় বিশ্রাম করছে। খুব ক্লান্ত লাগে বজরঙ্গীর, সে একটা নেয়ারের খাটিয়া টেনে আনে। তারপর একটা চাদর খুঁজতে যায়। এ বাড়ীর বাক্স-ঘরে একটি কাঠের আলমারি আছে। তাতে চাদর থাকে, পর্দা থাকে। বজরঙ্গী একটি সাদা চাদর নিয়ে আসে। খাটিয়ার কাছে এসে সে থমকে দাঁড়ায়।

লায়লী বসে আছে। লায়লী হাসল। বলল, 'বস বজরঙ্গী।'

বজরঙ্গী দাঁড়িয়ে রইল।

'কি, শুনতে পাচ্ছ না?'

'হ্যাঁ।'

'বসছ না কেন?'

বজরঙ্গী দেওয়ালে হেলান দেয়। বলে, 'বসব না।'

লায়লী একটু হাসে। বলে, 'বজরঙ্গী, প্রথমদিন তুমি আমায় চিনতে পেরেছিলে?'

'জী।'

'ওকি, অমন ক'রে কথা কইছ কেন?'

'মালিক ডাকছেন বোধহয়, দেখে আসি।'

'তোমার মালিক ঘুমোচ্ছে বজরঙ্গী।'

লায়লী একবার বাইরের দিকে চাইল। বলল, 'কেন যে আসতে চাইলাম, থাকতে চাইলাম। এখন মোটে ভাল লাগছে না। কি রকম আঁধার আঁধার, বড় বড় গাছ! বাড়ীটাও বড় পুরনো।'

'পুরনো বাড়ী, সাহেবদের বাড়ী।'

'তাই বুঝি এত জিনিসপত্র, আসবাব?'

'হ্যাঁ। বাড়ীটা যেমন ছিল, তেমনিই আছে। মালিক বদলায়নি।'

'তোমার মালিকের অনেক বাড়ী আছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। মালিকের যে বাড়ীটা চোখে লাগে সেটাই কিনে নেয়।'

বলেই বজরঙ্গী নিজেকে সামলে নিল। কে জানে মালিক ওকে এ সব কথা বলেছে কিনা না বলে থাকলে বজরঙ্গী বলার কে!

'তোমার মালিকের অনেক টাকা তা আমি জানি। আমাকে কিনে নিতে চায়, দেখনি?'

হঠাৎ সব ভুলে যায় বজরঙ্গী। দূরত্ব রেখে চলবার সংকল্প আর মনে থাকে না। সে বলে 'তা কখনো পারে? মালিককে কিনে নিয়েছেন না আপনি?'

'এই যে কথা ফুটেছে দেখছি। আমি মালিককে কিনে নিয়েছি?'

'মালিক আপনাকে খুশী রাখতে চায়। আপনি খুশী হলে মালিক আনন্দ পাবে।'

'মালিক, মালিক, শুধু কুন্দনের কথা! আমাকে আপনি বলছ কেন? এমন ভাব দেখাচ্ছ যে আমায় চেন না। কোন দিন দেখনি।'

আপনি মিছেমিছি রাগ করছেন। প্রথমদিন আমি কথা কয়েছিলাম। সেটা আপনার বে আদবী মনে হয়েছিল। বার বার মাত্রা ছাড়ানো কি ভাল?'

'বজরঙ্গী, তুমি সেদিনের কথাটা মনে রেখেছ?'

'ঐ শুনুন, মালিক ডাকছে।'

সত্যিই কুন্দন উঠে এসেছে। ঘুম ভেঙেছে। আলস্য বিজড়িত পদক্ষেপ। চোখটা লাল গলাটা ভারী।

'কি করছ কি তোমরা?' কুন্দন লায়লীর পাশে ধপ ক'রে বসল। লায়লী কুন্দনের হাতে নিজের বেণীটা জড়াতে জড়াতে বলে, 'দুটো একটা কথা শুধোচ্ছিলাম। তোমার বজরঙ্গী ব বে-আদব বাপু!'

'কেন রে, কি বে-আদবী করেছিস? অ্যাঁ?'

বজরঙ্গী নিরুত্তর। কুন্দন ভারী গলায় হাসে। বলে, 'ওর কথা ধ'রো না। ও আমাকেই কখ কি বলে তার ঠিক নেই। বজরঙ্গী!'

'মালিক!'

'যা, ওদিকে একটু দেখ্। আজ কি খাওয়া-দাওয়া কিছু জুটবে?'

বজরঙ্গী চলে যায়।

অনেক রাতে খাওয়া-দাওয়া মেটে, অনেক রাতে বজরঙ্গী বারান্দায় নেয়ারের খাটটিতে শুয়ে পড়ে। সকালের রোদ চোখে না পড়া পর্যন্ত তার ঘুম ভাঙে না।

সকাল বেলা তাকে ডাকতে থাকে সহিসটা। 'উঠুন, উঠুন! ওরা কলকাতা চলে গেে ভোরবেলা। আপনাকে বলেছে কেরাঞ্চিগাড়ী ক'রে নিতে।'

সহিসটা কাছে আসে এবং চোখ গোল গোল ক'রে বলে, 'বজরঙ্গী সা'ব! নতুন মালকিনে কি মাথাটা খারাপ?'

'কেন রে!'

'বালিশ তাকিয়া সব গাড়ীতে ওঠালে। বললে ঘুমোতে ঘুমোতে কলকাতা যাব।'

বজরঙ্গী বলল, 'যা, নিজের কাজে যা!'

কুন্দনের মা বজরঙ্গীকে ডেকে পাঠাল।

বজরঙ্গী আগে অন্দরে আসেনি। এখন সে সদর-অন্দরের মাঝের গলিটায় এসে দাঁড়ায়

'হ্যাঁরে, কুন্দন আজকাল মাঝে মাঝে আসে না কেন?'

'ব্যস্ত থাকেন।'

'তুই তাকে ঠিক সময়ে বাড়ী পাঠাতে পারিস না? গোপাল বলে কাজের লোকরা বসে বসে লে যায়? ক্ষতি হয় না?'

'বলব।'

'বলিস। তোকেও শুনতে পাই ভাল ঘর, আসবাব দিয়েছে। সুবিধে পেয়ে খুব লুটছিস ওকে াই না?'

বজরঙ্গী কথা কয় না। তার কান এবং গলা লাল হয়ে যায়। মনে হয় কান দিয়ে আগুন বরুচ্ছে।

'যা। ওকে বলিস মন্দিরে কিছু টাকা পঠিয়ে দিতে।'

সে নিজের মনেই বকবক করে, 'এমন জায়গায় আমাকে আনল কুন্দন যে ওর বাপের নামে ুণ্যকাজ করবার উপায় নেই। এখানে জলসত্রই বা কোথায় খুলি! ও মন্দিরে যেতে আমার বৃত্তি হয় না বাপু।'

আবার বজরঙ্গীকে প্রশ্ন ক'রে বসে কুন্দনের মা।

'হ্যাঁরে বজরঙ্গী, খানিকটা জমি কিনে পুকুর কাটিয়ে দিতে পারে না একটা কুন্দন? বাবার কটা স্মৃতি থাকে? এদিকে ও মেয়েটা চাইলে বোধহয় আকাশের চাঁদ পেড়ে এনে দেয়। এটা ক ভাল হচ্ছে? কোথাকার কে, জাত-ধর্মের ঠিক নেই তাকে নিয়ে এতটা মাতামাতি, মাখামাখি ক ভাল?'

নিজে প্রশ্ন করে, নিজেই জবাব দেয়, 'বোধ হয় দেখতে সুন্দর। সুন্দর মুখের কাছে সবাই শ থাকে কি না!'

বিব্রত হয়ে বজরঙ্গী চলে যায়।

কুন্দনের ঘর থেকে ক'টা কাজের জিনিস নেয়। ও বাড়ীতে গিয়ে দেখে ওপরে খুব হইহই। াতের ওপর গালচে যাচ্ছে, তাকিয়া যাচ্ছে।

বজরঙ্গী কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবে। কুন্দনের মা, গোপাল এরা তাকে প্রায়ই বলে থাকে সে াকি কুন্দনেব দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সুবিধে ক'রে নিচ্ছে। কুন্দনের কাছে কোন কথা বলে া তারা। বজরঙ্গী ভাল ক'রেই বোঝে কুন্দন যে তাকে স্নেহ করে সেটা এরা ভাল চোখে দখে না।

'নিজের ভাইপো পড়ে রইল, পরের কে না কে তাকে সোনাদানা খাওয়াচ্ছে।'

এ কথাটা বার বার বলে কুন্দনের মা। মাঝে মাঝে হাসি পায়, মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। ন্যলোকের কথা কি, কুন্দন পর্যন্ত জানে·না বজরঙ্গীকে কত অসুবিধে সইতে হয়। কুন্দন নেক সময়ে কাজে ব্যস্ত থাকে। চলে যায় গাজিপুর, চলে যায় বোম্বাই। বজরঙ্গী ওর ঘর াহারা দেয়। তখন ও-বাড়ীর মহারাজ তাকে ভাতের পাতে তরকারী দিতে ভুলে যায়। দুধ দই দিতে তাদের মনে থাকে না।

কুন্দন দিনে খায় না। রাতে একটিবার তার আহার। তখন সে অন্দরে যায়। ... সে মোড়ায় বসে, মা বসে। দরজার পেছনে ভাইবউ দাঁড়িয়ে থাকে। কুন্দন কোনদিকে চায় া। মাথা নিচু ক'রে এক মনে খেয়ে যায়।

থালার পাশে সারি সারি বাটি দেখে তার কি যেন মনে পড়ে যায়। ভরাট গলায় বলে 'বজরঙ্গী খেয়েছে? খাওয়া হয়েছে ওর?'

'হ্যাঁ। তুই খা দিখি।' ওর ঠাকুমা বলে।

কুন্দন ঘরে এসে শুধোয়, 'তুই খেয়েছিস? হ্যাঁ রে, তুই খেয়েছিস?'

'হ্যাঁ মালিক। তুমি শোও।'

কুন্দন শুয়ে পড়ে। বজরঙ্গী তখন উঠে ভেতরে চলে যায়। অন্ধকার বারান্দা। রেড়ী তেলের পিদিম। মহারাজ ঘুমে ঢুলছে বসে বসে। বজরঙ্গীর কোনদিন খিদে মেটে কোন দি মেটে না। সে কিছু বলে না। অন্য লোকজনকে অসুবিধেয় ফেলতে তার সঙ্কোচ হয়।

কুন্দনের সব কিছুতে তার অবাধ অধিকার। সে জন্যেই বজরঙ্গী তার নিজের জন্যে চার পয়সা খরচ করতে এত সঙ্কোচ অনুভব করে। তার পকেটে যখন একশো টাকার তোড়া, খুচরো নেই বলে কালীঘাট থেকে খিদিরপুর, খিদিরপুর থেকে বড়বাজার সে হেঁটে চলে যায়।

বজরঙ্গী বসে বসে ভাবতে থাকে।

হঠাৎ অভিমান হচ্ছে তার। কুন্দনের ওপর রাগ হচ্ছে, তবু ওরা ভাবে সে কুন্দনে দুর্বলতার সুযোগ নিজের ট্যাঁক মোটা করছে।

টাকা-পয়াসার ব্যাপারে কুন্দন তাকে ছাড়া আর কারুকে বিশ্বাস করে না। গদী থেকে টাক বাড়ীতে আনবার দায়িত্ব এমনকি গোপালকেও দেয় না কুন্দন।

কুন্দনের কাজ করতে গিয়ে কতদিন তার খাওয়া হয় না। কতদিন হয়তো বেলা একটা ফিরলেও সঙ্গে সঙ্গে কুন্দন তাকে পোস্তা বা শ্যামনগর পাঠিয়ে দিয়েছে।

এ বাড়ীতে কুন্দন তার থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে বটে। কিন্তু টাকা-পয়সা রাখত আনতে তাকে বার বার ও-বাড়ী যেতে হয়। কুন্দনের মা-কে দেখলে ভয় করে তার। ফর্সা রং চোখের নিচে কালি। কাঁচাপাকা এক মাথা চুল। অর্ধেক চুলে জট বেঁধেছে, সেগুলো জটা মতো দোলে। কিছু চুল জটার মতো দোলে, কিছু চুল রেশমকোমল। পিঠের ওপর ছড়িয়ে থাকে। কখন চোখের চাহনি কি কোমল, নরম! যেন মায়ামমতা ঝরে ঝরে পড়ছে। কখন চোখ জ্বলতে থাকে। বড় বড় চোখ করে এদিক ওদিক তাকায় কুন্দনের মা। আর কি অসংল কথাই না বলতে পারে!

ওকে দেখলেই ভয় করে বজরঙ্গীর। কুন্দনের বাড়ীর সব লোকগুলোই যেন কেমন কেমন

গোপালকে দেখলে বোঝা যায় না ও কুন্দনের ভাই। ফর্সা রঙ, সুন্দর চেহারা, ও যে সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। 'আমি বাবা কোন কথায় নেই। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ।' গোপা একথাটি চেঁচিয়ে বলে।

যে এ কথা চেঁচিয়ে বলে সে সত্যিই শান্তিপ্রিয় মানুষ কিনা বজরঙ্গীর সংশয় আছে 'যদি শান্তি ভালবাস তবে কেন দিন নেই রাত নেই গদীতে বসে খাজাঞ্চির সঙ্গে গুজগু কর বাবা! মালিকের মুখে ফালতু কথাও নেই, আবার অত ফিসফিস কানে কানে কথা নেই।'

বজরঙ্গী মনে মনে বলে।

গোপাল মাঝে মাঝে গদী থেকে টাকা নেয়। বজরঙ্গী তা জানে তবে কুন্দনকে কিছু বলে না। বজরঙ্গীর মনে হয় কুন্দন বোঝে। কুন্দন বাড়ীর লোকদের সম্পর্কে কচিৎ কোন মন্ত

চরে। নেহাত তিতিবিরক্ত হলে বলে, 'যেতে দে! যা ইচ্ছে করুক ওরা। ভারী পরোয়া করি আমি। আমার কর্তব্য আমি ক'রে যাচ্ছি। কর্তব্য ক'রে কেউ স্বর্গে যায়নি, আমিও যাব না।'

বজরঙ্গী চুপ ক'রে থাকে।

কুন্দন বলে, 'ওদের কথা ভাবিস না; যেতে দে! দাঁড়া না একটু বুড়ো হয়ে নিই। ওদের হাতে তুলে দেব সব। দিয়ে চলে যাব। আমি আর তুই।'

জামা-কাপড় বদলায় কুন্দন। কোমর থেকে বিছুয়াটা খুলে বজরঙ্গীর হাতে দেয়। বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। চোখ বুজে বলে, 'ওদের কথা এক কান দিয়ে শুনবি, এক কান দিয়ে বের ক'রে দিবি। ওরা আমার কে!'

মাঝে মাঝে কুন্দন ক্ষেপে ওঠে। গোপালের ছেলেকে ডাকে। নির্মম ভাষায় বলে, 'পুণ্যবান! পুণ্যবান সব! আরে পাপীর পয়সায় খায়-পরে যারা তাদের অত ঘন ঘন দেবমন্দিরে যাবার দরকার কি? যাবি তো যা! অমন দু'শো পাঁচশো টাকা থাকল কি গেল কুন্দন পরোয়া করে না। কিন্তু আমি জানতে চাই বজরঙ্গীকে ডেকে মনোহর বান্দা, নফর বলেছে কেন! ওকে ডেকে টাকাপয়সার হিসেবই বা চাস কেন? জবাব দে!'

গোপালের ছেলে মনোহর কেঁদে ফেলে।

কুন্দনের মা ছুটে আসে, ঠাকুমা ছুটে আসে। গোপালের বউ দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে।

গোপাল বলে, 'কে বলেছে তোমায় এ সব কথা?'

'ও বলেনি! ও তোদের মতো লেখাপড়া শেখেনি। চুকলি যেতে শেখেনি। কে বলেছে! গোপাল, তুমি কখন কখন হীরালালের গদীতে যাও, কখন মসলার আড়তে যাও সব খবর আমি পাই।'

গোপালের মুখ সাদা। কুন্দন তার মা-ঠাকুমাকে বলে, 'যাও এখান থেকে! পুণ্যবতী সব! একটা মানুষ সময়ে খায় কিনা তার খবর রাখতে পার না!'

তারপর নিজেই চেঁচাতে থাকে, 'দূর ক'রে দেব সব! বেরিয়ে যাব! থাকব না! আমার কি, আমার নিজের কে আছে রে বাপু!'

ক'দিন বজরঙ্গীর সুখ-সুবিধের দিকে তটস্থ দৃষ্টি রাখে বাড়ীর লোকজন। বজরঙ্গী বিব্রত বোধ করে। ক'দিন কুন্দনের হাঁকডাক শোনা যায়, 'নিজের সুখসুবিধে আদায় ক'রে নিবি। আরে হতভাগা, নাওদারী বুদ্ধি নিয়ে কি বাঁচা যায়? চাইতে হয়, জোর গলায় চাইতে হয়। যে চাইতে জানে না, তাকে কেউ কিছু দেয় না।'

আবার সব হইচই থেমে যায়।

কুন্দন ভুলে যায়। বাড়ীর লোকজন ভুলে যায়। আবার অনেক রাত অবধি বসে ঢুলতে থাকে বজরঙ্গী। একসময়ে মহারাজ তাকে ডাকে। অন্ধকার বারান্দা। রেড়ীর তেলের পিদিম। রুটি, ভাত, ডাল আর আচার। কিছু না বলে খেয়ে উঠে আসে বজরঙ্গী।

কিন্তু আজকের এই অভিযোগ!

ভাল ক'রে দেখে বজরঙ্গী, খাট, গদী, চেয়ার টেবিল, আলনা। বড় বড় সেজবাতি। কে এ সব চেয়েছে বাপু? বজরঙ্গী এ সব চায় না। বজরঙ্গী এখানে পড়ে আছে শুধু মালিকের মুখ চেয়ে।

বজরঙ্গী জীবনেও মালিককে কোন মেয়ের দিকে চাইতে দেখেনি।

'বিয়ে কর মালিক। তোমাদের দু'জনের সেবা করি।'

'আমাকে মেয়ে দেবে কে রে? আমার নাম শুনলে ভয়ে চমকে ওঠে সবাই।'

'তারা তো জানে না তুমি কত ভাল।'

'তুই তো জানিস, তাই না?'

'জানিই তো!'

'বিয়ে দেব তোকে। তোর বিয়ে হবে, সংসার হবে। সেখানে থাকব আমি।'

বজরঙ্গী হাসে। বলে, 'আমাকেই বা কেন মেয়ে দেবে?'

'বলব তুই আমার বজরঙ্গী। সুন্দর একটা মেয়ে আনব তোর জন্যে। তাকে নিয়ে দূরে যাবি, অনেক দূরে।'

'দূরে যাব কেন, তোমার কাছে থাকব।'

'আমার কাছে তোকে থাকতে দিচ্ছে কে? দূরে যাবি, খেটে খাবি। আমি যাব তোর ক

'আমি তোমায় বসিয়ে খাওয়াব?'

'হ্যাঁ। একবার তো মোটে খাই রে? তোর বেশী খরচ হবে না।'

'তোমার বাড়ীর লোক তোমায় ছাড়বে কেন?'

'তারা যে আমায় বড্ড ভালবাসে, তাই না রে! তুই দেখে নিস এই মামলার কার গাজিপুরে গোলাপের ব্যবসা, নৌকোর কারবার হাতে তুলে দিলে সবাই আমায় খেদিয়ে নিশ্চিন্ত হবে।'

বলতে বলতে কুন্দনের গলায় ভীষণ আক্রোশ ফুটে ওঠে। সে পায়চারি করতে থ বলে, 'ওরা পুণ্য করবে। পাপীকে তাড়িয়ে দিয়ে গঙ্গাজলে ধোবে বাড়ী। রামায়ণ পড়

'মালিক, তুমি রেগে যাচ্ছ।'

'তোর কথা শুনলে যে মরা মানুষের রাগ হয় রে! গাধা একটা, উল্লুক। ভগবান দুটো দিয়েছে, তা জগৎ-সংসারের আসল চেহারা দেখতে শিখলি না। মানুষ হ' বজরঙ্গী। ব দেখি!'

'বড় হতে চাই না বাপু। শুধু তোমার কাছে থাকতে দিও।'

'কেন? বড় পাণ্ডাজী, ভক্তিমান বাবুসাহেব, আমার কাছে কেন?'

'আমি ছাড়া কেউ যে তোমায় দেখে না। সবাই তোমার টাকা ভালবাসে।'

'আর কথা বলিস না। নে পা-টা টেপ্ তো! আবার ময়লা জামা পরেছিস। ময়লা পরিস কেন, জামা নেই তোর?'

কুন্দন পা তুলে দেয়। এমন সহজ অধিকারে সে চাকরটাকেও পা টিপতে বলতে পারে বলে, 'ওঃ, সারেঙ্গীর ছড় টানিস তাতে হাত এমন কড়া হলো কি করে?'

বজরঙ্গীর আজ সব কথা মনে পড়ছে। রাগ হচ্ছে, দুঃখ হচ্ছে। এতদিনে মালিক যদি এ মনের মানুষ পেল, সে মালিককে দু'হাতে লুটছে।

'ছাতে গেছেন। ছাতে বসে মজলিস হবে!'

গজগজ করতে করতে ওপরে উঠে গেল বজরঙ্গী। ছাতে চলে গেল। যা ভেবেছে কুন্দন ফরাসে কাত। লায়লী তার হাত ধরে হাতের রেখা দেখছে।

'মালিক।'

'কে, বজরঙ্গী? কি হয়েছে?'

'মালিক, পরে বলব।'

লায়লী হাসল। বলল, 'আমার সামনে বলবে না, তাই না বজরঙ্গী?'

কুন্দন বলে, 'কি যেন হয়েছে ওর। কি হয়েছে রে?'

'মালিক, আমি ও বাড়ীতে আর যাব না।'

'কেন?'

'তুমি আমায় ঘর দিয়েছ, আসবাব দিয়েছ, মা আমায় কত কথা শোনালেন। তুমি ও বাড়ীতে যাও না কেন? আমাকে সবাই...' বজরঙ্গীর গলা ধরে যায়। আর কথা কইতে পারে না।

'বটে! এখন সে কথা বলতে এলি কেন?'

লায়লী বলে, 'তা তো বলবেই কুন্দন। চাকরকে কেউ এমন আস্কারা দেয়?' তার ঠোঁটে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি। কুন্দন হঠাৎ চটে উঠল।

সে উঠে বসে। বলে, 'এরা আমায় শান্তিতে থাকতে দেবে না। বজরঙ্গী, গাড়ী আছে?'

'মালিক, তুমি এখন যাবে?'

'যাব না। তুমি এসে প্যানপ্যান করবে, তারা তোমায় কথা শোনাবে। দাঁড়াও!'

সে জুতো পরে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'যাবার দরকার ছিল, রাতে যেতাম। তা এখনই যাব।'

বজরঙ্গী বিপন্ন দৃষ্টিতে লায়লীর দিকে চায়। বলে, 'আপনি মানা করুন মালিককে।'

'না কুন্দন, তুমি যাও!'

কুন্দন নামতে থাকে। বলে যায়, 'তুই ওপরে বসে থাক্। লায়লী ওকে আসতে দিও না। উনি পূজক মানুষ, বড় পাণ্ডা। আমাকে এখনি লম্বা লম্বা উপদেশ দেবে।'

'মালিক, তুমি আমার কথা শুনে যেও না।'

'আরে হারামজাদা, আমি টাকা আনব। তোকে আবার পাঠাব কেন?'

'কত টাকা! আমি দিচ্ছি।'

'তোর কাছে কত আছে?'

'তিন হাজার।'

'না না, আমি আরো টাকা চাই। আরে গাধা, ভোরবেলা গাজিপুর যাব না?'

কুন্দন নেমে যায়।

বজরঙ্গী বলে, 'আপনি কেন মানা করলেন না?'

লায়লী হাই তোলে। বলে, 'যেতে দাও না বাপু। সব সময়ে আমার মুখপানে চেয়ে বসে আছে, আমারও ভাল লাগছে না।'

'ও, মালিকের টাকা ভাল লাগে, মালিকের সঙ্গ ভাল লাগে না?' কথাটা বলেই বজরঙ্গী ভয় পেয়ে গিয়েছে। এত বড় কথাটা বলা হয়তো তার উচিত হয়নি। কে জানে লায়লী চটে গেল কি না!

লায়লী কিন্তু সহজভাবেই নিয়েছে কথাটা। বলেছে, 'কথাটা তো মিথ্যে নয় বজরঙ্গী। আমাকে টাকা দিয়ে বেঁধে রেখেছে তোমার মালিক। আমার যদি ভাল না লাগে, দোষ দিতে পার?'

'আমি আপনাকে দোষ দেবার কে?'

'বজরঙ্গী, তোমাকে কি দিয়ে কিনেছে বল তো? ওর জন্যে তুমি প্রাণ দাও কেন?'

'কি বলব!'

'আমার জানতে ইচ্ছে করে। ও-ই বা কেন তোমার কথা এমন মানে?'

'মালিকা, আপনি তো আমার মালিকের প্রাণমন কিনে নিয়েছেন।'

'তার মানে?'

'সত্যি বলছি। আপনার হাসিটুকু দেখবার জন্যে মালিক প্রাণ দিতে পারে। আপনি বোঝেন না মনুষটা মনে মনে কি রকম ভালবাসার কাঙাল?'

'না। বুঝি না। আর তোমাকেও বুঝি না।'

'কেন?'

'তুমি যেন আমায় চেন না। আমাকে ভুলেই গিয়েছ।'

'আমি যাকে চিনতাম সে কোথায়?'

'সে আমি।'

'না না, তার নাম মুন্নি। সে একটা কাগজের পতংগ পেলে কি খুশীই না হ'ত। আজ তো: মন পেতে মালিক সর্বস্ব লুটিয়ে দিচ্ছে।'

'বজরঙ্গী, সে ভাল না আমি?'

'সে অনেক ভাল ছিল। তুমি অবশ্য অনেক সুন্দর। কিন্তু তার মনপ্রাণ অনেক বড় ি লায়লী। এখন দেখছি লোকে যা বলে তা সত্যিই।'

'কি বলে?'

'অনেক দাম না দিলে লায়লী আশমানের মন পাওয়া যায় না।'

'লোকে বলে!' লায়লী উঠে বসেছে। তার গলার হারটা বুকের ওপর উঠছে নামছে। জে জোরে নিশ্বাস ফেলে লায়লী। বলে, 'লোকে জানে না তাই বলে। কত দাম দিতে হয়ে মুন্নিকে, কত দাম দিয়ে সে লায়লী আশমান হয়েছে তা কি কেউ জানে? কেউ খবর রাখে লায়লী বজরঙ্গীর দিকে তাকায়। তার চোখে বেদনার ছায়া। মুখে নিষ্ঠুর হাসি।

'বজরঙ্গী, আমার হয়তো তোমার মালিককে ভালবাসা উচিত। কিন্তু মানুষকে ভালবা: মনপ্রাণ যে আমি পথে ফেলে এসেছি। মুন্নি থেকে লায়লী আশমান হবার জন্যে আম অনেক পথ হাঁটতে হয়েছে। তাই হয়তো আজ আমার সহজে মন ওঠে না।'

বজরঙ্গী নিরুত্তর।

'তোমার সে সব কথা মনে পড়ে বজরঙ্গী?'

'মনে পড়ে না? কতদিন, কত রাত ভেবেছি আবার তুমি আসবে। আবার এক নৌকোয় বেড়াতে শখ হবে তোমার। কত ভয় মনে, পাছে তুমি চিনতে না পার! ি লায়লী—'

'বল।'

'তুমি মালিককে একটু ভালবেস। মালিক বড় দুঃখ পেয়েছে জীবনে। তুমি জান না। ওকে একটু...'

'বজরঙ্গী!'

লায়লী তীব্র ভর্ৎসনা করেছে, 'মালিক, মালিক'! তার কথা আমি বুঝব। তুমি কেন নিজের অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাও?'

বজরঙ্গী আহত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছে। তারপর মৃদু নিশ্বাসের সঙ্গে বলেছে, 'আমাকে মাপ করবেন।'

'যেও না, দাঁড়াও!'

বজরঙ্গী যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়েছে! লায়লী বলে, 'তুমি আমাকে কুন্দন পাওনি। ভাল ক'রে কথা বললেই তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাও। নিচে যাও। আর, আর কখনো আমি আর কুন্দন যখন একলা থাকব তখন না ডাকলে এস না। নিচ থেকে আমার দাসীকে পাঠিয়ে দাও।'

বজরঙ্গী নেমে যাবার আগেই কুন্দন উঠে এসেছে। সঙ্গে একটি অচেনা লোক। কুন্দনের হাতে একটি মালা। কুন্দন বলে, 'দেখ লায়লী, তোমার পছন্দ হলো কি না!'

লায়লী বলে, 'গলায় পরিয়ে দাও।'

গলায় হার পরিয়ে দিয়েছে কুন্দন। বলেছে, 'কমল হীরে। বজরঙ্গী এই তোড়াটা নে। ওকে চার হাজার টাকা দিয়ে রসিদ লিখে নে।'

'দাঁড়াও বজরঙ্গী। কুন্দন, ওকে বলে দাও কমল হীরের ব্রেসলেট আর দুল আনতে।'

লোকটি হাঁ ক'রে লায়লীকে দেখছিল। সে সেলাম করে। কুন্দন বলে, 'ওকে টাকা দিয়ে ওপরে আসিস।'

বজরঙ্গী নিচে যায়। লোকটি রসিদ দিতে দিতে বলে, 'কুন্দন মিশ্র এতদিনে যত টাকা করেছে এবার সব উড়ে যাবে।'

বজরঙ্গী জবাব দেয়নি। টাকা দিয়েছে, রসিদ নিয়েছে। তারপর আবার ওপরে এসেছে।

লায়লী কুন্দনের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে কথা কইছে।

'কুন্দন, তোমার বজরঙ্গী বড় বে-আদব! সহবৎ জানে না।'

'লায়লী, তুমি ওকে শিখিয়ে নিও।'

'বজরঙ্গী শোন্, তোর মালকিন কি বলছে।'

বজরঙ্গীর মুখ গম্ভীর। সে রসিদটি দেয়।

'আমি তো চললাম। তুই দেখবি মালকিনের কোন অসুবিধে না হয়।'

'হ্যাঁ।'

'কুন্দন, ওকে বল সারেঙ্গী আনতে।'

বজরঙ্গী হঠাৎ কথা বলে। কুন্দনের দিকে চেয়ে বলে, 'আমি স্নান করতে যাচ্ছি মালিক। স্নান করব, খাব। তারপরে এলে হবে?'

'সে কি তুই খাসনি এখনো?'

'না।'

'যা যা!'

নেমে আসতে আসতে বজরঙ্গী শোনে কুন্দন বলছে, 'ওকে নিয়ে বড় মুশকিল লায়লী। হঠাৎ যদি ক্ষেপে যায় তবে চলে যাবে বঁড়শে।'

'বাঃ, বেশ আহ্লাদ দিয়েছ তো! তারপর?'

'তখন আমাকেই ছুটতে হয়। কি করি বল!'

'ওকে বিশ্বাস ক'রে যে অত টাকা দাও, ও বেইমানী করতে পারে না?'

'না লায়লী, ও বেইমানী করতে পারে না।'

নেমে এসেছে বজরঙ্গী। স্নান করেছে। মাহারাজ এসেছে খাবার নিয়ে, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর চুপ ক'রে গালে হাত দিয়ে বসে থেকেছে।

এক সময়ে সন্ধ্যে নেমেছে। কুন্দন নেমে এসেছে। বলেছে, 'বজরঙ্গী, আমি চললাম, তুই রইলি।'

'হ্যাঁ মালিক।'

'দেখবি, একটিবারও যেন বাড়ী ছেড়ে বেরোস নি।'

'না।'

'আর শোন, লায়লী বড় খেয়ালী। ও কখন কি বলে তাতে দোষ নিস না যেন।'

'না।'

'যখন যা বলে শুনিস।'

'শুনব।'

'ওকে চটাস না।'

'না। তুমি যাও।'

কাছে এসে হঠাৎ কুন্দনের বুকে হাত রেখেছে বজরঙ্গী। বলেছে, 'জাল পরেছ কেন?'

'হাফিজ নিয়ামৎ এসেছে বজরঙ্গী।'

'তবে আমি যাব। আমি তোমায় রওনা ক'রে দেব।'

'না না। আমি আরবিকে সঙ্গে নিলাম।'

'তুমি মারামারি করতে যেও না।'

'না। তুই আমার জন্যে ভাবিস না।' কুন্দন রুক্ষ গলায় বলে। কুন্দন তার দিকে তাকায় চোখ লাল হয়ে ওঠে। কুন্দন ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জে ওঠে। চাপা গর্জন। ফুঁসতে ফুঁসতে বলে, 'তুই অমন করিস না। আমি সইতে পারি না।'

বজরঙ্গী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বেরিয়ে যায় কুন্দন। বজরঙ্গী ভেবে পায় না থেকে থেকে তার সহজ উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ কুন্দনের এমন অসহ্য লাগে কেন!

॥ উনিশ ॥

চলে যায় কুন্দন।

লায়লীর কাছে শিরীন আসে, সঙ্গে নিসার। বজরঙ্গী নিচে বসে শুনতে পায় ওপরে গান হচ্ছে, বাজনার শব্দ। চাকররা ওপরে দৌড়াচ্ছে বোতল নিয়ে, গেলাস নিয়ে। বজরঙ্গী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বাগানে হাঁটতে থাকে। বাগানে একটু নিচু চাতাল। তাতে বসে বসে বাজনা শোনে। মাঝে মাঝে চাকর ছুটে আসে, 'বজরঙ্গী সাব! সারেঙ্গী নিয়ে চলুন।'

বজরঙ্গী উপরে যায়। সারেঙ্গী নিয়ে মাথা নিচু ক'রে বসে।

নিসার বলে, 'গাও লায়লী!'

'বজরঙ্গী! সেই গান বাজাও।'

বজরঙ্গী বলে, 'কোন্ গান জী?'

'লাগতা নহীঁ হ্যায় জী মেরা।'

বজরঙ্গী বাজায়। লায়লী কিন্তু গান গায় না। চুপ ক'রে শোনে। বজরঙ্গী কিছুক্ষণ পরে মুখ তোলে। তার চোখে যেন এক সকরুণ মিনতি। তখন লায়লী গান ধরে। তারপর একটি গানের পর আর একটি গান। গানে গানে রাত হয়ে যায়।

গান থেমে যেতে নিসার এক অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে বসে, 'লায়লী, গান গাও কেন? আনন্দ পাও ব'লে?'

'কি প্রশ্ন!' লায়লী বলে। লায়লীর মুখের হাসিটি কোমল। চোখে যেন কিসের ছায়া।

'বল! আচ্ছা বজরঙ্গী, বাজাও কেন?'

'ভাল লাগে জী।'

'ভাল লাগে, না নিজেকে খানিক ভুলে থাকতে চাও?'

'বোধ হয় দু'টোই।' বজরঙ্গী সলজ্জ হেসে জবাব দেয়।

'নিসার বোধহয় কবিতা আওড়াতে চাও?' লায়লী বলে।

'কবিতা? না গো না। আমি একটু আঙুরের রস চাই। বেশী না। এই তোমার আঙুলের তিন আঙুল। শিরীন রেগে যেও না।'

রাগ করলে তুমি কি শুনবে?'

'শুনব কেন? বলি শুনব কেন?' নিসারের কণ্ঠ জড়িত। সে আঙুল তুলে বলে, 'আনন্দ পেতে চাও, খেও না। যদি আপনাকে ভুলে থাকতে চাও, যত খুশী খাও।'

'নিসার খাবে তো খাও। কিন্তু দোহাই তোমার অতগুলো যুক্তি দেখিও না।' লায়লী গেলাসটি এগিয়ে দেয়।

নিসার হাসে। বলে, 'চিরদিন ধমকে গেলে লায়লী। কবিতা-টবিতা তো পড়লে না! আমি কেন বলব, গালিব বলেছেন। মির্জা গালিব।'

'কি বলেছেন?' শিরীনের গলায় ঝগড়ার টান। 'মির্জা গালিব বলেছেন, হপ্তায় তিনদিন পেটের ব্যথায় কোঁকাও আর বাকি চারদিন মদ খাও?'

'না না। তোমার মতো অমন বিচ্ছিরি ভাষা কেন তিনি ব্যবহার করবেন বাপু? সত্যি শিরীন, এমন গান গাও! কিন্তু কথাবার্তায় যেন ছিরিছাঁদ নেই। লেখাপড়া না শিখে গাইয়েগুলো গেল! গালিব বলেছেন 'ম্যায় সে গরজ নিসাৎ হ্যায় কিস্ রুশা ই যাহ্ কো, ইক গুণাহ্ বে-খুদ্-ই মুঝে দিনরাত চাহিয়ে।'

একটি নিশ্বাসে নিসার শ্যায়েরটি শেষ করে। বলে, 'বজরঙ্গী, এদের চিনে রাখ। ইনি শিরীন। খাড়ি ঠুংরী শুনতে চাও তো এমন গায়কী পাবে না। কিন্তু কথা যদি শোন তবে মনে হবে ইনি মুরগী বেচেন।'

লায়লী খিলখিল ক'রে হাসে। নিসার বলে, ইনি লায়লী। কায়েশের লায়লী নন্, লক্ষ্ণৌ-র লায়লী লক্ষ্ণৌর শ্রেষ্ঠ কবি এবং গায়করা কবিতা এবং গানের সুধা খাইয়েছেন। এমনকি খোদ দিল্লীর বাদশার নাতি মির্জা আবু বখর্ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে লক্ষ্ণৌ-এ কাটালেন সে ওঁরই মুখপানে চেয়ে। জাফর আর গালিব, মীর তাকিমীর আর নওসাক, সকলের কবিতা

চুনে চুনে একে শোনালেন। কিছু কি উন্নতি হলো? কিস্‌সু না। কথা শোনো, মনে হবে ইনি মুরগী পালেন।'

নিসার আঙুল দোলাল। 'ইনি মুরগী পালেন, উনি মুরগী বেচেন। বজরঙ্গী, মেয়েদের মনের উন্নতি-টুন্নতি বাপু হবার নয়।'

'তবে মেয়েদের থেকে দূরে থাকলেই তো পার বাপু?' শিরীনের গলায় ঝাঁঝ।

'না না, তা হলে কি বাঁচব? খাইয়ে-পরিয়ে কত যত্নে বাঁচিয়ে রেখেছ তা কি আমি জানি না?' নিসার সন্ত্রস্ত হয়ে বলে।

লায়লী হাসে। 'কথা আর কথা! সুন্দর সুন্দর কথা বেচেই তোমার দিন চলে যাবে। তোমার খাওয়া-পরার অথবা মৌজ করবার কোন অসুবিধে হবে না। এই আমি বলে দিচ্ছি।'

'ভাল কথা মনে করেছ। খিদে পাচ্ছে লায়লী। আমি তো আর কুন্দন নই যে তোমার মুখ দেখে পেট ভরবে? বজরঙ্গীও নই যে, একটু হাসলেই গদ্‌গদ হয়ে বুঁদ হয়ে থাকব।'

'ও কি কথা নিসার?'

লায়লী তীব্রকণ্ঠে বলে, 'নেশা ক'রে ক'রে আর জিভের ওপর কোন শাসন নেই!'

নিসার দুষ্টুমির হাসিতে লালচে মুখটি ভরিয়ে বলে, 'দেখেছি দেখেছি। চোখের ভাষা পড়তে জানি বাপু।'

'বজরঙ্গী! নিচে যাও।'

হঠাৎ লায়লী বজরঙ্গীকে ধমকে ওঠে, 'বসে বসে কথা শুনতে খুব ভাল লাগছে তাই না! যাও নিচে যাও!'

বজরঙ্গী কোন মতে সারেঙ্গীটা তুলে নিয়ে ছুটে পালায়। পালাতে পালাতে শোনে নিসার বলছে, 'তোমার মুখ কেন লাল বাপু? মিছে কথা যদি হয়, তো শুনে এমনি ক'রে ফুঃ ফুঃ ক'রে দেবে। লাল হবে কেন?'

বজরঙ্গী নিজের ঘরের খাটে সারেঙ্গীটা ফেলে দেয়। তার কান মুখ গরম। ছি ছি, কি লজ্জার কথা! নিসার নিশ্চয় নেশা করে এমন কথা বলছে। নেশা করা কেন? নিজেকে যদি স্ববশে রাখতে না পারে? লায়লী ওকে অত প্রশ্রয় দেয় কেন?

ক'দিন আর ওপরে যায় নি বজরঙ্গী।

পালিয়ে পালিয়ে থেকেছে। মালীদের কাছে দাঁড়িয়ে কাজের তদারক করেছে। বাগানের মাঝে ছোট একটি পাথরের চৌবাচ্চা বসল। তার ওপর পাথরের পরীমূর্তি। পরীর হাতের আঁজলা থেকে জল পড়ছে। চৌবাচ্চার অগভীর জলে বড় বড় শালুক ফুল। তাতে লাল মাছ ঘুরে বেড়ায়। বজরঙ্গী চৌবাচ্চাটি ঘিরে সূর্যমুখীর চারা বসাল।

লায়লীও তাকে ডাকেনি।

মাঝে মাঝে ওপর থেকে নেমে এসেছে। ঘুরে ঘুরে বাগান দেখেছে। বজরঙ্গীকে যেন দেখেও দেখেনি। মালীকে বলেছে, 'গোলাপগুলো তুলে তোড়া বেঁধে পাঠিয়ে দিও।'

বলেছে, 'পথটা সুরকি দিয়ে বাঁধালে কেন? ঘাস থাকলেই তো হ'ত! আমি হাঁটব কি ক'রে? পায়ে লাগবে না?'

লায়লী দাসীকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে গাছপালা দেখেছে। পাখীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পাখীকে দানা দিয়েছে। চাকরদের বলেছে, 'পাখীগুলোকে যত্ন করিস। সব বিলেতী পাখী।'

'বজরঙ্গী সা'ব ওদের দেখেন।'

লায়লীর কানে যেন কথাটা ঢোকেনি। সে বলেছে, 'ময়ূরটা অমন মন মরা কেন রে!'

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করেনি। দাসীকে বলেছে, 'গালচেটা আন তো! চাতালটায় একটু বসি।'

'মালকিন, চাতালটা নোংরা যে।'

'হোক! তুই আন তো!'

তারপর কোনদিকে না চেয়ে গঙ্গার জল দেখতে দেখতে বলেছে, 'এত নোংরা কেন চাতাল? পরিষ্কার করিয়ে রাখতে পার না?' ব'লেই সে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে বাড়ী চলে গেছে। দাসী গালচে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে লায়লীকে না দেখে হতাশ হয়ে ঘাড় নেড়েছে।

আবার বজরঙ্গীকে ডেকেছে লায়লী।

দুপুর বেলা বাতাস গরম। ঘাস থেকে যেন ভাপ উঠছে। আমের মুকুলের গন্ধ, নতুন পাতা আর ঘাসের গন্ধ। মৌমাছিগুলো আমের মুকুলের 'পরে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে।

দাসী নেমে এসেছে। ত্রস্ত কণ্ঠে বলেছে, 'বজরঙ্গী সা'ব, মালকিন ডাকছেন।

বজরঙ্গী সন্ত্রস্ত হয়ে ওপরে উঠে এসেছে। না জানি কি দোষ হয়ে গেছে।

লায়লীর ঘরের দরজায় খসখস ঝুলছে। বাইরে বসে পাঙ্খাকুলি পাখা টানছে। একজন দাসী ঘুমে ঢুলছে।

'আসব?'

'কে? বজরঙ্গী? এস ভেতরে এস।'

ঘরে ঢুকে বজরঙ্গীর পা থেমে গেল।

খসখসের টাটি ঝুলছে। তার সুগন্ধ। ঘরটা আবছায়া। লায়লী ঠাণ্ডা মেঝেতে কাত হয়ে শুয়ে আছে। একটি পাতলা শাড়ী, পাতলা জামা। সারা গায়ে জল ছিটিয়েছে। একটা গোলাপপাশ পাশে।

কিন্তু এ কেমন বেশ, এ কেমন সাজ! চুল বালিশের ওপর দিয়ে এলানো। পানের রসে ঠোঁটদুটি রাঙা। কপালে গালে বিন্দু বিন্দু জল। গয়নাগুলো পাশে পড়ে আছে, আর, আর সাদা রেশমের শাড়ীর মতো নরম রঙ যেন শাড়ী থেকে ফুটে বেরোচ্ছে।

লায়লী ঠোঁটটি উল্টে দেখল।

তারপর বলল, 'বসো না বাপু! তোমার সঙ্গে বড্ড 'আসুন বসুন' করতে হয়। তুমি যে আমাদের লক্ষ্ণৌ-এর ছেলেদেরও হার মানালে।'

'কেন ডেকেছেন?'

'আপনি আজ্ঞে ক'রো না বজরঙ্গী, হঠাৎ চটে যাব। জান তো কি বেয়াড়া বিদঘুটে রাগ আমার।'

বজরঙ্গী বসে।

লায়লী হঠাৎ ঠোঁট উল্টে আবার দেখে। ফিক্ ক'রে হেসে বলে, 'জান আজ সকাল থেকে কিছুই খাইনি। লেবুর শরবত খাচ্ছি বরফ দিয়ে আর পান খাচ্ছি। ভারী মিষ্টি গোলাপী পান। মুখে একটি দিলে গলে যায়। খাবে না কি একটা?'

বজরঙ্গী দেওয়াল আলমারিটার দিকে চায়।

লায়লী তাড়াতাড়ি উঠে বসে। আঁচল সামলাতে সামলাতে বলে, 'না না, শরবত ছাড়া আর কিছু খাইনি। বিশ্বাস কর।'

বজরঙ্গী নিশ্বাস ফেলে। রাগ ক'রে লাভ নেই। এখন লায়লীকে যেন নেহাত ছেলেমানুষটি মনে হচ্ছে। সে অন্যদিকে চায়। বলে, 'তবু ভাল। আজকাল তো...'

লায়লী উঠে পড়েছে। আঁচলটা মাটিতে লুটিয়ে ও ঘরময় একবারটি ঘুরে আসে। গুনগুন ক'রে গাইতে গাইতে গান থামিয়ে বলে, 'উমরে দারা সেঁ মাঙ্ কর লায়ে থে চারোঁদিন, দো আরজু মেঁ কাট গয়্যে দো ইন্তেজার মেঁ। সত্যি বজরঙ্গী, জীবনে অনেক লোক দেখলাম তোমার মতো এমন সৃষ্টিছাড়া লোক দেখিনি।'

'আমাকে কেন ডেকেছেন?'

'অমন শক্ত হয়ে বসে শক্ত শক্ত ক'রে কথা কইছ কেন?'

'কি করব?

'একটা কথা কইব বলে ডেকেছি।'

'কি?'

'আমি তোমার মালকিন তো?'

'জী।'

'আমার কথা তোমার শোনা উচিত?'

'জী।'

'আমার ইচ্ছে তুমি আমায় আপনি বলা ছেড়ে দাও। আর, আমার আর একটা নামে আমায় ডাক।'

'কিন্তু...'

'না না, সবটা শোন। আমার আরো ইচ্ছে তুমি আমায় আড়ালে 'তুমি' ব'লো।'

বজরঙ্গী হেসেছে।

'তুমি হাসছ?'

'বেশ, 'তুমি' বলেই কথা কইছি। না হয় 'মুন্নি'ও বলছি। কিন্তু তাতে কি হবে?'

'তার মানে?'

'এটা তো আর সব সময়ে সম্ভব হবে না। বাইশ ঘণ্টা আমরা দূরে দূরে থাকব। লুকিয়ে-চুরিয়ে দু'ঘণ্টা যদি 'তুমি' বলেই ডাকি, তাকে কি লাভ হবে কোন? চুরি করে কাজ করবার একটা গোপন মজা পাওয়া যাবে। কিন্তু মুন্নি, যা সত্যি নয় তাকে সত্যি বানিয়ে খেলা ক'রে কি আনন্দ পাওয়া যায়?'

'বুঝিয়ে বল।'

'আমাদের মাঝের দূরত্বটা তো তাতে কমছে না। তুমি আর আমি। মাঝখানে সে মস্ত একটা ফাঁক রয়েছে। তাছাড়া...'

'কি বলছ?'

বজরঙ্গী সরল চোখে চায়। শান্ত চাহনি। বলে, 'যা আমার পাওয়ার নয়, তার প্রতি আমার কোন লোভ নেই। তুমি আমার মনিব। তোমাকে আমার মালিক ভালবাসে। তার চোখের আড়ালে তোমার সঙ্গে দুটো হালকা কথা কইতে আমার মন চায় না।'

লায়লী তার কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'নিজেকে এত ছোট ভাব কেন? আর মালিক, মালিক, মালিক! তোমার মালিক কি আমায় কিনে নিয়েছে?'

'মানুষকে কি টাকা দিয়ে কিনতে পারে কেউ? ভালবাসা দিয়ে, স্নেহমমতা দিয়ে কেনা যায় বলে শুনেছি। তোমাকে মালিক ভালবাসে মুন্নি।'

'তুমি আমায় ও নামে ডেকো না। সব ভুলে গেছ তুমি। কোন কথা মনে পড়ে না তোমার!'

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছে লায়লী। আঙুল তুলে বলেছে, 'যাও তুমি যাও! কে তোমায় থাকতে বলেছে এতক্ষণ?'

বজরঙ্গী একটু হেসেছে। বলেছে, 'যাচ্ছি।'

লায়লী যেন তার কথা শোনেনি। লায়লীর গলাটা ক্রমে তীক্ষ্ণ হয়েছে। 'আমার জামা-কাপড় এলোমেলো, আমি একা শুয়ে আছি। তুমি যাও তো! ইস্, বারান্দায় কি কেউ নেই?'

বজরঙ্গী দুম ক'রে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেছে। যাবার সময়ে বলে গেছে, 'চেঁচিও না, আমি যাচ্ছি।'

চলে গেছে বজরঙ্গী। নিচের ঘরে বসে সে নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছে। বার বার লায়লীর চেহারা মনে ভেসে উঠেছে। তাকে যেন চঞ্চল করেছে, বিহ্বল ক'রে দিয়েছে। তার কাছে কি চায় লায়লী!

'মুন্নি তুমি আমার কাছে কি চাও?'

সেদিন রাতে-প্রশ্ন করেছে বজরঙ্গী। সেদিন রাতে তার কাছে এসেছে লায়লী। বজরঙ্গী যেখানে চাতালে বসে আপনমনে সারেঙ্গী বাজায় সেখানে। সামনে দাঁড়িয়েছে।

'তোমার কাছে? বজরঙ্গী তোমার কি মাথা খারাপ হলো?'

'তবে আমাকে কেন কাছে ডাক মুন্নি, কেন কষ্ট দাও?'

আমি কাছে ডাকলে তোমার কষ্ট হয়?'

'মুন্নি, আমি তোমার দাস। মালিকের সেবা করি, তোমার সেবাটুকু করতে পেলেই আমি খুশী। তুমি এমন আচরণ করলে আমি কষ্ট পাই।'

'বজরঙ্গী, আমি তোমায় কষ্ট দিই?'

লায়লী হাসে। বলে, 'আমি বাগানে বেড়াই, আমার ইচ্ছে হলে কাছে আসি। তাতে তোমার কি? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।' আঁচল লুটোতে লুটোতে চলে যায় লায়লী।

বজরঙ্গী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সারেঙ্গী তুলে আবার বাজায়। কতক্ষণ বাজায় তার খেয়াল থাকে না। অনেক পরে সে মুখ তুলে দেখে লায়লী দাঁড়িয়ে।

'বজরঙ্গী, তুমি বড় সুন্দর বাজাও। শুনতে শুনতে আবার নেমে এলাম।'

নিশ্বাস ফেলে বজরঙ্গী নামিয়ে রাখে সারেঙ্গী। তারপর নিজের ঘরে চলে যায়।

পরদিন সকাল হতেই চাকর এসে তাকে ডাকে। বলে, 'মোরগ দুটোকে লড়াবে মালকিন। তোমায় ডাকছে।'

সারা সকাল লায়লী মোরগ লড়াই নিয়ে মেতে রইল।

সকালে মোরগ লড়াই হলো। বিকেলে পায়রা উড়িয়ে দিল দেখে বজরঙ্গী বলে, 'নেশা, নেশা চাই তোমার। নইলে কিছু ভাল লাগে না।'

'নেশা? কিসের নেশা?' লায়লী যেন ওর কথা বোঝে না।

'নেশা কি একরকম হয় মুন্নি? একটার পর একটা খেলা নিয়ে মেতে ওঠা এ-ও নেশা বই কি!'

'কি বলতে চাও বল তো? হেঁয়ালী ক'রো না।'

'আসলে নিজের সঙ্গে একলা থাকতে পার না। তাই কখনো শিরীনকে খোঁজ, কখনো মুরগী লড়াও। ছি!'

'তুমি আমায় 'ছি' বললে?'

'বলব না? নিজের দিকে চেয়ে দেখ তো?'

'মানুষ একদিন ছোট থাকে, একদিন বড় হয়। ছোট বেলার স্বভাব তোমার মতো পেছনে ফেলে আসে কে মুন্নি? ছোট বেলা আমাকে ওরা মেরেছিল তা দেখে তুমি কেঁদেছিলে। আজ তোমার মনে দয়া নেই মায়া নেই তুমি যেন কি হয়ে গিয়েছ।'

লায়লী মুখ ফিরিয়ে নেয়। ছাতের পাঁচিলে হাত রেখে চেয়ে থাকে। বজরঙ্গী নেমে আসে।

সেদিন রাতে আবার তার দরজায় ধাক্কা পড়ে। 'সারেঙ্গী নিয়ে ওপরে চলুন বজরঙ্গী সা'ব।'

সারেঙ্গী নিয়ে ওপরে উঠে যায় বজরঙ্গী! দুমদুম ক'রে পা ফেলে। ছাতে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'আবার কি নতুন খেয়ালের ঝোঁক চাপল তোমার? আমায় কি একটু শান্তি-ও পেতে দেবে না তুমি?'

তারপরই বিস্ময়ে বজরঙ্গীর গলা নেমে আসে, 'এ কি মুন্নি, তুমি কাঁদছ? কেন?'

লায়লী তার হাত ধরে। বলে, 'বজরঙ্গী, আমার মনে শান্তি নেই। তুমি আমায় ক্ষমা কর।'

বজরঙ্গী বসে। 'কি হয়েছে মুন্নি?'

'বজরঙ্গী, আমি সত্যিই যেন বদলে গেছি। মানুষকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাই। কেন এমন বদলে গেলাম জানি না।'

'মুন্নি, তোমার মনে কিসের কষ্ট আমায় বল।'

'জান, আমি সব বুঝি। কুন্দন যে আমায় কত ভালবাসে তা বুঝি। কিন্তু আমার মুখের হাসিটুকু দেখবার জন্যে ওর ব্যাকুলতা দেখলেই আমি যেন কি রকম হয়ে যাই। এত ক'রে মনকে শাসন করি তবু মন শক্ত হয়ে ওঠে।'

'তবে অমন কর কেন?

'আমার খুব ইচ্ছে করে মানুষ আমায় ভালবাসুক। পুরুষমানুষ কাছে আসে, হাসি-ঠাট্টা করে আমার বেশ লাগে। কিন্তু যেই দেখি তারা আমায় ভালবেসেছে অমনি আমার মনটা বিষিয়ে ওঠে।'

'কেন?' বজরঙ্গী বিস্মিত হয়।

'জানি না। বোধ হয় ভালবাসায় আমার বিশ্বাস নেই বজরঙ্গী। মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারে এ বোধ হয় আমি বিশ্বাসই করি না।'

'তুমি বড় হতভাগ্য মুন্নি।'

'বজরঙ্গী তুমি ভালবাসায় বিশ্বাস কর?'

বজরঙ্গী ঘাড় কাত ক'রে চেয়ে থাকে। তারপর একটু হেসে বলে, 'কি একখানা প্রশ্নই করলে! কি জবাব দিই বল তো?'

'তুমি কি কুন্দনকে ভালবাস?'

'খুব।'

'সত্যিই ভালবাস বজরঙ্গী!'

'তার জন্যে মন কাঁদা, তার দুঃখকে দুঃখ মানা, তার সুখকে সুখ মনে করা এ যদি ভালবাসার লক্ষণ হয় তা হলে আমি মালিককে ভালবাসি।'

'ভালবাসা কি একরকম হয় বজরঙ্গী?'

'কি বলছ বল তো?'

'তোমার মালিক আমাকে যে রকম ভালবাসে তেমন ক'রে কাউকে ভালবেসেছ?'

'না। এখন ভালবাসব কেন?'

'কবে ভালবাসবে?'

'মালিক বলেছে আমার বিয়ে দেবে। বিয়ে দিলে বউকে ভালবাসব।'

লায়লী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে। এখন কৌতূহলে চোখ চিকচিক করছে তার গালে আঙুল রেখে সে বলে, 'দেখ, আমাদের বজরঙ্গীর বুদ্ধিখানা দেখ। দেখলে পরে মনে হয় কোন দিকে খেয়াল নেই কিন্তু বুদ্ধিটি দিব্যি টনটনে করে তুলেছ তো! এতও শিখে রেখেছ? যাকে বিয়ে করবে তাকেই ভালবাসবে! দাঁড়াও, কুন্দনকে বলতে হচ্ছে।'

বজরঙ্গী ওর দিকে চেয়ে থাকে। লায়লী যেন ভারী একটা গোপন রহস্য ধরে ফেলেছে।

'কুন্দন তো জানে বজরঙ্গী তার পায়েই মনটি প্রাণটি দিয়ে বসে আছে। ও তো জানে না আসল ভালবাসাটি বজরঙ্গী তার বউয়ের জন্যে তুলে রেখেছে! ধন্যি বজরঙ্গী, যাকে চোখে দেখনি তার ওপর এত টান?'

'যাকে বিয়ে করব তাকে ভালবাসতে হবে না?'

'বউ কি দেখে রেখেছ না কি?'

'না না। তুমিও যেমন! মালিক যদি জোর-জার ক'রে বিয়ে দেয় তবে বিয়ে হবে।'

'না দিলে বিয়ে হবে না? তুমি কেমন পুরুষমানুষ বজরঙ্গী, কুন্দন যদি বিয়ে না দেয় তবে বিয়েই হবে না?'

'কেমন ক'রে হবে? আমি যদি গিয়ে দাঁড়াই আর বলি ওগো তোমাদের মেয়েটিকে আমার সঙ্গে বিয়ে দাও তাহলেই কি তারা বিয়ে দেবে? তারা খোঁজ-খবর নেবে, জিগ্যেস করবে তুমি কোন ঘরের ছেলে? তখন আমায় চুপ ক'রে থাকতে হবে। আমি যদি তাদের বলি আমি খুব ভাল ঘরের ছেলে। নৌকোর মাঝিরা আমায় তুলে এনেছিল ওরা কি সে-কথা বিশ্বাস করবে? কিন্তু যদি মালিক গিয়ে বলে বজরঙ্গী সত্যিই বড় ঘরের ছেলে তখন তারা মানবে বই কি!'

'তবে তো বজরঙ্গী তোমার বিয়েটা শীগগির হচ্ছে না। তোমার মালিকটিকে যে আমার এখন সব সময়ে দরকার। তোমার বউ খুঁজতে সে যাবে কখন? তবে হ্যাঁ, আমায় যদি খুশী রাখ তবে আমি তোমায় ভাল দেখে একটি বউ খুঁজে দেব'খন।'

'তুমি যাবে আমার বউ খুঁজতে?'

'হাসছ? দেখে-শুনেই আনব।'

'মেয়ে দেখতে গেলে তোমাকেই যে চেয়ে চেয়ে দেখবে সবাই।'

'কেন?'

'তারা গেরস্ত ছা-পোষা মানুষ। তোমাদের নামই শোনে, চোখে তো দেখতে পায় না।'

'ও!' লায়লী কিছুক্ষণ কি ভেবেছে। তারপর বলেছে, 'বিয়ে করলেই ভালবাসা যায়?'

'সবাই তো তাই বলে।'

'কি জানি, বুঝতে পারি না। আমার মা না কি বাবাকে খুব ভালবাসত। অথচ বাবা মারা যেতে ঈশ্বরলালকে কি ভালই না বাসল।'

'ওঁদের দেখে দেখে আমার খুব ভাল লাগত জান! আমার এখনো মনে পড়ে ওঁরা কেমন পাশাপাশি হেঁটে বেড়াতেন নদীর চরে। তোমার মা খুব সুন্দর ছিলেন তাই না?'

'হ্যাঁ। শুনেছি আমার বাবাও খুব সুপুরুষ ছিলেন।'

'তোমার মা-কে বিয়ে করলেন না কেন ঈশ্বরলাল?'

হঠাৎ লায়লী হেসে ওঠে।

ওর মা তো কবে মারা গেছেন, তাঁর কথা কইতে এত হাসিঠাট্টা কেন ভেবে পায় না বজরঙ্গী। লায়লীকে চেনা বড় কঠিন। মরা মানুষকে নিয়ে না কি হাসি-ঠাট্টা করতে নেই। তা সে কথা এখন ওকে বোঝায় কে! ওর যেন সবই সৃষ্টিছাড়া। সকালে বিনা কারণে দুটো মোরগকে লড়তে নামাল লায়লী। বিকেলে ওড়াল পায়রা। একটু আগে চোখে ছিল, জল, গলায় সকরুণ দীনতা।

এখন হাসছে। মা'র কথা বলতেই ওর গলায় যেন নিষ্ঠুর বিদ্রূপের শাণিত ধার চকচক ক'রে উঠেছে।

'ঈশ্বরলাল আমার মাকে বিয়ে করবেন কেন বজরঙ্গী? পনেরো বছর ধরে ওরা বিশ্বাস করত ওদের মতো আর কোন নরনারী ভালবাসেনি। আমি-ও তাই ভাবতাম। হঠাৎ একদিন দেখলাম ভালবাসা বলে কিছু নেই। ঈশ্বরলাল স্বচ্ছন্দে অন্য একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে বলেছেন ভালবাসি তোমায়। তুমি শুধু একবারটি আমার দিকে চাও।'

'সে মেয়েটি কে?'

'সেদিন বুঝলাম ভালবাসা, প্রেম এ সব কথার কোন মানে নেই, সেদিন থেকে ঘেন্না হয়ে গেল আমার, মনে হলো আমি আর কারুকে ভালবাসতে পারব না। ভালবেসে দরকার নেই। সব কিছুই যখন এমন অস্থায়ী—আজকে যা সত্যি কাল যখন তা মিথ্যে হয়ে যায় তখন সে জ্বালায় সাধ ক'রে জ্বলি কেন?'

'বেশ, ভালবাসার জ্বালায় না হয় জ্বল নি। তবু তোমার মধ্যে এত জ্বালা কেন? এ কিসের জ্বালা!'

'সে কি!' লায়লী যেন চমকে উঠেছে। বজরঙ্গী তার মুখের দিকে চায়নি। আপন মনে বলে চলেছে, 'তুমি যেন এত ঐশ্বর্যের মাঝে বসেও সুখ শান্তি পাও না। মানুষের হৃদয় ঢালা ভালবাসা দেখলে তুমি পালিয়ে বাঁচ। তুমি ভাল ক'রে কাঁদতে জান না, চোখের জল ফেলতে জান না। তোমার মুখে শুধু অদ্ভুত হাসি। ও হাসি দেখলে ভয় করে লায়লী।'

'বজরঙ্গী, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ।'

'সব বুঝি, সব বুঝতে পারি।' বজরঙ্গী মৃদুকণ্ঠে বলে।

'কি বোঝ?' লায়লী যেন ভয় পেয়েছে।

'আসলে তোমার এই রাগ, এই খাম-খেয়ালী, এই কথায় কথায় অসহিষ্ণুতা এ সব কিছুই না। বুঝতে দেরি হয় না।'

'এই জন্যেই কুন্দন তোমায় পণ্ডিতজী, বড় পাণ্ডা, গুরুদেব এইসব বলে। তুমি বাপু বড্ড বড় বড় কথা কও।'

'আসলে তুমি ভারি দুর্বল। তাই অন্যের উপর নিষ্ঠুরতা ফলাও।'

বজরঙ্গী হঠাৎ হাসে। বলে, 'জান, আমি যখন ছোট ছিলাম ওরা আমায় মারত। ওরা চলে যেত কাজে। তখন আমি নদীর পাড়ে উপুড় করা নৌকোগুলোর 'পরে চড়ে বসতাম। গাছের ডাল ভেঙে ওদের মনের সুখে পিটতাম। তোমার বোধ হয় সে শৈশব আজও কাটেনি।'

'বজরঙ্গী, এক এক সময়ে মনে হয় তুমি খুব জ্ঞানী-গুণী, এক এক সময়ে মনে হয় তুমি ভারী ছেলেমানুষ।'

'আমার কথা ভেব না মুন্নি।'

'ভাবব না?'

'না।'

'কেন?'

'আমার একটা কথা রাখবে?'

'কি কথা? বলেই দেখ।'

'যখন তোমার মন খারাপ হবে তুমি এমনি ক'রে কথা কইবে আমার সঙ্গে। কথা কইতে কইতে মনটা ভাল হয়ে যাবে।'

'কেমন ক'রে বুঝলে আমার মনটা ভাল হয়ে গেছে?'

'তোমাকে দেখে। নিজেকে তো দেখতে পাচ্ছ না। আয়নাটা থাকলে দেখতে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'বজরঙ্গী আঙুল কামড়াও।'

'কেন? কি হলো?'

'রাতে চাঁদের আলোয় বসে আয়নায় মুখ দেখতে নেই। আয়নার কথা কইতেও নেই।'

'কেন?'

'তাতে ভাল হয় না, ভাল হয় না।'

'তুমি আবার এ সবও মান না কি?

'কিছু কিছু মানি বই কি। আমার বুড়ী দিদিমা আমায় দিন নেই রাত নেই এসব শেখাত। এটা করিস না, ওটা করিস না। এখন ছাতে যাসনে। একলা ভরদুপুরে বাগানে বেড়াসনে।'

'তোমার বেশ মজা, কত লোকজনের মধ্যে মানুষ হয়েছ।'

'হ্যাঁ, তুমি তো আমার সুখই দেখছ, সুখ যেন থরেথরে সাজানো। আমি শুধু ইচ্ছে ক'রে কষ্ট পাচ্ছি। নাও, সারেঙ্গীটা নাও। গাইতে পারব কিনা জানি না। এতক্ষণ ছাদে আছি, গলাটা যেন ভাল হয়ে গেছে। নাও বাজাও তো!'

বজরঙ্গী সারেঙ্গী নেয়। লায়লী গান ধরে। 'লাগতা নহীঁ হ্যায় জী মেরা, লাগতা নহীঁ হ্যায় জী মেরা'—বার বার ফিরে ফিরে গায়।

একসময় গান শেষ হয়। দূরে কোথায় পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে জানিয়ে দিল রাত হলো তিনটে। বজরঙ্গী তাড়াতাড়ি সারেঙ্গীতে গেলাপ ভরতে থাকে। অনেক রাত হয়েছে। গল্পে গল্পে এত রাত হওয়া ঠিক হয়নি। নিচে লায়লীর ঘরের ঘড়ির শব্দ শোনা যায়। সুন্দর রসিলা

আওয়াজ। রিমঝিম, টুং-টাং। ঘড়িটি যেন কৌতুক ক'রে জানায় রাত নেই, রাত ফুরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেউড়ীর বড় ঘড়িটায় গম্ভীর আওয়াজ ওঠে।

'বজরঙ্গী!'

বজরঙ্গী সারেঙ্গী নিয়ে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ায়। বিপন্ন স্বরে বলে, 'লায়লী, এবার যেতে হবে যে!'

'যেও না, থাক।'

'মালিক জানলে আমার ওপর রাগ করবে লায়লী, তোমায় কিছু বলবে না।'

'বজরঙ্গী আমার কথা শোন। আর একটু ব'সো। একটু পরেই ভোরের আজান শুনতে পাব।'

'ছেলেমানুষী ক'রো না মুন্নি।' বজরঙ্গী রীতিমতো ধমক দিয়েছে লায়লীকে। লায়লী বলেছে, 'কিছু তো চাইছি না। শুধু বসে থাকতে চাইছি।'

বজরঙ্গী বলে, 'তা হয় না। এই এতক্ষণ কথা কইলাম, তোমার কাছে বসলাম এতেই আমার মন ভরে গেছে মুন্নি। তা ছাড়া তুমি আর আমি ছাড়া অন্য লোকেরাও আছে বাড়ীতে। তাদের কথাটা ভুলে যেও না।'

'এত ক'রে বলছি ব'সো না বাপু!'

'না।' বজরঙ্গী তাকে ধমক দেয়!

'কেন?'

বজরঙ্গী একটু নিচু হ'য়ে ওকে বলে, 'মুখ তোল, আমার দিকে চাও। শোন, এই রাতটা সত্যি নয় বোঝ না কেন?'

'সত্যি নয়?' লায়লী উত্তরোত্তর বিস্মিত।

'না। সত্যি নয়।'

বজরঙ্গী ধীরে হাঁটু ভেঙে বসে। লায়লীর দিকে চেয়ে বলে, 'তোমার মনটা খারাপ ছিল মুন্নি, তাই আমায় কাছে আসতে দিয়েছিলে। তাই কাছে এলাম। তুমি গল্প করলে, শুনলাম। তুমি গান গাইলে, সঙ্গে বাজালাম। বাস্, ফুরিয়ে গেল। তোমারও ভাল লাগল আমারও। এই ভাল-লাগাকে কাল সকাল অবধি টানতে চাও কেন?'

'বজরঙ্গী, তোমার কথা আমি বুঝি না। কেন জান? আমি ডাকলাম আর তুমি এলে। কেন এলে?'

'মুন্নি, তা তোমায় বলে লাভ কি?'

'বল, বলেই দেখ।'

'মুন্নি, আমি জানি আমাকে দিয়ে তোমার এতটুকু অসম্মান ঘটবে না। তাই নির্ভয়ে এসেছি। তোমার মনে দুঃখ, আমি কথা কইলে তোমার হাল্কা লাগবে তাই নিঃসঙ্কোচে পাশে বসেছি।'

'তাতে হলো কি? কি বলতে চাইছ?' লায়লী হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।

'বলতে চাইছি তোমার আমার এ ভাল লাগালাগিটুকু, এই কাছে আসাটুকু এর মধ্যে কোন পাপ নেই। কিন্তু তা বলে যদি আবার আমরা এই সময়টুকু ফিরে পেতে চেষ্টা করি তা হলে ভয়ানক দোষ করব।'

'দোষ? তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাইলে দোষ?'

'না! মুন্নি। কথা কইলে দোষ কি? কথা তো তুমি সারাদিনই কও। ওপর থেকে ডেকে ফরমাস জানাও না এটাসেটা?'

'তবে কি? কি সে দোষ?'

'দোষ? কে জানে, হয়তো দোষ নয়, হয়তো স্বভাব। কিন্তু আমরা কি শুধু কথা কইব? আমরা যে এই ভাললাগাটুকু ফিরে ফিরে আঁকড়ে ধরতে চাইব। আমি না চাইলেও তুমি তো চাইবেই মুন্নি।'

'তোমার সঙ্গ পাবার জন্যে আমি বুঝি এতই কাতর বজরঙ্গী?'

'না না। একদিন ছিলাম নাওদারদের চাকর। সেদিন তোমার সেবা করতাম। পরে এমনি ভাগ্য দেখ, আবার তোমার সেবা করব বলে এসেছি। আমার সঙ্গ পাবার জন্যে তুমি কেন ব্যস্ত হবে? তা নয়। তবে আমার ভয় হয়, তোমার জন্যে ভয় হয়।'

'কেন?'

'তুমি যে বড় অপরিণত। শিশুর মতো অসহিষ্ণু। ছোট ছেলের মতো, হাসতে হাসতে বড় অনিষ্টও হয়তো করতে পার, তাই ভয় হয়। একদিন যা ভাল লেগেছে, এই জ্যোৎস্না, এই তুমি আমি সহজভাবে কথা কইছি তা হয়তো আবার ফিরে ফিরে চাইবে তাই ভয় হয়। কি জান মুন্নি, ভাল লাগাটুকু, এ ছাত, এ জ্যোৎস্না, এই তুমি আমি এর মধ্যে নেই। এই সব ছাপিয়ে, ছাড়িয়ে অন্য কোথাও আছে। ভয় হয় তুমি তা বুঝবে না।'

লায়লী আর বজরঙ্গী। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। লায়লী অনুভব করে বজরঙ্গী এখন অনেক দূরে। হয়তো এতক্ষণ তারা শুধু কথাই কয়েছে। কথা কয়েছে, গান গেয়েছে, হেসেছে, এবং কেঁদেছে। হয়তো কিছুক্ষণের জন্যে তারা কাছাকাছিও এসেছিল। কিন্তু তারপর কখন যেন অলক্ষ্যে সন্তর্পণে আবার দূরে সরে গেছে।

বজরঙ্গী বলে, 'তোমার কথাই রইল মুন্নি। ঐ শোন ভোরের আজান। কথা কয়ে কয়েই রাত কাটল।'

'হ্যাঁ।'

ভোরের আকাশ ধূসর, বিবর্ণ। ঠাণ্ডা বাতাসে মসজিদের আজান ভেসে আসে। জাহাজের ভোঁ। আরো দূরে, কালীঘাটের দিক থেকে একসঙ্গে অনেক ঘণ্টা বাজবার শব্দ ভেসে আসে। ভিস্তি জল দিচ্ছে। কারা যেন বড় বড় ঘোড়াকে ছুট করাতে নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার খুরে খপখপ শব্দ। লায়লী ফিরে তাকায়।

বজরঙ্গী নেই। তাকিয়া, গালিচা, বেলফুলের গোড়ে রাত পোহাতেই যেন লালচে হয়ে উঠেছে। লায়লীর হঠাৎ নিজেকে বড় ক্লান্ত, বড় নিঃস্ব বোধ হয়। ঘুমন্ত দাসী দু'টি দোরের গায়ে হেলান দিয়ে আছে। তাদের জাগায় না লায়লী। তাদের পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে যায়। নিজেকে যেন অতিরিক্ত সস্তা ক'রে ফেলেছিল সে, এখন লজ্জা করছে।

দু'দিন লায়লীকে নিচে নামতে দেখা গেল না, বজরঙ্গীও নিজের কাজে ব্যস্ত রইল।

দু'দিন বাদে বেলা এগারটায় যখন একটি বড় পাল্কি হুমহাম ক'রে ঢুকে পড়ল এবং নাগরায় প্রভূত ধুলোমেখে হাসি মুখে কুন্দন নেমে এল সে পাল্কি থেকে, তখন কুন্দন তার অভ্যর্থনার বহরটা দেখে পুলকিত এবং আশ্চর্য হলো। বজরঙ্গী তাকে দেখে প্রায় কেঁদে ফেলল স্বস্তিতে। ক'দিন ধরে নানাবিধ অস্বস্তিতে ভুগেছে।

'তুমি এসেছে আর আমার কোন ভাবনা নেই।' বজরঙ্গীর কথা শুনে কুন্দন লালচে চোখে পলক না ফেলে তাকিয়ে রইল এবং একটি কথাও না বলে সরু শিকলি বাঁধা একটা বেজী তার হাতে দিল।

ওপরে উঠতেই লায়লী তার বুকে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। গুলরুখ ও জোবেদী মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালায়। লায়লীর চোখ, ছলছল, মুখে হাসি।

'এসেছ? তুমি এসেছ?' লায়লী কুন্দনের হাত ধ'রে ঝুলতে লাগল। কুন্দন তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে নেশায় জড়িত কণ্ঠে বিড়বিড় ক'রে বলল, 'এদের হলো কি?'

লায়লী বলল, 'কই, আমার জন্যে কি এনেছ?'

'কেন, নিজেকে?' চমৎকার রসিকতা করেছে এই জ্ঞানে কুন্দন নিজেই খুব হাসল। তারপর সে একটি ভেলভেটের বাক্স বের করে। বলে, 'দেখ, পছন্দ কি না!'

'এ কি, সোনার একটা সরু শেকল কেন?'

'কেন আবার, বেজীর গলায় পরাবে!'

'বেজী কই?'

'ও, বজরঙ্গীকে দিয়ে দিলাম যে! ডাকব!'

'না না!' লায়লী শশব্যস্ত হয়ে ওঠে। বলে, 'পরে দেখব'খন। দেখ কুন্দন, আমার তোমার কথার মধ্যিখানে ও যখন তখন আসে আমার এটা মোটেই পছন্দ হয় না।'

॥ কুড়ি ॥

কিছুদিন লায়লী কুন্দনের দিকে মন দিল।

কুন্দন যা বলে তাই শোনে। কুন্দনের সঙ্গে বেড়াতে যায়। কুন্দনকে গান শোনায়। নিসার এলে তার দেখা পায় না। শিরীনের সঙ্গেও দেখা করে না লায়লী। কুন্দন যখন বাড়ী চলে যায় তখন লায়লী বলে, একটা বড় ভালবাসার জন্যে অনেক ছোট ছোট জিনিস ছাড়তে হয় কুন্দন।'

'কি ছাড়ব বল?'

'বাড়ী যাওয়াই চাই, খাওয়া-দাওয়ার বাছবিচার ছাড়তে পার না, এমন করলে কি চলে? আসলে তুমি আমায় ঘেন্না কর। বাঈজী বলে, মুসলমানী বলে!'

লায়লী ফোঁসফোঁস ক'রে কাঁদে। কুন্দন মহাবিব্রত। সান্ত্বনা দেওয়া তার বিশেষ আসে না। সে ভারী হাতটা লায়লীর পিঠে বুলিয়ে বলে, 'কি যে বল! কি যে বল!'

'আমার রাতে ভয় করে কুন্দন।'

'কেন?'

'তুমি কি বুঝবে? একা একা থাকি। সিন্দুক ভরা গয়না!'

'আরে তোমার গায়ে হাত দেবে কে? কলকাতা শহরে ব'সে কুন্দন মিশ্রর বাগানবাড়ীতে ঢোকবার সাহস কেউ রাখে? নিচে দরোয়ানরা আছে, ডালকুত্তা আছে। কুকুরের ভয়েই তো কেউ ঢুকবে না। মানুষ কি, রাতে একটা পাখীও ঢুকতে পারবে না। লায়লী!'

'তবু তো বিপদ হয়!'

'তা ছাড়া বজরঙ্গীই তো আছে।'

'বজরঙ্গী আর বজরঙ্গী! ওর ওপর বড্ড ভরসা। জান, যাদের ওপর বেশী ভরসা করা যায় আসলে তারাই একদিন বেইমানী করে।'

এ কথাটা যেন কানেই যায় না কুন্দনের। সে বলে, 'দাঁড়াও আমি ওকে ব'লে দিচ্ছি। ডাকছি ওপরে।'

'না! ওপরে ডাকবে না।' লায়লী চেঁচিয়ে ওঠে।

কুন্দন অবাক হয়। বলে, 'কি সুন্দর দেখাচ্ছে লায়লী! রেগে মুখটা লাল টুকটুকে ক'রে ফেলেছ? আচ্ছা, ওপরে ডাকব না ওকে। রাতে মাঝে মাঝে তো থাকি, আবো থাকতে চেষ্টা করব। হলো তো? সব কথাই দিলাম। এখন যেতে দাও।'

নিচে এসে সে গাড়ীতে ওঠে। গাড়ী চলতে থাকে। কুন্দন বসে বসে স্মিত মুখে তার আপাতসৌভাগ্যের কথা ভাবতে থাকে।

ভাল দিন পড়েছে, সত্যিই ভাল দিন পড়েছে। কটকে অমন লবণের আড়তটা হাতছাড়া হয়ে গেল এই যা! নইলে মসলার কারবারে এবছর ভাল লাভ রইল। বরিশালের সুপারি ও নারকেলের ব্যবসাও ভাল হবে বলেই মনে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভাল বলে সবই ভাল লাগছে।

তার মা'র মেজাজ একটু নরম। যখন তখন এসে এসে জ্বালায় না। গোপালের মেয়েটার নাকি বিয়ে দেওয়া হবে। গোপালের ছেলে মনোহর বেশ কাজকর্ম শিখছে। ঐটুকু ছেলে কেমন কপালে তিলক কেটে গদীতে গিয়ে বসে। ভাল। ওদের লোকে ধার্মিক বলে জানুক। কুন্দন তো বিয়ে করছে না। কুন্দনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হবে।

সব চেয়ে সুখের কথা হলো লায়লী তাকে ভালবাসে। লায়লী যে তাকে ভালবাসে সেটি এতদিন বোঝা যায় নি। এবার গাজিপুর ঘুরে এসে যেন ভাল ক'রে বোঝা যাচ্ছে। লায়লী তার প্রতি প্রসন্ন এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? বজরঙ্গীকে ও দেখতে পারে না। সেটাও বোধহয় স্বাভাবিক। কুন্দনকে লায়লী ভালবাসে তাই কুন্দন বজরঙ্গীর ওপর অতটা নির্ভর করে তা সে চায় না।

কুন্দন আপন মনে হাসে। এবার সে ব্যবস্থাও ক'রে এসেছে কুন্দন। বজরঙ্গীর ব্যবস্থা। ক'মাস বাদেই সবাইকে অবাক ক'রে দেবে কুন্দন। গোপালের বউয়ের রূপ নাকি চোখ জুড়নো। চোখ জুড়নো' রূপ কাকে বলে তা দেখে এসেছে কুন্দন এবার।

গাজিপুর গঙ্গার ঘাটে। ভীম তাকে খবর দিয়েছে। বলেছে, 'ঐ মেয়েটাকে দেখে রাখ। ওর বাপ ভিক্ষে-সিক্ষে ক'রে বিয়ের খরচ যোগাড় করলে তাতেই অনেকদিন গেল। আবার বাপ মা মরল একই বছরে, কালাশৌচ লেগে গেল। এখন ভায়ের কাছে আছে। ভারী গরীব। তবে জাত ভাল, বামুনের মেয়ে।'

কুন্দন মেয়েটার ভাইকে বলেছে আবার শীতকালে গিয়ে কথাবার্তা পাকা ক'রে ফেলবে। কুন্দন ইতিমধ্যেই ভাইটাকে কটা টাকা দিয়েছে এবং শাসিয়ে এসেছে এ মেয়ে অন্যত্র বিয়ে দিতে চেষ্টা করলে ফল ভাল হবে না। মেয়েটা ফর্সা নয়। তবু গড়ন ভাল। শান্ত মেয়ে, চোখ নিচু ক'রে নদীর ঘাটে আসে চোখ নিচু করে চলে যায়। কারো পানে চায় না।

কুন্দন ভাবল একসময়ে কথাটা লায়লীকে ব'লে ফেলতে হবে। তা হলে লায়লী বুঝবে যে বজরঙ্গী একদিন চলে যাবে। হয়তো রাগটা কমবে লায়লীর!

·

কথাটা ঠাট্টা ক'রেই বলে কুন্দন।

ক'দিন ধরে নাকি বজরঙ্গীকে কি একটা গানের সুরে পেয়েছে, দিন নেই রাত নেই ঐ একটা সুরই বাজাচ্ছে বজরঙ্গী। ভরদুপুরে একা একা ঐ বাগানে বসে বাজায়, রাতে একা বসে বসে বাজায়।

সেদিন লায়লী বলে, 'আর ঐ একটা সুর শুনতে পারি না। ডাক তো, ডাক ওকে। আমিই মানা করে দেব।' কুন্দনের হাত থেকে আলবোলার নলটি নেয় লায়লী। বলে, 'ওর আদব-কায়দা সহবতের জ্ঞান তো হয়েছে দেখছি! আজ কতদিন হয়ে গেল ওকে না ডাকলে ওপরে আসে না। যাই বল, মাঝে মাঝে ও সব লোককে শাসন করে নিজের জায়গাটা মনে করিয়ে দিতে হয়। নইলে মাথায় চ'ড়ে বসে।'

'কি জান লায়লী, ওকে আমি জানি। ওর নিজের জায়গা বজায় রাখতেই ও জানে কিনা আমার সন্দেহ হয়। তুমি বল, আমারও মনে হয় মাঝে মাঝে ওকে বকে দিই। কিন্তু পারি না।'

তারপর হাসে কুন্দন। বলে, 'দাঁড়াও না এবার ওকে ভাল মতো জব্দ করবার ব্যবস্থা করেছি। কিছুদিন যেতে দাও না!'

'কি করেছ?' লায়লী যন্ত্র চালিতের মতো প্রশ্ন করে এবং দরজার দিকে চায়। তারপরই মুখ ফিরিয়ে নেয়। দেওয়ালের দিকে চেয়ে কি যেন দেখে।

আয়নায় ছায়া পড়ল। বজরঙ্গী এল। কুন্দন লায়লীর দিকে একবার চায়, একবার বজরঙ্গীর দিকে। বলে, 'বজরঙ্গী, তোর নামে নালিশ আছে।'

'বল।'

বজরঙ্গীর মাথা নিচু। সে জামার ঘুনসীটা নাড়াচাড়া করে। কুন্দন দেখে বজরঙ্গীর জামা ময়লা এবং চুলগুলো এলোমেলো।

'কি একটা সুর বাজাস বল্ তো দিন রাত্তির? বাজাবারও আর জায়গা পেলি না তুই ঐ চাতালটায় বসে বসে বাজাস, শুনে শুনে লায়লী বিরক্ত।'

বজরঙ্গী কিছু বলে না।

'ময়লা জামা-টামা পরে থাকিস তা-ও ও পছন্দ করে না। ওর কাছে তো শিরীন আসে, নিসার আসে!'

'আর কিছু বলবে?'

'না।' কুন্দন এবার ধমক দেয়। সোজা হয়ে উঠে বসে। বলে, 'এ কথাগুলো শুনে চলিস। তোরই কাজে লাগবে। আজ আমরা বলছি কাল আরেকজন বলবে।'

আর একজন? সে আবার কে রে! বজরঙ্গী এবং লায়লী দুজনেই অবাক হয়ে চায়। কুন্দন বলে, 'তোমাকে বিয়ে দেব। মেয়ে দেখে এসেছি। যা, নিচে যা!'

লায়লী অবাক হয়ে কুন্দনের হাতটা ধরে। 'কি বললে? ওর বিয়ে দেবে? সত্যি ওর বিয়ে দেবে?'

'সত্যি। বিয়ে দেব, দূরে পাঠিয়ে দেব।'

লায়লী যেন কথা কইতে পারল না। সে অবাক চোখে কুন্দনের দিকে চেয়ে থাকে। কুন্দন বলে যায়, 'ওকে তো তাড়িয়ে দিতে পারি না লায়লী। ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। একবার নয়, চার বার। তুমি আর ক'টা মাস সহ্য কর ওকে। তারপর আর ওর মুখ দেখতে হবে না।'

'কে বিয়ে করবে ওকে? ওর নাকি জাতজন্মের ঠিকানা নেই।'

'কে বলল?'

'ও-ই তো বলে।'

'ও জানে না।'

'তুমি জান? কেমন ক'রে জানলে? তুমি কি ওর বাপ কে, মা কে, তা জান?'

কুন্দন এই সাধারণ কথাটা শোনে আর হঠাৎ যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সে যেন ভুলে যায় লায়লীর সঙ্গে কথা কইছে। চেঁচিয়ে ওঠে কুন্দন, 'জানি, আমি জানি। আমাকে আর প্রশ্ন ক'রো না।'

'কেমন ক'রে জানলে তাই তো জানতে চাইছি।'

'লায়লী, কুন্দন মিশ্র এত কথার জবাব দেয় না।' সঙ্গে সঙ্গে লায়লী চেঁচিয়ে ওঠে, 'তুমি আমার সঙ্গে কথা কইছ কুন্দন!'

লায়লী ছুটে নিজের শোবার ঘরে চলে যায়। দরজা বন্ধ করে।

কুন্দন চোখটা হাত দিয়ে চাপা দেয়। তার হাতটা কাঁপতে থাকে।

সেদিন বিকেল থেকেই আবার লায়লী যেন বদলে যায়। বলে, 'ভাল লাগছে না কুন্দন। শুধু তুমি আর আমি আর এই ভালবাসাবাসি!'

কুন্দনের মুখটা সাদা হয়ে যায়। বলে, 'বল কি করতে চাও? চলে যেতে চাও? ছেড়ে দিচ্ছি তোমায়।'

'কি বললে? আমি কি তাই বলেছি?'

'জোর ক'রে আমায় ভালবাসতে তোমায় বলি না লায়লী।'

'কুন্দন কুন্দন, তুমি কি ছেলেমানুষ!'

লায়লী ওর কাছে এসে বসে। ওর চুলে আঙুল বুলিয়ে নিচু হয়ে, গালে গাল রেখে বলে, তোমায় যদি ভাল না বাসলাম তবে তোমার কাছে আছি কেন? লায়লী আশমান কি শুধু শুধু কারো কাছে থাকে?'

'লায়লী, তবে অমন ক'রে কথা কইলে কেন?'

'ভুল হয়েছে, মাপ চাইছি, হলো তো?'

'বল, কি করতে চাও! গঙ্গায় বেড়াবে?'

লায়লী হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে। বলে, 'সে বেশ হবে, তাই না? তবে শিরীনকে ডাকি? নিসারকে ডাকি!'

'কেন, ওরা কেন?'

'ওরা কি এমন গঙ্গায় বেড়াতে পায়? আমার জন্যে ওরা-ও একটু বেড়াবে। বল, হ্যাঁ বল কুন্দন! হ্যাঁ বল, তবে আমি সাজব। দেখো আজ কেমন সাজব। তুমি তো সবুজ ভালবাস। আমি সব সবুজ পরব।'

'তোমার সঙ্গে পারবে কে? গাড়ী পাঠাও তবে।'

গাড়ী পাঠানো হলো। লায়লী সাজতে গেল। কুন্দন স্নান করলে এবং কানে আতর দেওয় তুলো গুঁজে ভব্য হয়ে বসল।

বজরঙ্গী বজরাটা ঝাড়-পোঁছ করতে পাঠাল। তাকিয়া চাই, গালচে চাই। বরফ আনতে গে একজন বরফ কলে। ফলের ঝুড়ি নিয়ে চাকররা বেছে বেছে খরমুজা, আঙুর, লিচু কাঁচে বাসনে রাখে। অনেকদিন পর বাড়ীতে সাড়া পড়েছে। আলবোলা নিয়ে চলে যায় একজন।

হঠাৎ ওপর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। কে যেন যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে।

বজরঙ্গী সব ভুলে যায়। তাকে না ডাকলে ওপরে যেতে নেই সে কথা তার মনে থাকে না। সে ওপরে ওঠে। বলে, 'কি হয়েছে, মালিক?'

লায়লী জোবেদীকে মারছে। কুন্দনের ছড়িটা দিয়ে নির্মমভাবে মারছে। লায়লীর গায়ে ওড়না নেই। বেণীটা সাপের মতো দুলছে। গুলরুখ পাশে দাঁড়িয়ে। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কাঁদছে।

বজরঙ্গীকে দেখে কুন্দন গর্জে ওঠে, 'তুই বাড়ীতে থাকতে মালকিনের গয়না চুরি হয়ে যায়? কি করিস?'

বজরঙ্গী বলে, 'কি হয়েছে কি চুরি হয়েছে?'

'আমার পান্নার কণ্ঠি, বাজুবন্ধ, কানবালা!' লায়লী বলে। লায়লীর মুখ লাল। থমথম করছে। সে বলে, 'এই জোবেদী চুরি করেছে। হারামজাদী, শয়তানী, আমি জানি না গয়নার ওপর তোর কি লোভ? আমি যখনই বাক্স খুলি তুই দোরের কাছে এসে দাঁড়াস!'

'আমি নিইনি। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার গয়না নিইনি!'

বজরঙ্গীর মাথাটা যেন টলে যায়। সে অতি কষ্টে রেলিংটা চেপে ধরে নিজেকে সামলায়। বলে, 'না, ও নেয়নি।'

'তুমি তো বলবেই! তুমি যে ওদের সব খবর রাখ। আমি তোমায় বলছি কুন্দন ও তলে তলে শয়তানী করে। জোবেদী সত্যি কথা বল্। নইলে তোকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। তোর কাকা তোকে বেচে দিচ্ছিল আমি তোকে বাঁচালাম। এখন আমারই গয়না চুরি করেছিস?'

বজরঙ্গী হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে, 'থাম। আমি এনে দিচ্ছি গয়না।'

সে নিচে নেমে যায়। তার জামাটা টেনে নেয় দেওয়াল থেকে। ওপরে এসে পকেট থেকে বের করে দেয় গয়না।

কুন্দনের দিকে চেয়ে বলে, 'মালিক, যেদিন তোমরা ব্যারাকপুর গেলে আমি ওপরে এসে দোর বন্ধ করতে গিয়ে দেখি গয়নাগুলো পড়ে আছে।'

'তবে বলনি কেন? এত দিন নিজের কাছে রেখেছিলে কেন?' লায়লী গয়নাগুলো ছিনিয়ে নেয় ওর হাত থেকে।

'মালিক, সেই থেকে জামার পকেটে পড়েই আছে। আমার মনে ছিল না। দোষ হয়ে থাকে আমার হয়েছে।'

কুন্দন অপ্রস্তুত। সে কারণে ক্রুদ্ধ। 'জোবেদী, যা! গুলরুখ যাও!'

বজরঙ্গী একবার কুন্দনের দিকে চায় একবার লায়লীর দিকে। বলে, 'ওকে মারবার আগে একবারটি আমায় জিগ্যেস করলে পারতেন। বজরঙ্গী বেইমান নয়। বজরঙ্গী সত্যি কথাই বলত।'

সে দুমদুম ক'রে নেমে যায়।

লায়লী বলে, 'কুন্দন ও আমাকে অপমান ক'রে গেল তুমি একবারটি কিছু বললে না?'

কুন্দন কপালের ঘাম মুছে ফেলে। লায়লী তখন চেঁচিয়ে রাগ ক'রে সে এক হুলস্থুল কাণ্ড বাধায়। তারপর কুন্দন তাকে শান্ত করে।

সেদিন বজরঙ্গী গঙ্গার বুকে বজরায় বেড়াতে যায় না। ওরা চলে যায়। শিরীন আসে, নিসার আসে। ওরা চলে গেলে বজরঙ্গী একলাটি অস্থির পায়ে ঘুরতে থাকে বাগানে।

সেদিন কুন্দন যখন গাড়ীতে ওঠে, বজরঙ্গী তার কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'আমিও যাব।'

'না।' কুন্দন বজরঙ্গীর সঙ্গে একলা হতে চায় না।

'মালিক, আমার আর্জি আছে।'

'পরে শুনব।'

কুন্দনের গাড়ী চ'লে যায়। একা একা দাঁড়িয়ে বজরঙ্গীর বুক বিবাদে ভরে ওঠে। নিজেকে যেন বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। মালিক আজ তার কথা শুনতে চাইল না। তাকে উপেক্ষা জানিয়ে চলে গেল। তবে সে কার কাছে নিজের মনের কথা বলবে?

বজরঙ্গী ঘুরে ঢুকল না। চাতালে বসে রইল গায়ের জামাটি খুলে। এ কথা সে কথা ভাবতে ভাবতে একসময়ে তার চোখে ঘুম এল। তারপর অনেক রাতে এক সময়ে তার ঘুম ভাঙল।

'বজরঙ্গী!'

বজরঙ্গী চমক ভেঙে উঠে বসল। লায়লী। লায়লী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই পান্নার কণ্ঠি গলায় চিকচিক করছে। চোখমুখ লাল। নেশায় লাল। ঢুলুঢুলু চোখ, ঠোঁটে হাসি।

বজরঙ্গী নীরব।

'বজরঙ্গী, তোমার কাছেই এলাম।'

'বলুন!'

'এত রাতে নেমে এলাম কই আশ্চর্য হচ্ছ না তো?'

'আপনার খেয়ালখুশীর সঙ্গে তাল দেবার জন্যেই তো মালিক এখানে রেখেছে আমায়। আশ্চর্য হব কেন!'

'চুপ। আস্তে কথা কও। আজ নিসার বাড়ী যায় নি। তোমার ঘরের সামনে ঐ যে ঘুমোচ্ছে।'

'আস্তে কথা কইব কেন? আপনিই বা কেন কইবেন? চাকরের সঙ্গে এত রাতে কেউ আস্তে কথা কয়?'

লায়লী হাসতে থাকে। 'জানি, খুব রাগ করেছ জানি।'

'আমি আপনার উপর রাগ করেছি? আমার সে দুঃসাহস হবে কেন?'

'বজরঙ্গী, তোমার কথার সুরটা আমার ভাল লাগছে না।'

'আপনি মালিক। আমি আপনার চাকর।'

'বজরঙ্গী, তুমি আবার আপনি বলছ তা নয় মাপ করলাম। কিন্তু আমি কি তোমায় চাকরের মতো দেখি?

'আপনি আমায় কি চোখে দেখেন তা আজ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভগবান আমায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ঐ জোবেদী আর আমি, আমরা দুজনেই আপনার চোখে সমান।'

'ছি বজরঙ্গী!'

'সমানই তো! সমান নই কেন বলুন। ওকে আপনি বাঁচিয়েছেন নইলে ও হয়তো ভিখিরী হয়ে যেত। আমাকে মালিক বাঁচিয়েছে নইলে আমি হয় তো সেই নাওদারদের চাকর হয়ে থাকতাম। সত্যি সত্যি তো কোন তফাত নেই!'

'বজরঙ্গী, তফাত কি অবস্থায় হয়? তফাত হয় দেখবার চোখে। তোমার মালিক কি তোমায় সেই চোখে দেখে?'

'এ সব কথা আপনার মুখে শোভা পায় না।'

'কেন?'

'কেন না এ নেহাতই আপনার মুখের কথা। আপনি এতে বিশ্বাস করেন না।'

'বজরঙ্গী!'

'আমাকেও মারবেন? মারুন। জোবেদীর মতো আমি কাঁদব না।'

'তুমি, আমার কথাটা শোন। আমি তখন রেগে যা তা কথা বলেছিলাম। রাগলে কি মানুষের মুখে লাগাম থাকে?'

'কি জানি, কেমন আপনাদের রাগ। সে রাগের রকম আমি বুঝব না। রাগলে আপনারা মানুষকে চোর বলতে পারেন, মারতে পারেন। আমরা রাগ হলে বুকের জ্বালা বুকে চেপে রাখি। কিন্তু এ সব কথা থাক। আপনি ভাববেন না। মালিককে বলে আমি চলে যাব।'

'জানি। তুমি যাবে, তুমি বিয়ে করবে, তোমার সুখশান্তির সংসার হবে।'

'বিয়ে করব। আমি! না না।' বজরঙ্গীর গলা বিষাদে ভারী। চাপাকান্না যেন ওর গলায় গুমরে গুমরে উঠছে।

'সুখশান্তি বোধ হয় আমার কপালে সইবে না। মালিককে বলে চলে যাব আমি।'

'কোথায় যাবে?'

'এত বড় দুনিয়া পড়ে আছে, যাবার জায়গার ভাবনা কি? আমার তো পালকি চৌদোলা, আগে বান্দা, পিছে নফর লাগবে না। যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।'

লায়লী হতাশ হয়ে ফিরে এল।

ঠিক এই কথাই বলবে ঠিক ক'রে রাখে বজরঙ্গী। কিন্তু পরদিনই একটু বেলা হতে ও-বাড়ী থেকে ভীম আসে। 'বজরঙ্গী, শীগগির চল্!'

'কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে? আরে বাবুলালকে নাতি, তোর শরীর কি এখনো বাচ্চা বয়সের মতো হালকা আছে! কাল কত রাতে বাড়ী ফিরলি। সকালে বুঝি নতুন ঘোড়া কিনতে আলিপুর গিয়েছিল। তেজী ঘোড়া বাগ মানবে কেন? আলিপুর থেকে বেরিয়ে বড় ময়দানে ছুট করাতে গিয়েছিল—'

বজরঙ্গী জামা পরে। পায়ে জুতা গলায়। বলে, 'কি হয়েছে?'

'পড়ে গেছে।'

'ভীম, বেশী চোট তো লাগেনি?'

'লাগেনি! গোড়ালির হাড় মচকে গেছে, হাতের মাংস উড়ে গেছে। তাতে ওর কি হবে! খন চেঁচিয়ে সকলের মুণ্ডপাত করছে।'

ভীম খিকখিক ক'রে হাসে। গলায় শ্লেষ্মা সাফ করে বলে, 'আরে বজরঙ্গী, আলিপুরের এক ায়েব হেকিম কুন্দনকে সূঁই দিল। সূঁই দিয়ে সেলাই করে দিল রে হাত। ঠিক যেমন রে ওস্তাগর জামায় ফোঁড় দেয় তেমনি ক'রে। কলকাতায় এসে কতই দেখলাম রে

'বজরঙ্গী!'

'চল।'

'চল্। এখন বিছানায় বসে কি চেঁচানিই চেঁচাচ্ছে কুন্দন। আমাকে বললে তোকে ডেকে ানতে।'

বজরঙ্গী দেখে নিসার ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। নিসার ভীমকে দেখে বলে, 'এটা আবার ক? চেহারা দেখে মনে হয় আস্ত একটা খুনে। কুন্দন জোটায়ও এক একটা।'

'নিসার সা'ব, আমি ও-বাড়ীতে যাচ্ছি। মালিক না কি ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে।'

নিসার বলে, 'সে কি বাবা। এই তো কত রাত অবধি আমাদের সঙ্গে মৌজ ফুর্তি করলে, াই তো ভোর হলো। এর মধ্যে ঘোড়ায় চড়লই বা কখন পড়লই বা কখন?'

'আপনি ওপরে একটু বলে দেবেন।'

'তুমিও তো ঘুমোওনি বাবা! কত রাত অবধি তোমাদের গালগল্প শুনলাম এখানে শুয়ে ়য়ে। তুমিই বা উঠলে কখন?'

বজরঙ্গী অপ্রস্তুত হয়ে যায়। কোন কথা না বলে বেরিয়ে যায়।

কুন্দন তার ঘরে বসেছিল।

পায়ে চুন-হলুদের পট্টি। হাতটি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কপাল গাল, গলা সর্বত্র কাটা-কুটি। মুখটি াসি হাসি। সে গোপালের মেজ ও ছোট ছেলেকে সবিস্তারে গল্প বলছে। বজরঙ্গীকে দেখে স হাসি মুখে তাকায়। বেশ রণজয়ী সৈন্যের মতো ভাবখানা। বলে, 'ঘোড়াটা চমৎকার। টাকা ়িয়ে দিলাম। তোকে ডাকলাম তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'কখন বেরিয়েছিলে?'

'ভোরে।'

'হঠাৎ?'

'আরে, শরীরটা ঠিক রাখতে হবে তো?'

কুন্দন বলে, 'ওরা বলছে তুই সঙ্গে ছিলি না বলেই ঘোড়া ক্ষেপে গেল।'

'মালিক, ঘোড়া তোমায় মেরে ফেলতে পারত। তেমন ধাক্কা লাগলে হয়তো ঐ বিছুয়াটা তোমার পাঁজরে বিঁধে যেত।'

'যেত তো যেত। ল্যাটা চুকে যেত।'

বজরঙ্গী বলে, ব্যথা করছে না?'

'না। শোন্, কাল যা হলো...' কুন্দন চুপ ক'রে যায়।

'বল।'

'লায়লী বুঝতে পারে নি। ওর খেয়াল থাকে না কোথায় কি ফেলে রাখে।'

'আমাকেও চোর বলল।'

'ঐ দেখ্ না, তোকেও চোর বলল। আরে মেয়েটাই ও রকম। এই রাগ করছে, এই হাসছে।

'মালিক, মালকিনকে নিয়ে তুমি অন্য কোন দেশে বেড়াতে যাও না। কেন।'

'কোথায় যাব?' কুন্দন এখনো যেন কি ভাবছে।

'মালিক, আমার ক'দিন থেকে বাইরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'যাবি তো। বললাম তো কাল।'

'কেন আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও না।' বজরঙ্গী মরিয়া হয়ে বলে ফেলে।

'কাশী? কাশী যাবি কেন?'

'এমনি।'

কুন্দন যেন আর ধৈর্য রাখতে পারে না। রূঢ় গলায় বলে, 'লায়লী যা বলে তা মিথ্যে ন: দেখছি। তোর মন পাওয়া কঠিন।'

'মালিক আমি সে কথা বলিনি।'

'আরে তুইও ওদেরই মতো। বেইমান। অসুবিধে হচ্ছে, অমনি সরে পড়তে চাস। আমি বি আর বুঝি না? সব বুঝি।'

রেগে কুন্দন অনেক কথাই বলে যায়। রাগের কথা, দুঃখের কথা।

শুনতে শুনতে বজরঙ্গী জোড়হাত করে। চেঁচিয়ে বলে, 'আচ্ছা যাব না। হলো তো? যা না, যাব না!'

'কেন, যেতে চাস তো যাবি। তুইও বড় হয়েছিস। তোর নিজের ভালমন্দ সম্পর্কে জ্ঞা হয়েছে।'

'মালিক, নিজের জন্যে বলিনি। আমি তোমার জন্যে—' কি বলতে গিয়েও বলতে পারে না বজরঙ্গী।

'হা ভগবান!' অস্ফুটে বলে সে থেমে যায়। কি বলবে সে? কেন সে চলে যেতে চায় কুন্দনের কথা শুনে সে ভয় পায়।

'বজরঙ্গী, লায়লীর কথায় রাগ ক'রে চলে যেতে চাস?'

বজরঙ্গী একটু ভাবল। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করল।

'মালিক, মালকিন বড় খেয়ালী। খেয়াল-খুশীর সঙ্গে তাল না দিতে পারলেই চটে যায়

'জানি। কিন্তু ওর কাছে আমি তো সবসময়ে থাকতে পারি না। ওর খেয়াল-খুশীর হাজারট ঝক্কি কে নেবে বল্? তুই আছিস বলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি।'

'মালিক, ওকে খুশী রাখলেই ও থাকবে, আর খুশীর খোরাক না যোগাতে পারলেই ও চলে যাবে এটাতে আমার মন সায় দেয় না।'

'কি করব বল্? ওকে খুশী আমায় রাখতেই হবে। নইলে, কথাটি উচ্চারণ করতে কত লজ্জা, তবু কুন্দন অন্তরের দীনতাটুকু একবারকার মতো দেখতে দেয় বজরঙ্গীকে। যে একপলকের জন্যে বুকটা খুলে দেয়। আবার ঢেকে দেয়। কিন্তু তার মধ্যেই দেখে নিয়েছে বজরঙ্গী যা দেখবার। একটি পরুষ, কঠোর, নির্মম হৃদয় যেন তৃষ্ণায় হাহাকার করছে। উষর মরুভূমি যেন একটি শ্যামল মেঘের ছায়া দেখেছে। কুন্দন বলে, 'নইলে যে ও থাকবে না।'

সে ধীরে ধীরে কথা কয় অন্যদিকে চেয়ে, 'আমি কি বুঝি না, সুখ শান্তির জন্যে সর্বদা যদি দাম দিয়ে চলতে হয়, পুরুষের পক্ষে তার চেয়ে লজ্জার কিছু নেই? আমাকে ও ভালবাসতে

পারবে না, আমার মন বুঝতে চাইবে না তা আমি জানি। তবু ঐ সোনা, ঐ পান্না, ঐ কমল হীরে না দিয়ে আমার উপায় নেই। আমি বড্ড নিরুপায় আজ। আমি ওকে হারাতে চাই না।'

'মালিক আর বলতে হবে না।'

'দেখ বজরঙ্গী, কাশীতে দেখেছি, এখানেও দেখছি, পুরুষমানুষ ওদের পেছনে ছোটে। ওদের পায়ে যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দেয়। তাতেই যেন তাদের পৌরুষ চরিতার্থ হয়। আমি দেখতাম কলকাতার বনেদী ঘরের পুরুষেরা ওদের দরজায় জুড়িচৌঘুড়ি নিয়ে হুজুরে হাজির। রাধাশ্যামবাবুর কথা কত শুনেছি। একদিন না কি টপ্পাবেদানাকে নিয়ে ও আটঘোড়ার জুড়ি হাঁকাত। ঘোড়ার গলায় সুরে বাঁধা রুপোর ঘণ্টা। টুং-টাং ক'রে বাজত। টপ্পাবেদানার পায়ে যথাসর্বস্ব ঢেলে দিয়ে লোকটা নাকি পথে পড়ে মরল।

'তোকে আজ অনেক কথা বলছি। কেন বলছি জানি না। তুই হয়তো শুনে আবার লায়লীর ওপরই রাগ করবি। কিন্তু তোকে একটা কথা ভেবে দেখতে বলি।'

কুন্দন বলে, 'ওর দোষ নেই। ওর যে এটা ব্যবসা, পেশা।'

'মালিক!' বজরঙ্গীকে যেন কেউ ঘা মেরেছে। কে যেন হঠাৎ তার চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলে দিয়েছে।

কুন্দন যেন দেবতা। কুন্দন তার মনের কথাটিই বলে।

'তুই মানুষকে ভাল দেখতে চাস। তুই ছেলেমানুষ। সাদা চোখে দেখ বজরঙ্গী, অনেক কিছুই বুঝতে পারবি।'

সে বজরঙ্গীকে কাছে আসতে বলে। তার মাথায় হাত রেখে বলে, 'এমনভাবে তোর সঙ্গে া কইনি কোনদিন, তাই না রে? কি মনে হলো, আজ বললাম।'

'মালিক, তুমি মদ খাও, তুমিই সাদা চোখে দেখতে শিখলে। আমি কেন দেখতে পাই না?'

'দেখে কি লাভ বল্?'

'মালিক, আমি দেখতে চাই না। এ তুমি আমায় কি শেখাচ্ছ? আমি মন্দকে মন্দ বলব আমি ভালকে ভাল বলে বিশ্বাস করব না? কই, এতদিন তো তুমি এমন ক'রে কথা নি।'

'বলেই বা কি লাভ হয়? বলে কিছু হয় না, জানলি? যে যেমন, সে তেমনভাবেই য়াটাকে নেয়।'

'মালিক, এতদিন আমায় ভয় হয়নি। আজ যেন ভয় করছে।'

'ভয় করছে? তোর ভয় করছে?' হঠাৎ যেন কুন্দনই ভয় পেয়ে যায়। বলে, 'না না। ভয় পাস না। তুই ভয় পেলে আমার বড় অসুবিধে হবে। তুই ভয় পাস না। খারাপ নোংরা যা, তা তোর চোখে পড়ে না সে যে আমার মস্ত বড় ভরসা রে!'

বজরঙ্গী কুন্দনের একটা কথাও বুঝল না। সে শুধু দুটি কথা মনে মনে ঠিক করে নেয়। লিক লায়লীকে ভালবাসে। এরই নাম তবে ভালবাসা। লায়লীকে মালিক ছাড়তে পারবে না হলো একটি কথা।

মালিকের দিকে চেয়ে তাকে লায়লীর সকল খেয়াল খুশীর অত্যাচার মেনে নিতে হবে এ না আরেকটি কথা।

বজরঙ্গী মন ঠিক ক'রে ফেলল।

তারপর কুন্দনের জন্যে দুধ এল, কবিরাজী মোদক এল। মোদকের গুলি কুন্দন মাঝে মাঝে খায়। ওতে আফিমটি বেশী দিলে শরীরের ব্যথাবিষ মরে। একসময়ে বজরঙ্গী বলল, 'আচ্ছ মালিক, যদি এমন কাউকে আনতে পারতে যাকে বিয়ে করতে, তাহলে কেমন হ'ত?'

কুন্দন হতাশ হয়ে বলল, 'তোর সঙ্গে কথা কওয়ার কোন মানেই হয় না। বিয়ে করলেই সে আমার পা দুখানা পুজো করত তাই না? আর ভাল কথা মনে পড়িয়ে দিলি। তোর বিয়ে দেব। বউ দেখে এসেছি।'

'বিয়ে করব না।'

'কেন?'

'বউ যদি আমায় ভাল না বাসে?' বজরঙ্গী কুন্দনের যুক্তিটি দিয়েই কুন্দনকে পরাজিত করেছে এইটি জাহির করে একটি গালভরা হাসি হাসল।

'বাসবে, বাসবে। বেশী তেজ দেখালে বউকে মারবি ধরবি। খুব খাটাবি। নিজেও খেটেখুটে সুখে থাকবি। তা ছাড়া বিয়ে করা হলো একটা ধর্ম।'

'হুঁ, তবে তুমি বিয়ে করবে না কেন?'

'এই বোকার মতো তর্ক শুরু করলি। যা, এবার যা।' যেতে গিয়ে ফিরে এল বজরঙ্গী বলল, 'একটি কথা আছে। এটি তোমাকে শুনতে হবে।'

'কি বল্! যা বলবার তাড়াতাড়ি ব'লে ফেল্ দেখি, মনে হয় জ্বর আসছে।'

'আমি ও-ঘরে থাকব না।'

'কেন? বজরঙ্গী আর জ্বালাসনে যা!'

বজরঙ্গী চলে গেল।

পথ দিয়ে চলতে চলতে তার মনটা বেশ হালকা বোধ হলো। মালিকের কথাগুলো ভাল। মালিক বলেছে ওসব কথা নিয়ে আর চিন্তা না করতে। মালিকের যে কথাটি শুনতে তখন খারাপ লেগেছিল এখন সে কথাটা ভেবে দেখছে বজরঙ্গী। মালিক মিথ্যে বলেনি।

ওর ব্যবসা ঐ। ও-ই ওর ব্যবসা। লায়লী আশমান। রূপ বেচে। লায়লীকে যদি এ বয়সেই প্রথম দেখত বজরঙ্গী, তা'হলে কিছু মনে হ'ত না। কিন্তু এই লায়লী যে একদিন মুন্নি ছিল তাকে যে চিনত বজরঙ্গী। মুন্নির সম্পর্কে ওসব কথা ভাবতে কি মন চায়?

একটি কথা মালিককে বলতে পারেনি বজরঙ্গী। সে যে একদিন ওকে চিনত তা বলতে পারেনি, বলতে গিয়েও কোথা থেকে যেন সঙ্কোচ এসে বাধা দিয়েছে।

ও-বাড়ীতে ঢুকেই বজরঙ্গী তরতর ক'রে ওপরে উঠে গেল।

'মালকিন! মালকিন!'

লায়লী মুখে দুধ-ময়দা মেখে নাইতে যাচ্ছে। সে অবাক হয়ে বেরিয়ে আসে।

'মালিক ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে। চোট লেগেছে, তবে ভয় পাবার কিছু নেই।'

লায়লী চুপ। ভুরু বাঁকিয়ে ওকে দেখছে। কে জানে ছেলেটা কি ধাতুতে তৈরী। আবার এসে কেমন সহজভাবে ডাকছে দেখ।

'আপনার যখন যা দরকার আমাকে বলবেন।'

'অমন ক'রে ডেক না বাপু! শুনলে বুকটা চমকে ওঠে।'

'আমাকে বলবেন। আমি নিচে যাই।'

'সকালবেলা কার না কার সঙ্গে চলে গেলে একবারটি বলে গেলে না?'

'ভুল হয়েছে।'

'লোকটা কে, বড্ড চেঁচায় তো?

'ও ভীম।'

'ও! তা বজরঙ্গী, কুন্দন এখন কতদিনে ভাল হবে?'

'কি ক'রে বলি? মালিকের ছোটখাট চোটে তো কিছু হয় না।'

লায়লী বলে, 'ব্যাপার কি বলত? কাল মনে হোল কথাই কইবে না। আজ এসে খুশী হয়ে কথা কইছ।'

'না না ব্যাপার আর কি!'

'মাঝে মাঝে নয় 'তুমি' বলেই কথা ক'য়ো। মালকিন মালকিন শুনতে ভারী বিশ্রী লাগে।'

'বেশ তো কইব।'

বজরঙ্গী এখন লায়লীর সব কথা শুনে চলবে বলে বদ্ধপরিকর।

'তোমার যা দরকার আমাকে ব'লো, কেমন লায়লী?' একটু ভেবে-চিন্তে বজরঙ্গী বলে, যখন যা মনে হবে, তাই ব'লো।'

লায়লী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর তাড়াতাড়ি ঢুকে পর্দা টেনে দেয়। গুলরুখ তার চুল আঁচড়ে পরিষ্কার করে একটা চুড়ো বাঁধে। তারপর স্নান করে লায়লী।

ছোটবেলা ওর দাদী সাবান মাখত। ও ভাবত একটা গোলাপী পাথর ঘষে বুঝি ফেনা বের করছে বুড়ী। এখনও লায়লী সাবান মাখে। নেহাত কখনো সখনো। হায়দ্রাবাদী তাকে রূপচর্চা শেখায়নি। তার মা-র আয়া তাকে রূপচর্চা শেখাত। একেবারে ঠাণ্ডা জলে নাইতে নেই। উষ্ণ জলে একটু লবণ আর কর্পূর ফেলে দিও। দুধ-ময়দা মাখলে মুখের চামড়ায় একটি ভাঁজও পড়বে না। জলপাইয়ের তেল গোয়ানীজ বেনেরা বিক্রি করে। জালপাইয়ের তেল একটু মেখ। সরষের খোল বেনের দোকানে পাবে। তাই ভিজিয়ে মাথাটি ঘষে ফেল। লেবুর রস দিও চুলে। চুল পরিষ্কার হবে আবার নরম রেশমের মতো হবে।

লায়লী দুধ-ময়দা তুলে ফেলে সাবান মাখল। গায়ে মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢাললো। নেয়ে এসে সে কাপড় ছাড়ে। জানলায় দাঁড়িয়ে সে চুল শুকোতে থাকে।

গুলরুখ একবার নিচে যায়। লায়লীর আড়ালে গিয়ে হুঁকো খেয়ে আসে। ওপরে যখন আসে তার মুখ হাসি হাসি।

'বজরঙ্গী সা'বের মাথাটা খারাপ হয়েছে। মাথায় গরম বাতাস লেগেছে।'

'কেন?'

'বাগানের ওপাশের ঐ ঘরটায় না কি থাকবে ও। খাটিয়া ঘাড়ে ক'রে রওনা দিল।' বলল ঙ্গা দেখবে দিন রাত।'

লায়লী জবাব দেয় না। চেয়ে দেখে। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বজরঙ্গী বেজীটাকে কি যেন খাওয়াচ্ছে। কুন্দন একটি একটি ক'রে কত পশু-পাখী এনে দিয়েছে লায়লীকে। বজরঙ্গী তাদের খাওয়ায় যত্ন ক'রে। লায়লীর দেখতে ভাল লাগে, যত্ন করতে ভাল লাগে না। বাড়ীর পেছনে চারটে ছোট কুঠরীতে চারটে ডালকুত্তা দিনমানে বন্ধ থাকে। কসাই ওদের মাংস খাওয়ায়। রাত হলে ছাড়া হয় ওদের। ওরা ঘুরে বেড়ায়। পাহারা দেয়।

লায়লী দেখেছে একা বজরঙ্গী ছাড়া কেউ ওদের কাছে যেতে চায় না। ওরা মাঝে মাঝে বজরঙ্গীর পায়ের কাছে চিত হয়ে পড়ে থাকে। বজরঙ্গী ওদের গা বুরুশ করে।

বজরঙ্গী বেজীটাকে খাওয়াতে খাওয়াতে একবার মুখ তুলে চায়। হাসে এবং কি যেন বলে।

॥ একুশ ॥

দুর্ঘটনায় কুন্দনের আঘাতটা নেহাত মন্দ লাগেনি। ক'দিন তাকে শুয়ে থাকতে হলো। কুন্দনের মা আসে ঠাকুমা আসে। গোপাল এসে দোকানের আয়ব্যয়ের হিসেব দেয়।

কুন্দন দরজার দিকে একটি চোখ এবং একটি কান সমর্পণ ক'রে রাখে, বজরঙ্গী আসতেই তার মুখটি উজ্জ্বল। তার মা বলে, 'বজরঙ্গীটা ওকে যাদু করেছে। ও আসতেই দোরে খিল পড়ে কেন?'

গোপাল নিরুৎসুক কণ্ঠে বলে, 'টাকাকড়ির হিসেব হচ্ছে। টাকা পয়সার হিসেবটা তো ঠিক রাখতে হবে।'

মা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে, 'তুই লেখাপড়া শিখেছিস, মনোহর লেখা পড়া শিখেছে। তোরা থাকতে ও হিসেব দেখে এ তো ভাল কথা নয়। কুন্দন তো তেমন লেখাপড়া শেখেনি। ওকে হয়তো ঠকিয়েই নেয়।'

'নিলেও আমাদের কিছু করবার নেই মা। দাদার নিজের টাকা পয়সা দাদা যাকে খুশী তাকে বিশ্বাস করবে।'

'দাঁড়া, বজরঙ্গীটাকে একদিন আমিই বলব।' কুন্দনের মা বলে বটে, কিন্তু ভেতর থেকে যেন জোর পায় না।

গোপাল হাতজোড় করে। বলে, 'দোহাই মা, ওর সঙ্গে কথা কইতে গেলে সে দাদার কানে যাবে। তারপর ঘুরে ফিরে গোলমালটা আমার ওপর এসে পড়বে। ও কাজটি ক'রো না তোমার বড় ছেলেটিকে তো চেন, পলকে প্রলয় বাধাতে পারে ও।'

'তা তো বটেই, ঐ বজরঙ্গীটাকে দেখতে পারি না আমি। ও বেটা তুকতাক জানে। নিশ্চয় তুক করেছে।'

কুন্দনের মা যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না। সে পুরনো কথা তুলে দুঃখ করতে থাকে। তার ছেলেকে না কি সে কোনদিনই কাছে পায়নি। বাবুলাল একদিন তাকে অধিকার করেছিল বাবুলাল মরতে না মরতে ঐ ছেলেটা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল।

কুন্দনের মা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। তার কান্না শুনে গোপালের বউ ঘোমটার আড়াল থেকে নিঃশব্দে অভিশাপ হানতে থাকে। গোপালের বউ বেড়ালের মতো নিঃশব্দে খরগতিতে হাঁটে মাঝে মাঝে দু'আঙুলে ঘোমটা তুলে কটা চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে শাশুড়ীকে দেখতে থাকে। ওর চোখে সহজে পলক পড়ে না। সে চাহনির সামনে অস্বস্তি বোধ করে কুন্দনের মা

কুন্দনের ঠাকুমা মাঝে মাঝে লাঠি ঠুকঠুক ক'রে আসে। গোপালের বউকে বলে, 'তোর শাশুড়ী অনেক শোকতাপ পেয়েছে। ওর কথা শুনে দুঃখ পাস না।' গোপালের বউ দুঃখ পায় না। সে বাড়ীর এক পাশের একটা ছোট ঘরে গিয়ে আঙুল মটকে মাঝে মাঝে শাশুড়ীকে অভিশাপ দেয়। সে কথা দু'একজন দাসী ছাড়া অন্য কেউ জানে না!

গোপালের বউ ভারী কর্মঠ। সে এ বাড়ীর ধরণ-ধারণ বুঝে নিয়েছে। ঠাকুমা বেশ শক্তসমর্থ আছে তবু বুড়ো মানুষ তো! গোপালের বউ-এর হাতে একটু একটু ক'রে খরচাপাতির অনেক ভারই চলে গেছে। সে ঘরে গিয়ে গোপালের সামনে ঘোমটা খুলল।

বলল, 'বজরঙ্গীকে কিছু বলতে যেও না যেন। সেবার মনোহরের কি খোয়ারটাই হলো দেখলাম তো! তা ছাড়া', সে হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলে, 'মা এখন দুঃখ করেন শুনতেও খারাপ লাগে। তবে এ কথা তো সত্যি উনি কোন দিনই বড় ছেলের দিকে চাননি।'

'তুমি এ সব কোথায় জানলে?'

'জানি। এ কথাও সত্যি যে এই ব্যবসা, কারবার, ঘরবাড়ী সবই তোমার দাদার হাতে গড়া।'

'কি বলতে চাইছ?'

'যার জিনিস সে যাকে ইচ্ছে তাকেই বিশ্বাস করুক না। তুমি আমি কথা কইতে যাই কেন?'

গোপাল বলে, 'না না। দাদার কথার উপর আমি কথা কইব! তুমিও যেমন!'

দেওয়ালের গা থেকে সাঁৎ ক'রে ছায়া সরে যায়। এ বাড়ীতে ছায়ার নড়াচড়াটা বড্ড বেশী। এর ঘরের কোণে, ওর দেওয়ালের পাশে আড়ি পেতে থাকে ছায়াচারিণীরা।

নিজের ঘরে বসে থাকে কুন্দনের ঠাকুমা। তার ঘরে দিনরাত ওরা ঢুকছে বেরুচ্ছে। এ বাড়ীতে কে কি দিয়ে ভাত খায়, কে কাকে কি বলে, কার ঘরে কখন কে আসে সব খবর রাখে কুন্দনের ঠাকুমা। কুন্দন তাকে গুপ্তচরবৃত্তির উপকারিতা শিখিয়েছে।

ওদিকে দোর বন্ধ ক'রে কুন্দন আর বজরঙ্গী কথা কয়। কুন্দন কুশল সংবাদ নেয়। জিগ্যেস করে লায়লী কেমন আছে, কি করছে। তারপর অন্যদিকে চেয়ে গলাটি যথাসম্ভব নিরুৎসুক রেখে সে বলে, 'হ্যাঁ রে, এই যে তুই আসিস যাস ও জানতে চায় না? এই আমি কেমন আছি-টাছি?'

'চায় বই কি।'

'কি বলে?'

'তুমি কি খাচ্ছ, কেমন আছ, এ বাড়ীতে তোমার যত্ন হয় কি না সব জানতে চায়।'

কুন্দন বলে, 'তুই যা বলেছিলি তাই করব রে! ওকে একবার বেড়িয়ে আনব কাশ্মীর। না হয় বোম্বাই যাব। ও তো কোথাও যায় নি।'

বজরঙ্গী দরজা খুলে দেয়। কুন্দন বলে, 'আর চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই হাঁটতে চলতে পারব।'

বজরঙ্গী চলে যায়।

খিদিরপুরের বাড়ীতে ঢুকতেই লায়লী তাকে ডাকে।

লায়লী যেন কুন্দনের খবর জানবার জন্যে বড্ড ব্যগ্র হয়ে থাকে। বজরঙ্গীকে কাছে বসিয়ে হাঁটুতে চিবুক রেখে একমনে কুশল সংবাদ শোনে। বলে, 'সত্যিই তো। বেচারার খুব চোট লেগেছে। একবার গিয়ে দেখে আসতে যে সাধ যায় না তা নয়। তবে ও-বাড়ীতে তো আমার যাওয়া চলবে না।'

বজরঙ্গী বলে, 'ভেব না লায়লী, মালিক এবার খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।'

'কে বলল?' লায়লী কতটা খুশী হলো বোঝা যাচ্ছে না।

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'না না। আমার মনে হয় ওর আরো কিছু দিন শুয়ে থাকা দরকার।' লায়লী ঘরময় ঘুরে বেড়াতে থাকে। বেণীটা একবার খোলে, একবার বাঁধে।

'তুমি জান না বজরঙ্গী, পায়ে আঘাত লাগা ভাল নয়। শুয়ে থাকা দরকার। বিশ্রাম তো করে না কুন্দন! এই ফাঁকে একটু বিশ্রামও হবে।'

বজরঙ্গী লায়লীকে লক্ষ্য করে। লায়লীর গলায় যেন একটা চাপা অস্থিরতা।

'কই তুমি কিছু বলছ না যে!'

'আমি কি বলব?'

বজরঙ্গী ভয় পাচ্ছে। সে যেন হতাশ হয়ে যাচ্ছে। সে যে সংকল্প গ্রহণ ক'রে ছিল লায়লীর সব কথা ও শুনবে, কেননা লায়লীকে কুন্দন ভালবাসে। লায়লীকে খুশী রাখতে হবে। ঈশ্বর জানেন বজরঙ্গী কত চেষ্টা করেছে। এ ক'দিন ও লায়লীর ছায়া হয়ে লায়লীর সঙ্গে থেকেছে। লায়লী বাগানে বেড়ায়, ও পাশে থাকে।

'বজরঙ্গী, এ ফুলটি কি সুন্দর! কি নাম?'

'দোপাটি।'

'বজরঙ্গী, আমার ফোয়ারায় শালুক ফুল দিলে কেন?'

'কি ফুল দেব?'

'নীলকমল।'

'কমল কি নীল হয়? ওসব বোধ হয় গল্পকথা। পদ্মফুল লালও হয় না, নীলও হয় না। গোলাপী আর সাদা। লায়লী ছাতে বসে ও পাশে বসে। সারেঙ্গী বাজায়। গান গায়।

এ ক'দিন যেন খুব সুখে এবং শান্তিতে কেটেছে। রোজ রোজ বজরঙ্গী প্রার্থনা জানিয়েছে ভগবানের কাছে লায়লী যেন কুন্দনকে ভালবাসে। লায়লী যেন কুন্দনকে সুখী করে। সন্ধ্যেবেলা লায়লী এক একদিন এক এক রকম সাজে সেজেছে। সেজেগুজে ঘরে বসে বজরঙ্গীর সঙ্গে গল্প করেছে। কত রকম গল্প! লায়লীর বুড়ী দাদীর গল্প, বজরঙ্গীর নাওদারদের কাছে মানুষ হবার গল্প।

তখন, লায়লীর সঙ্গে সময় কাটাতে কাটাতে বজরঙ্গী বার বার মনে মনে বলেছে ওর যেন মতিস্থির থাকে। ওর যেন মনপ্রাণ এই রকমই থাকে। কুন্দনের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা যেন স্থায়ী হয়। এমনও তো হয়। এই কলকাতাতে হয়, কাশীতে হয়। একজন সমাজপতি সমাজের গৌরব। আর একজন হয়তো পরিচয়হীন অন্ধকারের সন্তান। তবু দু'জনের মধ্যে ভালবাসার বাঁধন সারা জীবনেও শিথিল হয় না।

সে ভেবেছে লায়লী আর কুন্দন যদি তেমন কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তাতে সকলেরই ভাল হবে। বজরঙ্গী সেদিন নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে পারে।

কিন্তু আজ যে ভয় করছে।

লায়লীর সে আন্তরিকতা, কুন্দন সম্পর্কে উদ্বেগ যদি সত্যি হবে তবে এখন কেন ও এমন ক'রে ব্যাকুল হচ্ছে? এই অস্থিরতা দেখলেই যে বজরঙ্গীর ভয় করে। বুকের ভেতরটা যেন শুকিয়ে আসে। কারা যেন ফিসফিস ক'রে কইতে থাকে 'সাবধান, তুই সাবধান হ!'

'চুপ ক'রে রইলে কেন বজরঙ্গী? বল না!'

বজরঙ্গী লায়লীর দিকে চাইল। কালো চোখ, এখন একটু বেশী বড় দেখাচ্ছে। ও চোখের কতরকম ভাষাই না আছে! মাঝে মাঝে যেন ছোট শিশুর মতো সরল। মাঝে মাঝে কিছুই বোঝা যায় না। কি ভাবছে, কি বলতে চাইছে কিছুই বোঝা যায় না।

এখনো বোঝা যাচ্ছে না। বজরঙ্গীর মনে হলো ও চোখে একটা আন্তরিক উদ্বেগ, একটু উৎকণ্ঠা দেখতে না পেলে সে যেন ডুবে যাবে, তলিয়ে যাবে।

লায়লী হঠাৎ হাসে। বলে, 'এত চিন্তিত হলে কেন? কুন্দনের শরীরটা একটু সারত, তাই বলছিলাম। তবে তাতে লাভই বা কি! আজ না এলেও কাল আসবে।'

'লায়লী, মালিক আসে সেটা কি তুমি ও চাও না?'

লায়লীও যেন ভয় পেয়ে যায়।

ধরা পড়ে গেল নাকি। বজরঙ্গী তার মনের কথা ধরে ফেলেছে কি? এক নিমেষে তার মুখটি পাণ্ডুর দেখায়, চোখদুটি বিস্ফারিত। পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নেয়। অপ্রস্তুত ভাবটি ঢাকতে গিয়েই যেন সে রেগে যায়।

'কি যে বল তুমি! না বজরঙ্গী, কথা কইতে তুমি জান না!'

'রাগ ক'রো না। বল!'

'আ! বড় বিরক্ত কর তুমি!'

বজরঙ্গী চিন্তিত মুখে নেমে যায়। লায়লীর প্রতি এক সুগভীর কৃতজ্ঞতা এ ক'দিন ধরে তার বুকে জ্বলেছে। তিলে তিলে। লায়লীর ডাকে কাছে এসেছে বজরঙ্গী। লায়লী যা বলেছে, শুনেছে। বজরঙ্গী বলেছে, 'যা বলবে সব মাথা পেতে শুনব লায়লী। তোমার কাছে আমার শুধু একটি মিনতি। যা সহজ, যা সুন্দর, তাকে জটিল ক'রো না।'

লায়লীর নিশ্বাস শোনা গেছে, লায়লী অন্যদিকে চেয়ে বলেছে, 'যা সহজে পাওয়া যায় তাতে আমার লোভ হয় না। তবু তোমার কথা রাখলাম।'

তারপর দুজনের মধ্যে সে কি স্বচ্ছ অন্তরঙ্গ আলাপ। একদিনের তরেও লায়লী বজরঙ্গীর কাছে কোন অসঙ্গত আবদার জানায়নি।

কিন্তু আজ যেন সব অন্য রকম লাগছে। অশান্ত বজরঙ্গী নিজের ঘরে যায়। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। তার ভয় করছে। কেন ভয় করছে তা সে বলতে পারে না। কেননা ভয়ের কারণটা তার কাছে খুব স্পষ্ট নয়।

'ভুল, সবাই ভুল করছি আমরা। ইচ্ছে ক'রে ভুল করছি।'

লায়লী দেওয়ালে হেলান দিয়ে ব'সে আছে পা মেলে। শিরীন ফরাস ছেড়ে মাটিতে গিয়ে বসেছে। নিসার ওদের দুজনের সঙ্গে ঝগড়া করছে। ঝগড়াটা হয়তো আগেই হয়েছে। নিসার এখন খেদোক্তি জানাচ্ছে, তাও হতে পারে। বজরঙ্গী দোরের বাইরে দাঁড়াল।

'বজরঙ্গী এদিকে এস।'

নিসার একগাল হাসল। 'আমার অবস্থা বড় খারাপ হে। নেহাত কোণঠাসা হয়ে পড়েছি। এস। ভালবাসা নিয়ে দুটো কথা হচ্ছে।'

বজরঙ্গী কাঁচের ছিপি আঁটা কুঁজোটি নামিয়ে রাখে ও একটু ইতস্তত করে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে।

'কোথায় যাচ্ছ, কোথায় যাচ্ছ! বস হে বস। লায়লী, ওকে বসতে বললাম । তোমার অনুমতি বিনেই!'

নিসার হাসি হাসি মুখে সকলের দিকে চায়। বলে, 'এ বাবা তুঘলকী আইন। তুমি নিজের খুশীতে হেসেছ তো শুলে চড়াব। আমি হুকুম করব তবে তুমি হাসবে।'

'বাজে বোক না।' শিরীন নাকটাক মুছে সোজা হয়ে বসে।

'বটে! আমি বাজে বকছি! বজরঙ্গীকে লায়লী যদি নিজে ঘরে ডেকে বসতে বলে তাতে দোষ নেই, আমি বললেই তাতে দোষ হবে!'

শিরীন অবাক হয়ে বলল, 'কি যে বল, তার মানে বোঝা দায়। লায়লী কেন ওকে ঘরে বসতে বলতে যাবে?'

নিসার একটু হাসল। সবজান্তা গোছের হাসি। সে বলে, 'শিরীন, তুমি গভীর অন্ধকারে পড়ে আছ। তোমাকে আর আমি কি বলব?'

শিরীন তবু মানবে না। 'না না, তোমার মুখে লাগাম নেই নিসার। ওর সামনে সব কথা বলা ঠিক নয়। ও তো কুন্দনের ডানহাত। কুন্দন যদি জানতে পারে তুমি এখানে ঘর-বাড়ী বেঁধেছ......!'

লায়লী কথা কইল। নিরুত্তাপ এবং সহজ কণ্ঠ। নরম ক'রে বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এস।'

শিরীনের পানে না চেয়েই বলে, 'নিসার আসবে, শিরীন আসবে এ তো জানা কথা। সে জন্যে বজরঙ্গীও নালিশ জানাবে না আর কুন্দনও ঠিকএতটা ছোট নয় যে তা নিয়ে আমায় কিছু কইবে।'

বজরঙ্গী একপাশে বসে। এদের মাঝে এসে বসতে তার চরম অস্বস্তি হচ্ছে। তবু মনে মনে সুগভীর কৃতজ্ঞতা। এদের সামনে লায়লী বলল, কুন্দন ছোট নয়। লায়লী যেন এক নিমেষে কুন্দন আর বজরঙ্গীর আপন লোক হয়ে গেল। বজরঙ্গী চোখটা তুলে ওকে এক পলক দেখে নেয়। ও আবার সামনের দিকে চেয়ে আছে। চোখের চাহনি আবার সেইরকম। ও কি ভাবছে তা আর বোঝা যাবে না।

নিসার যেন কিছু লক্ষ্য করেনি। সে উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠে, 'আরে কুন্দনের মনটা খুব দরাজ হে। ও ওসব ভাবে না। এই আমাকে কথায় কথায় কি কম টাকা দেয়? লায়লী তো বকে আমাকে! বলে, 'বের ক'রে দেব, দূর ক'রে দেব। তখন কুন্দনই তো আমার হয়ে দুটো কথা কয়।'

শিরীন কিছুক্ষণ আগেই কেঁদেছে। তার চোখ মুখ দেখেই বোঝে বজরঙ্গী। নিসার আর শিরীনের মান-অভিমানের পালায় শিরীন কাথায় কথায় কাঁদে।

এখন আবার কাঁদবার চেষ্টা করল শিরীন। তার চিবুকটি কাঁপল, নাকের ডগা ফুলে উঠল। সে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলল, 'আমি কি কুন্দনকে মন্দ বলেছি নাকি? কুন্দন তো ভাল। তবে ওর কাছে টাকা নাও কেন নিসার? আমি কি তোমায় টাকা দিই না?'

'দেবে না কেন, দাও। তবে খরচ হয়ে যায় যখন, তখন কি করি বল না। তা ছাড়া বুঝলে বজরঙ্গী, শিরীনের সব ভাল। শুধু যখন তখন ভালবাসার কথা কইতে চায় এই যা মুশকিল। নইলে শিরীনের মতো মেয়ে তুমি পাবে না। চেহারাটি টসটসে, গাইতে জানে, কাবাব কলেজি-ও রাঁধতে পারে। এদিকে আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খায় আবার ভোর হলে পীর-ফকিরকে দান-ধ্যান না ক'রে মুখে জলটি দেয় না।'

শিরীন সকলের দিকেই চায়। কে জানে নিসার ঠাট্টা করছে না প্রশংসা করছে।

'শিরীন যদি আমাকে একটু, একরত্তি কম ভালবাসে তা হলে কি ভালই না হয়!'

'বাবাঃ, কি ভুলই না করেছি নিসার, তোমাকে ভালবেসে।'

এখন আর বজরঙ্গীর কথা মনে নেই শিরীনের, সে আবার ফোঁস ফোঁস করে ও দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে। বজরঙ্গী অপ্রস্তুত। নিসার কিন্তু আবার নতুন উৎসাহে কথা কইতে থাকে।

'ভুলের কথাই তো বলছিলাম। ভুল সবাই করছি। আমি, তুমি, সবাই।'

'এই শুরু হলো! নিসার কি বকবকই করছ আজ!'

'কেন লায়লী, তুমি আমায় থামিয়ে দিচ্ছ কেন? আমি এই কথাটি বলতে চেষ্টা করছি তখন থেকে। বজরঙ্গীকে তো সে জন্যেই ডাকছিলাম কাছে। ও বেশ বোঝেসোঝে। ওর সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে।'

'বল।'

'আমি বলছিলাম আমরা সবাই ভুল করি এবং মিছেই নিজেদের জড়াই।'

'মানেটা বুঝিয়ে দিও!'

'বজরঙ্গী, দেখে রাখ। লায়লী মনে করে ও বড় চালাক। মনে ক'রো না ও ভুল করে না।'

'আমাকেও ধরে ফেললে? আমি কি করেছি?'

'লায়লী, আমি এবং শিরীন এবং আমাদের এই ভালবাসার, এর সবটাই আগাগোড়া ভুলে ঠাসা। আমি ওকে ভালবাসি না কিন্তু ওকে ছাড়তে প্রস্তুত নই। সময়ে খাবারটি পাচ্ছি, নেশা, পকেটে পয়সা, ফর্সা বিছানা, কে ছেড়ে যাবে বাবা? এতে তুমি যদি আমায় মন্দলোক ভাব, আমার বয়ে গেল।'

শিরীন পান খাচ্ছে। এখন সে কয়েকটা অবোধ্য শব্দ করে। লায়লী বলে, 'থাম শিরীন। নিসার বেশ খেলিয়ে খেলিয়ে গল্পটি ফেঁদেছে।'

লায়লীর সমর্থন পেয়ে নিসার লাফিয়ে ওঠে এবং এক গেলাস শরবত চট ক'রে গলায় ঢেলে দিয়ে বিষম খেয়ে হেঁচে ও কেশে বলে, 'গল্প? গল্প কি? এসব মূল্যবান সত্য। যাকে বলে জীবন দিয়ে শেখা। অনেক কষ্টে চুনে চুনে নিংড়ে নেওয়া।'

'বল।'

'শিরীন আমায় ভালবাসে বটে। কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যেও বড় বড় ফাঁক আছে।'

'তার মানে কি? আরে বেইমান, মানে কি তার?'

'শিরীন, তুমি আমায় বড্ড বেশী ভালবাস। এত ভালবাসা যে আমাকে চোখের আড়াল হতে দেখলেই সন্দেহ কর, আমি আর কোথাও গিয়ে বসে আছি। আমি অবশ্য তোমায় দোষ দিই না। কেননা বয়স হলে ও রকম সন্দেহ মনে আসবেই।'

'আবার বয়সের খোঁটা দিচ্ছ?'

'না বাপু, খোঁটা দিচ্ছি না। একটু আলোচনা করতে চেষ্টা করছি। দু'দুটো মেয়েমানুষের সঙ্গে আলোচনা করাও যা, ঐ বুড়ো কাকাতুয়াটার সঙ্গে কথা কওয়া-ও তাই। মেয়েদের তো যুক্তিবুদ্ধির বালাই নেই! বলতে চেষ্টা করছি এই আমার আর তোমার সুখের ঘর, সে ঘরে কাঁচের ঝিলমিল-ই টাঙাও, আর ফুলের ঝালরই দোলাও, সে ঘরে সুখ হতে পারে না।'

'তার কারণ তুমি বেইমান।'

'আবার বেরসিকের মতো কথা। তোমার সঙ্গে কথা কইছি না। শোন বজরঙ্গী, তোমার শোনা দরকার আমাদের এই প্রেমের মঞ্জিলে সুখশান্তি নেই কেন! তার কারণ আমরা গোড়ায় গলদ বাধিয়ে বসে আছি। ঐ 'প্রেম, জীবনে মরণে তোমার, কোনদিন ভুলব না' এই কথাগুলো যত নষ্টের গোড়া। কি জানলে বজরঙ্গী, আমিও জানি এর নাম প্রেম নয়, ও-ও তা জানে। তবু আমরা প্রেম-প্রেম খেলছি। আমি একটা ধাড়ি শয়তান, ওর ব্যাপারটা অবিশ্যি আলাদা।'

'লায়লী, তুই নিসারকে থামতে বলবি কি না, বল্!'

'কথা কওয়ার লোভে ও আবার পালাবে তোমার বাড়ী থেকে। তুমি আবার ঘামতে ঘামতে এসে হাজির হবে।'

'বজরঙ্গী!'

'নিসার সা'ব!'

'দেখ, শিরীন বড় ভাল মেয়ে।'

'জী।'

'ওর বিয়ে করা উচিত ছিল।'

নিসারকে শিরীন ও লায়লী দু'জনেই ধমকে উঠল। নিসার অকুতোভয়।

'এতদিনে ও দিদিমা ঠাকুমা-ও হতে পারত। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমাকে দিয়ে ও অনেক ভালবাসার সাধ মেটাতে চায়। স্বামীর মতো ভালবাসবে, ছেলের মতো ভালবাসবে, আবার দিনে দশবার কাছে এসে কবুল করিয়ে নেবে কলকাতা শহরে এমন দুটি আদর্শ আশিক এবং মাসুক নেই। কেন বাবা, আমি একা একা সকলের হাজিরা দেব কেন? আমি কি আশ্চর্য সবুজগুলি? এক গুলি গালে ফেললে আর ভেতরে বাইরে সুখশান্তি উছলে পড়তে লাগল? তা কি হয়?'

লায়লী চুপ। শিরীন হতাশ হয়ে পানের বাটা খুলে আর একটি পান বের করে। বজরঙ্গী বিব্রত, কিন্তু না শুনে উপায় নেই।

'ভালবাসার শর্তটা না থাকলে আমরা দিব্যি থাকতে পারতাম। তা শিরীনকে বোঝাবে কে? এখন সদাই হারাই হারাই ভয়। বাড়ীতে কোথা থেকে বেছে বেছে বুড়ো বুড়ো ঝি-চাকর এনেছে। ব্যাপারটা কি জান হে? সবাই যদি নড়বড়ে বুড়ো হয়, তা'হলে উনি আমার সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত থাকেন। ওঁর নিজেকেও বেশ অল্পবয়সী মনে হয়। এর মধ্যে প্যাঁচ আছে হে বজরঙ্গী, শিরীন বাঈকে দেখে যত সাদাসিধে ভাব, তত সোজাটি নয়।'

লায়লী যেন কি ভাবছে। সে হাঁটুতে মুখ রেখে অন্যদিকে চেয়ে আছে। লায়লী বলে, 'এত কথার মধ্যে কোন কথাটি বেছে নেব নিসার?'

'কোন কথাটি বেছে নেব?' কোন্ ফুলটি তুলব গো, কোন্ মুক্তোটি চিনে নেব? কি মিষ্টি ক'রেই না বললে কথাটি লায়লী!'

'কি বকবকই করতে পার নিসার!'

'আসল কথাটিই তো তোমাদের বলতে চেষ্টা করছি। আমরা সবাই—'

'ভুল নিয়ে বাস করছি। তা, তোমার আর শিরীনের জীবনে ভুলচুকের পাহাড় জমছে বলে জগতের সকলেই ভুল-ভ্রান্তিতে মজে আছে এ কথা ভাবছ কেন? তোমরা দু'জনেই বোকা। জগৎসুদ্ধ সবাই তো আর বোকা নয়!'

ধীর ও নিরুত্তাপ কণ্ঠ। বজরঙ্গী আস্তে আস্তে মুখ তোলে। এদের দিকে সে চাইবে না। নিসার, শিরীন, এদের সে দেখতে চায় না। সে শুধু একটিবার লায়লীকে দেখবে। লায়লীর কথাটি তাকে বিস্মিত করেছে।

লায়লীর দিকেসে চাইবে না। চাইবে কেন! ঐ আয়নাতেই তো লায়লীকে দেখা যায়। ওটুকু দেখলেই ভাল লাগবে বজরঙ্গীর। লায়লী কুন্দনের সঙ্গে কথা কইবে, হাসবে। লায়লী গান গাইবে, নাচবে। বজরঙ্গী শুধু মাঝে মাঝে মুখ তুলে আয়নাতে ওর ছায়াটি দেখে নেবে।

লায়লী অন্যদিকে চেয়ে আছে। লায়লীর চোখের নিচে কালি! ও যেন চিন্তায় ডুবে আছে। এত চিন্তা কিসের?

'নিসার, কাজেই দেখছ তোমার কথাগুলো আসলে কিছুই না। ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। শুনতে ভাল, কিন্তু এ সব কথার কোন ওজন নেই।'

'বল লায়লী!'

'মানুষের কথার কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলে সামান্য একটি কথার সাহায্যে হয়-কে নয় করা যায়। তুমি সব সময় সাজিয়ে বানিয়ে কথা কও। তোমার কথাগুলো যেন মিনে করা সস্তা গয়না। দেখলে মনে হয় কত না দামী। আসলে কোন দাম-ই নেই।'

'দেখ নিসার, অন্যলোক যদি এ কথাগুলো কইত আমি সত্যি বলে মেনে নিতাম। তোমার কথা মানি কি ক'রে?'

'লায়লী, আমি সত্যি কথাটা জানি। তাই রাগ করছি না।'

'জান! কি জান?'

'জানি, যে তুমি-ও একটি বিরাট ভুলকে প্রশ্রয় দিচ্ছ। নিজের সঙ্গে মিথ্যাচরণ করছ। সত্যিটাকে স্বীকার করতে কি এতই ভয়?'

'নিসার!'

চেঁচিয়ে উঠেছে লায়লী। বজরঙ্গী আবার মুখ তুলেছে। কি বলতে চায় নিসার?

লায়লীর চোখে ভয়। লায়লীর চোখে মিনতি। নিসার ওর চোখের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর যেন একটু হেসে ওকে আশ্বাস দেয় নিসার।

নিসার মাথা নাড়ে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। তারপর বলে. 'চল শিরীন। রাত হয়েছে। বাড়ী যাই।'